পথ-চলতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রক : বিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৫-ই, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

চার টাকা পচাত্তর ন. প.

জীবনের পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বহু দেশের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে, বহু ঘটনায় অংশ নিতে হ'য়েছে, আর নানা চরিত্রের মানুষের সংস্পর্শে আস্‌তে হ'য়েছে। এ ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনেও হাটে-বাটে ছোটো-খাটো নানা অভিজ্ঞতাও হ'য়েছে। যা কিছু দেখেছি, যা কিছু জেনেছি, আর যার সঙ্গেই মিলেছি—সে-সমস্তেরই একটা গভীর ছাপ বহু ক্ষেত্রে মনের মধ্যে র'য়ে গিয়েছে। অনেক জিনিসই ভুলি নি। কিন্তু যা ভুলি নি, ইচ্ছা থাক্‌লেও, তা সব-ই লেখাতে ধ'রে রাখা সম্ভবপর নয়। পথ-চল্‌তি জীবনের বড়ো আর ছোটো কতকগুলি অভিজ্ঞতার কথা, বন্ধুদের তাগিদে, মাঝে-মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্পচ্ছলে লিখে প্রকাশ ক'রেছি। তার-ই কয়েকটি, শ্রীমান্ অনিলকুমার কাঞ্জিলালের আগ্রহে, নোতুন ক'রে ছাপিয়ে' পরিবেষণ করা হ'ল।

মিত্র-গোষ্ঠীতে ব'সে গল্প শোনা আমার বরাবরই ভালো লাগে; আর তেমন শ্রোতা পেলে, এ-রকম গল্প করার দৌর্বল্য-ও আমার আছে। আমার এই পথ-চল্‌তি অভিজ্ঞতার গল্প অনুরাগী বন্ধুদের ভালো লাগায়, বইয়ের আকারে প্রকাশ ক'র্‌তে সাহসী হ'লুম।

প্রবন্ধগুলির রচনা-কাল বা প্রকাশ-কাল নিয়ে শ্রীমান্ অনিলকুমার একটু চিন্তায় প'ড়েছিলেন। অনেক সময় লেখা বা প্রকাশের তারিখ ঠিক-মতো ধরা যায় নি। আমি অবশ্য সে-জন্য বিশেষ চিন্তিত হই নি। কারণ, 'পথ-চল্‌তি' কথা ইতিহাস নয়—টুক্‌রো অভিজ্ঞতা মাত্র, যা দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ হ'য়েও এ তিনের তোয়াক্কা রাখে না। ইতি ১২ চৈত্র ১৩৬৮, ২৬ মার্চ ১৯৬২ ॥

'সুধর্মা'
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক
ক'লকাতা-২৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

(১৮৬৮-১৯৪৬) (১৮৭৩-১৯৬০)

স্মরণে

স্নেহধন্য গ্রন্থকার ও তৎপত্নীর প্রণাম নিবেদন

আমার ছেলেবেলার কথা

এমন কে প্রৌঢ় বা বুড়ো লোক আছেন, ছেলেবেলার কথা স্মরণ ক'রে যিনি আনন্দ না পান? অতীতের প্রতি সিংহাবলোকন ক'রে দেখ্‌লে, অনেক কিছুর অর্থ আমরা এই পরিণত বয়সে বুঝ্‌তে পারি, অতীত এখন আমাদের কাছে নোতুন রূপ, নবীন সার্থকতা নিয়ে দেখা দেয়।

আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগেকার কথা ব'ল্‌ছি—যখন ইস্কুলের ছাত্র ছিলুম, তখনকার দিনের কথা। এত বছর হ'য়ে গিয়েছে, অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, অনেক কথা আবছা-আবছা মনে আছে, আবার অনেক কথা এখনও চোখের সামনে যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'র্‌ছে।

বারো বছর বয়সে মা মারা যান—আমরা চার ভাই আর দুই বোন ছিলুম। আমার ছেলেবেলার সব চেয়ে পুরানো স্মৃতি আমার মায়ের কথা নিয়ে। মাথায় চূড়াকরা চুলের মধ্যে একটি গোল সোনার পুঁটে বাঁধা, চোখে কাজল, পায়ে রূপোর মল—আমার এ-হেন বেশের কথা আবছা-আবছা মনে আছে। আর মনে আছে, মায়ের মুখের গান, আর অবাক্‌ হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে' আমার সেই গান শোনা—"রাঙা পায়ে রাঙা জবা কে দিলে মা মুঠো মুঠো--দে-না মা পরিয়ে' দুটো—ঘুরে ফিরে নাচ্‌বো আমি, দেখে মা তুই হাস্‌বি কতো"—এখন মনে হয়, এ গান শুনে বুঝি-বা আমিও নাচ্‌তুম। মা চ'লে গেলেন, ইংরিজি ১৯০২ সালে, ক'লকাতায় প্লেগ হ'চ্ছিল, সেই প্লেগে। আমাদের ছয় ভাই বোনকে নিয়ে বাবা আমাদের মা আর

বাবা তুইয়ের কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বাবার স্নেহের, আর আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার আর চেষ্টার অবধি ছিল না, কিন্তু তবুও তাঁকে ভয় ক'র্‌তুম, আমরা ভাই বোন সকলেই। তবে তাঁর স্নেহ যত্নের কদর ক'র্‌তুম, সেজন্য মনে প্রাণে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'র্‌তুম, ভালো-বাসতুম। আমাদের ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি-ই মায়ের অভাব অনেকটা পূরণ করেন, তাঁর হাতেই আমরা মানুষ হই। আর বাড়িতে ছিলেন ঠাকুরদাদা—পিতামহ। ছেলেবেলার কথা কিন্তু মনে হ'লেই, সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেবেলায় যাঁকে হারিয়েছি সেই মায়ের কথা মনে হয়-ই। বারো বছরের বালক-জীবনের মধ্যে তাঁর যে স্নেহের স্পর্শ পেয়েছি, যে আদর-যত্নের নিদর্শন দেখেছি, তার জন্য একটা আকুলতা এসে এখনও মনকে অভিভূত করে। যেদিন ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার খবর তাঁকে জানালুম, তখন আমার বয়স নয় বৎসর হবে, মায়ের চোখে মুখে সে কী আনন্দ দেখেছিলুম—সে আনন্দ আমার শিশু-মনকেও ভ'রে দিয়েছিল—মা খুশী হ'য়েছেন, এইতেই আমার পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যেন সার্থক হ'য়েছিল।

আমাদের ছিল গরীব মধ্যবিত্ত সংসার। বাবা তখন মাত্র ৪০ টাকা মাইনেতে এক ইংরিজি সদাগরী-আপিসে চাকুরি ক'র্‌তেন—উদয়-অস্ত ছিল তাঁর খাটুনি। অল্প আয়ে বড়ো সংসার চালানোর ঝক্‌কি সব-ই আমার মায়ের উপরেই প'ড়্‌ত। কত রকম ফিকির-ফন্দী ক'রে তিনি খরচ কমাতে আর আয় বাড়াতে চেষ্টা ক'র্‌তেন। বাড়িতে গোরু রেখেছিলেন; নিজের হাতে ঘুঁটে আর গুল দিতেন; ক্ষারে কাপড়-চোপড় বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় সব সিদ্ধ ক'রে পরিষ্কার ক'র্‌তেন; ঘর-দোর সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে' ক'রে রাখ্‌তেন; রাঁধ্‌তেন; ঠাকুরমাকে একটুও বেশী খাট্‌তে দিতেন না;—এই ধরণের সংসার-ধর্ম করার পিছনে যে কতটা মনের

বল, কতটা সাধনা, কতটা স্বার্থহীনতা আছে, আমরা তখন-ই অস্পষ্ট ভাবে তা অনুভব ক'র্‌তে পার্‌তুম। মায়ের স্মৃতি বাবার কাছেও যে মস্ত বড়ো একটা জিনিস ছিল, তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি—আর সে জিনিসটা আমাদের কাছেও গর্বের বিষয় হ'য়ে আছে। মায়ের হাতের লেখা একটি গান—আমার মায়ের নিজের রচনা—বাবা বাঁধিয়ে' বরাবর তাঁর বিছানার শিয়রে রেখেছিলেন। বেশী বয়সে যখন আমরা মায়ের মৃত্যু-তিথিতে তাঁর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ক'র্‌তে ব'স্‌তুম, তখনও বাবার চোখে জল দেখ্‌তুম।

ছেলেবেলার স্মৃতির কথা উঠ্‌লেই, প্রথমটায় মায়ের আর বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের চোখে জল আসে। জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে মনে হয় যে বরাবর-ই মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে এসেছি।

মা আর বাবার পরেই, ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার কথা মনে হয়। আমার যখন পনের বছর বয়স, তখন অষ্টআশী বছর বয়সে ঠাকুরদাদা গত হন। দীর্ঘকায় সুগৌর সুন্দর পুরুষ ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে ফারসী পড়েন, পরে ইংরিজি। বই প'ড়ে প'ড়ে একটু সংস্কৃতও শেখেন। খুব ভোরে তুলে দিতেন আমাদের, শুয়ে শুয়ে তাঁর মুখে পুরাণের গল্প, চাণক্যের শ্লোক কত শুনেছি। তিনি আমাদের বাল্য-জীবনে পড়াশুনার তদারক ক'র্‌তেন, নানা গল্প শুন্‌তুম তাঁর কাছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি পশ্চিমে ছিলেন শুনেছি—তবে কোথায় কি ভাবে ছিলেন, সে-সব কথা তাঁর কাছে শোনা হয় নি। তিনি অত্যন্ত দরাজ ভাবে খরচ ক'র্‌তেন, অভাবগ্রস্ত কেউ এসে হাত পেতে দাঁড়ালে নিজের কথা না ভেবে শেষ পাই-পয়সাটিও তিনি দিয়ে ফেল্‌তেন। তাঁর মুখে ফারসী বই গোলেস্তান পন্দনামার বয়েৎ শুনেছি, দু-একটি এখনও মনে আছে। আমাদের জ্ঞানগোচর মতন কখনও তাঁকে চাকুরি ক'র্‌তে দেখিনি, বাবা দেবতার আদরে তাঁকে যত্ন ক'রে রেখেছিলেন।

ঠাকুরমা মারা যান প্রায় ৯২ বছর বয়সে, তখন আমার বয়স বছর ২৭।২৮ হবে। কোমর ভেঙ্গে দীর্ঘকাল তিনি শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকেন, তাঁর সেবা ক'রে আমরা ধন্য হ'য়েছিলুম। বাবার বয়স যখন নয়-দশ, অর্থাৎ ইংরিজি ১৮৭০।৭১ সালে, ঠাকুরমা পায়ে হেঁটে শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ-ধাম দেখে আসেন। ক'লকাতা থেকে চাঁদবালী পর্য্যন্ত ইষ্টিমারে কালাপানি পেরিয়ে যান, তারপর হাঁটাপথ। তখন ছিল ভারী বিপৎসঙ্কুল। এমন চমৎকার ক'রে সে-সবের গল্প ঠাকুরমা ক'র্‌তেন, ছেলেবেলায় মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে আমরাও শ্রীক্ষেত্র দেখে এসেছি। সে-গল্পের ছাপ মনের মধ্যে এখনও গভীর-ভাবে আছে। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয়, তাঁর-ই কথায় যতটা মনে আছে লিখে ফেলি—যদি কখনও ফুরসৎ পাই তো লিখে বা'র ক'র্‌বো আশা করি।

অতি শিশুকালে, বোধ হয় তখন আমার বয়স ছ' বছর হবে, সুকিয়াস্‌ ষ্ট্রীটে আমাদের পাড়ার এক পাঠশালাতে প্রথম প'ড়্‌তে যাই। আজকাল শহরে, বিশেষতঃ ক'লকাতায়, সাবেক ধরণের পাঠশালা আর নেই। ক'লকাতার শহরের প্রায় সব রাস্তাতেই খোলার চালের বাড়ি ছিল; অনেক জায়গায় আবার পোড়া-মাটির খোলার বদলে চালে গোলপাতার ছাউনি হ'ত। আগুন লাগার ভয়ে শহরের ভিতরে গোলপাতার ঘর করা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বন্ধ ক'রে দেয়—কিন্তু আমি যখনকার কথা ব'ল্‌ছি, তখন সব রাস্তাতেই দু'চার খানা গোলপাতার ঘর ছিল। সুকিয়াস্‌ ষ্ট্রীটে, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে, মহেশ ঘোষের শিবের মন্দিরের সামনে, এই রকম এক গোলাপাতার ছোট একটি কুঁড়ের সামনে খোলা উঠানে আমাদের পাঠশালা হ'ত। এখানে অল্প কয়দিন মাত্র আমি যাই—এখানকার কথা সব পূরো মনে নেই। তার পরে, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে "ক্যালকাটা একাডেমি" ব'লে একটি উচ্চ-ইংরাজী

ইস্কুলে ভরতি হই—এই ইস্কুলটি এখনও আছে—এখানে বোধ হয় বছর দুই পড়ি—বাঙলা দ্বিতীয় ভাগ, আর ইংরিজি First Book।

১৮৯৮ সালে ক'লকাতায় খুব প্লেগের মড়ক দেখা দেয়, তখন আমরা ক'লকাতা ছেড়ে গঙ্গার ওপারে মামার-বাড়ি হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে গিয়ে মামাদের একটি বাড়িতে এক বছর থাকি। বাবা শিবপুর থেকে খেয়া নৌকা ক'রে গঙ্গা পেরিয়ে রোজ ক'লকাতায় আসতেন আপিস ক'র্তে। শিবপুরে আমরা কোনও ইস্কুলে ভরতি হইনি—দাদাকে আর আমাকে বাবা আর ঠাকুরদাদা ঘরেই পড়াতেন। এইভাবে একটা বছর আমার নষ্ট হয়, ১৫ বছরের বদলে ১৬ বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই। ১৮৯৯ সালে প্লেগের প্রকোপ ক'মৃতে, আবার ক'লকাতাতেই আমাদের আপন বাড়িতে ফিরে আসি। একটা বৎসর আমাদের ক'লকাতার বাড়িতে অন্য লোক ভাড়া ছিল। তখন আমাদের দুই ভাইকে, দাদাকে আর আমাকে, মোতিলাল শীলের ফ্রী অর্থাৎ বিনা বেতনের ইস্কুলে ভরতি ক'রে দেওয়া হয়।

এই ১৮৯৯ সালে আমার ইস্কুল-জীবনের ঠিক-মতো সূত্রপাত হয়। ১৯০৭ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই—১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ এই দীর্ঘ আট বছর এই ইস্কুলের ছাত্র হ'য়ে কাটাই। আমরা চার ভাই প্রত্যেকেই ৮ বছর বা ৭ বছর ক'রে মোতিলাল শীলের দাক্ষিণ্যে তাঁর-ই স্থাপিত ইস্কুলে বিনা বেতনে প'ড়ে মানুষ হই। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নত মস্তকে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই ইস্কুলটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী সুবর্ণ-বণিক্ সমাজের অন্যতম রত্ন ক'লকাতার গৌরব-স্থল মোতিলাল শীল মহাশয় ইংরিজি ১৮৪২ সালে স্থাপিত করেন। একশ' বছরের উপর হ'য়ে গেল, তাঁর টাকায় স্থাপিত এই ইস্কুলটি তাঁর বংশধরদের বদান্যতায় এখনও চ'ল্ছে, শত শত গরীব ছেলেকে বিনা

বেতনে প্রতিবৎসর শিক্ষা দান ক'র্‌ছে। এক ইস্কুলে একাদিক্রমে আট বছর পড়ার একটা মস্ত দিক্ আছে। মাষ্টার মশায়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এর একটা প্রধান লাভ। তা ছাড়া ইস্কুলের সম্বন্ধে একটা আত্মীয়তাবোধ, একটা মমতা-বোধ ঘটে, যেটা জীবনে এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এখনও মোতিলাল শীলের ইস্কুল চিত্তরঞ্জন আভেনিউতে নিজের পুরানো বাড়িতে চ'ল্‌ছে। বাড়িখানিকে তখনকার দিনের ইস্কুলের পক্ষে বেশ বড়োই ব'ল্‌তে হবে—এ রকম নিজ বাড়ি থাকা যে-কোনও ইস্কুলের পক্ষে কাম্য ছিল, আর এখনও আছে ব'ল্‌তে হয়। এই বাড়ির বিশেষ কোনও পরিবর্তন এখনও হয় নি, এখন এই বাড়ির সামনে দিয়ে মাঝে-মাঝে যাবার সময়ে, বাড়ির দিকে তাকালে, কত পুরাতন কথা মনে জাগে।

আমার এই পুরানো ইস্কুলের স্মৃতির সঙ্গে মাষ্টার মশায়দের আর আমার সহপাঠীদের কত কথা জড়িত! ইস্কুলের কথা মনে হ'লেই, তখনকার দিনের অর্থাৎ আজ থেকে ৪৫ বৎসর পূর্বেকার ক'লকাতার দৃশ্য মানস-পটে ভেসে ওঠে। মাষ্টার মশায়রা, যাঁদের চরণের তলায় ব'সে ছেলেবেলার শিক্ষালাভ করি, তাঁদের সকলেই দেহরক্ষা ক'রেছেন। তাঁদের নিয়ে তখন বালক-সুলভ চাপল্যের সঙ্গে কত-ই না ছেলেমানুষী ক'রেছি। এখন মনে হ'চ্ছে তাঁদের অবিরল স্নেহের কথা। সত্যই, প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে আমি ব্যক্তিগত-ভাবে অত্যন্ত প্রীতি যত্ন পেয়েছি। একটা কারণ ছিল, আমি ক্লাসে পড়ায় ভালো ছিলুম। এক অঙ্ক ছাড়া, আর সব বিষয়ে কে[illegible]মাকে হারাতে পার্‌ত না। এজন্য প্রায় সকলেরই প্রিয়-পা[illegible]ছিলু[illegible] ছবিও আঁক্‌তুম ভালোই, তাই ড্রয়িং-মাষ্টার মশায়ও আমার প্র[illegible] পক্ষপাতিত্ব ক'র্‌তেন। আমার ইস্কুলের শিক্ষকদের জ্ঞানের প্রসার বা গভীরতা বেশী ছিল না ;- তবে ইস্কুলের পড়া তাঁরা যেটুকু জান্‌তেন, সেটুকু তাঁরা অকৃপণ-ভাবে উদার হাতে ঢেলে দান ক'র্‌তেন ; তাঁদের

আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছাত্র সবটুকু যেন তাঁদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে পারে। এই জন্যে তাঁদের কথা মনে হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তা না ক'রে পারি না, আমার কোটি কোটি সকৃতজ্ঞ আর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তাঁদের চরণে পোঁছাক। আমাদের ইস্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি ফিফ্থ্ ক্লাসে ইংরিজি আর গণিত পড়াতেন। ভীষণ রাশভারী লোক ছিলেন, তাঁর হুংকারে অতি বড় পাজী ছেলেও ভয়ে কাঁপ্ত। অঙ্কে আমি বড়োই কাঁচা ছিলুম, বার্ষিক আর ষাণ্মাষিক পরীক্ষায় কোনও রকমে পাস ক'রে যেতুম মাত্র। একবার এক ষাণ্মাষিক পরীক্ষায় (পঞ্চম শ্রেণীতে তখন পড়ি) ব্রজেনবাবুর চোখের সামনে অঙ্কে একেবারে গোল্লা পাই—১০০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে একটি শূন্য, একটিও প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর হয়নি। ব্রজেন্দ্রবাবুর অপূর্ব স্নেহ। তিনি আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে, বেশ মিঠে-কড়া ব'ক্লেন, ধমক দিলেন ; আর তাঁর হাতের গাঁট্টা বিখ্যাত ছিল, যেমন ছিল তাঁর বিরাট্ বেত্র-যষ্টি—তাঁর সুদীর্ঘ দেহের মতোই যেন দীর্ঘ—সেই গাঁট্টা গুটিকতক মাথায় মার্লেন। এতে বেশ ভালো ফল হ'ল ; তাঁর স্নেহপূর্ণ আর কর্তব্যনিষ্ঠ মনের পরিচায়ক এই গাঁট্টা —এর দ্বারা, আর আমাদের যুগের Barnard Smith সাহেবের পাটীগণিত বিশেষ প্রচলিত ছিল, সেই Barnard Smith-এর বইয়ের প্রত্যেক অঙ্কটি নিয়মিত-ভাবে তাঁর চোখের সামনে ব'সে-ব'সে কষা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে আমাকে পাটীগণিতে, মায় পরে বীজগণিতে আর জ্যামিতিতেও পোক্ত ক'রে দিলে। ১৯০৭ সালে, এই গাঁট্টার দাওয়াই প্রয়োগের পাঁচ বছর পরে, যখন আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, তখন যে-গণিতের পরীক্ষায় ফেল হবার আশঙ্কা মনে এক সময়ে প্রবল ছিল, তাতে ১৬০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ১২২ পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশ জনের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'র্তে

পারি। আমাদের অধ্যয়নের অন্যতম সার্থকতা হ'য়েছে, যখন ভবিষ্যৎ কালে গর্বের সঙ্গে আমাদের কথা অনুগামীদের কাছে আমার শিক্ষকদের ব'ল্‌তে শুনেছি। যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, তখন হেড-মাষ্টার জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের কী আগ্রহ আর যত্ন, যাতে আমি ভালো ফল করি। তিনি বেতন না নিয়ে পরীক্ষার পূর্বে এসে-এসে আমার পাঠ দেখে যেতেন, প্রবন্ধ লিখ্‌তে দিতেন, সংশোধন ক'র্‌তেন, আর পরীক্ষায় আমি জলপানি পাওয়ায় (আমার মা তখন ছিলেন না) বাবার যত আনন্দ হ'য়েছিল, আমার হেড-মাষ্টার মহাশয়ের আনন্দ বুঝি তার চেয়ে কম ছিল না।

আজকাল ছাত্রদের জন্য ইস্কুল-লাইব্রেরী, কত সুন্দর সুন্দর বই, বাঙলা সচিত্র পুস্তক, আর খেলাধূলোর কত পরিপাটি আয়োজন—এ-সব কি রকম সহজলভ্য হ'য়েছে। আমাদের সময়ে এ-সব কিছু ছিল না। মোতিশীলের বিনা বেতনের ইস্কুল ব'লে, এক এক ক্লাসে অসম্ভব রকম বেশী ছেলে ভর্‌তি হ'ত। নির্দিষ্ট সংখ্যার বালাই ছিল না; আমাদের ক্লাসে অনেক ছেলে, বেঞ্চে স্থানের অভাব ছিল ব'লে, ভূঁয়েই ব'স্‌ত। বিশেষতঃ তখনকার দিনের সাতের আর আটের শ্রেণীতে।

যখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠ্‌লুম, তখন ক'লকাতায় হ্যারিসন রোড আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে YMCA অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় যুবক সংঘের শাখা হিসাবে ইস্কুলের ছেলেদের জন্য একটি ক্লাব খোলা হ'ল—YMCA, Boys' Branch। বাড়ি থেকে ইস্কুলে যাবার পথে পড়ে, আমিও তার সদস্য হই—অল্প চার আনা না আট আনা মাসিক চাঁদায় এই ক্লাবের ব্যায়ামশালা, স্নানাগার, পুস্তকালয়, পাঠাগার, মাসিক নানা অধিবেশন, বাইরে ভ্রমণের সুযোগ, এই-সবের অধিকার মিল্‌ত। এখানে এসে নানা ইংরিজি বই পড়বার সুযোগ হয়, আর এখানকার পরিচালক, ছাত্রদের কাছে প্রিয়, খাসা-বাঙলা-

বলিয়ে’ পাদ্রি আর্থার লি-ফিভর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে এখানে ছাত্রদের তদারক ক’র্‌তে নিযুক্ত হন পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়—ছাত্র-জীবনে এঁর সঙ্গে পরিচয় আর এঁর স্নেহ লাভ আমার পক্ষে একটি বিশেষ আনন্দের স্মৃতি। ওদিকে ইস্কুলে, আমরা জন কয়েক সহপাঠী মিলে চতুর্থ শ্রেণী থেকেই একটি পাঠচক্র সহজ ভাবেই গ’ড়ে তুলি—তা’তে আমার অন্যতম সহপাঠীদের মধ্যে প্রভাত বধন (মেজর পি বর্ধন নামে পরিচিত, জনহিতকর অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ রূপে আত্মদান ক’রেছিলেন) আর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস (ক’লকাতার একটি বড়ো যন্ত্র-পাঁতির আমদানী-কারবারের আর কারখানার মালিক)—এঁরা ছিলেন প্রধান। এই পাঠচক্রে ব’সে ব’সে, দুপুরে টিফিনের ছুটীর সময়ে আমরা তারস্বরে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নানা রকম ইংরিজি বই প’ড়্‌তুম—Dickens, Scott, Dicks ব’লে একজন বাজে ইংরিজি উপন্যাস-লেখকের বই—আর প’ড়্‌তুম স্বামী বিবেকানন্দের রচনা আর বক্তৃতাবলী। এইভাবে কিশোর বয়সে, আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান সংগঠন-কারী, চিন্তা-নেতা আর কর্মী বীর বিবেকানন্দের মহান্ উক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, আর এই পরিচয়কেই আমার ইস্কুলের জীবনে অন্যতম বড়ো জিনিস ব’লে এখন মনে হয়।

ছেলেবেলার কথা ব’ল্‌তে গেলে, সে-সময়কার আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই-একটা কথাও ব’ল্‌তে হয়। আমাদের বাড়িতে ক’লকাতার আর পাঁচটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো নিয়ম ছিল যে সারা মাসের চা’ল, দা’ল, তেল, নুন, ঘী, আটা, গুড়, চিনি, বেনে মশলা প্রভৃতি এক-সঙ্গে কিনে রাখা হ’ত। আলুও মন হিসাবে কিনে ঘরে রাখা হ’ত। খালি চার পাঁচ আনার শাক সব্জী বেগুন পটল মুলো প্রভৃতি, আর চার আনা কি আট আনার মাছ, রোজ বাজার থেকে আসত। শিমলা বাজারের গোবর্ধন পাল—নগেন্দ্রনাথ দে’র

গোলদারী দোকান থেকে ঠাকুরদাদা "মাস-কাবারির বাজার" ক'রে আন্‌তেন, অনেক সময়ে আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতুম। চা'ল তখন বোধ হয় দুই আড়াই টাকা মন ছিল—একবার কিছু বেড়ে যাওয়ায় ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে প'ড়্‌লেন—চার টাকা চালের মন! ছেলেপিলেকে খাওয়াবো কী ক'রে? ঠাকুরদাদা মাছ মাংসের পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি তাঁর নাতীদের গরম ভাত কলাইয়ের দা'ল আর সঙ্গে খুব খানিকটা ঘী, এই খাওয়ানোর পক্ষে ছিলেন। খাঁটি ঘী তখন ছিল ৩২ টাকা মন—ঠাকুরদাদা প্রতি মাসে দশ সের চন্দ্রকোণার মট্‌কি কিংবা হাথরসের দশ-সেরা টিন আন্‌তেন, কখনও মাসের মাঝেও ২।৪ সের বেশী আন্‌তে হ'ত। সারা ছাত্র-জীবনে এই খাঁটি ঘীটুকু ঠাকুরদাদার দয়ায় জুটেছিল। আর সে কী ঘী! অমন দানাদার সুরভি ভয়ষা ঘী আজকাল তো অলভ্য। এই ঘীয়ের জোরেই শরীর ভালো ছিল, পরিশ্রম ক'র্‌তে পার্‌তুম। গরম ভাতে বেশ একখামচা খাঁটি ভয়ষা ঘী, খানিকটা কলায়ের কি সোনা মুগের দা'ল, আর তার উপর আলুভাজা—এই ভোজের স্বাদ এখনও যেন মুখে লেগে আছে। কাপড়-চোপড়ের বালাই খুব ছিল না—এক জোড়া জুতায় বছর চালাতে হ'ত। দাদার জুতো ছোট ভাইয়েরা প'র্‌ত। ছেলেদের জন্য ছাতার পাঠ ছিল না—যেন তেন প্রকারেণ স্লেট মাথায় দিয়ে জল বাঁচিয়ে ইস্কুলে যেতুম বর্ষাকালে। ক'লকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রাম ছিল, আর ছিল শেয়ারের কেরাঞ্চি গাড়ি। শ্যামবাজার, সুকিয়াস্‌ ষ্ট্রীট থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার ৮ পয়সা ৬ পয়সা ৫ পয়সা শেয়ারে চার জন (কখনও ছাতে গাড়ির চালকের পাশেআর একজন) ক'রে কুঠিয়াল বাবুরা আফিস ক'র্‌তে যেতেন। বাড়ি ফেরবার সময়ে বিকালে সকলে বেশীর ভাগ হেঁটেই ফির্‌তেন। আমরা তো রোজই সুকিয়াস্‌ ষ্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড আর হ্যালিডে ষ্ট্রীট (এখনকার চিত্তরঞ্জন আভেনিউ) পর্য্যন্ত হেঁটেই

ইস্কুল ক'র্‌তুম। বাবা ছেলেবেলায় আর যৌবনকালে কুস্তী ক'র্‌তেন, শক্তিশালী ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিল। অল্প-স্বল্প ব্যায়াম করার অভ্যাস আমাদেরও হ'য়েছিল—তা'তে ক'রে শরীর সারাজীবন মোটের উপর ভালোই আছে।

সে যুগে সিনেমা অজ্ঞাত ছিল। চা সবে মাত্র লোকে খেতে শিখ্‌ছে। সিনেমার বদলে ছিল নানা পূজা-পার্বণে যাত্রা—"শখের যাত্রা" বা "পেশাদারী যাত্রা"। থিয়েটার অবশ্য ছিল, কিন্তু পয়সা খরচ ক'রে থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়ার কথা, ইস্কুলের ছেলে কল্পনাও ক'র্‌তে পার্‌ত না। চপ-কাটলেটের হোটেল বা রেস্তোরাঁর সূত্রপাত হ'চ্ছে—মাতালের মুখ-রোচক খোরাক ব'লেই চপ-কাটলেটের দু'-একটা দোকান কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে আর অন্যত্র শুঁড়ীখানার পাশে দেখা দিচ্ছে। তখন আমাদের কাছে লোভনীয় ছিল—বড়বাজারের হিন্দুস্থানী দোকানের শুদ্ধ ঘীয়ে তৈরী পশ্চিমা মেঠাই বোঁদে, কিশমিশের সিঙাড়া, হিঙের কচুরি, মুগদল, অমৃতী, দালমোট, দা'লের সেমুই, মুগের দাল ভাজা, বাদামের আর পেস্তার বরফী, গোলাবজাম, এই সব। আজকালকার ছেলেরা এ-সব শুনে হাসবে।

যা-হ'ক, তখন কর্তা ব্যক্তিদের আজকালকার যুগের মতন এত চিন্তাগ্রস্ত দেখিনি। জীবন কঠিন হ'লেও সহজ ছিল, মোটের উপরে সুখেরই ছিল—ইংরেজের শাসন আর শোষণ সত্ত্বেও। সে জীবন চিরতরে অন্তর্হিত। তখন আমরাও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ্‌তুম, বঙ্কিম আর বিবেকানন্দের রচনা থেকে বাণী থেকে অনুপ্রেরণা পেতুম, স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিচ্ছিলেন প্রাণভরে তাঁদের পূজা ক'র্‌তুম। রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে নেতারূপে দেখা দিয়েছেন। তোষণ-নীতির ভয়াবহ পরিণাম—ভারতের বিভাগ আর পাকিস্তানের স্থাপন—তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৭

শৈশব-স্মৃতি

অতি শিশুকালে, বোধ হয় যখন পাঁচ কি ছয় বছর আমার বয়স হবে, তখন মাস খানেকের জন্য আমাদের পাড়ার এক পাঠশালায় প'ড়্‌তে যেতুম। এ প্রায় ৫৪-৫৫ বছর পূর্বেকার কথা। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, আজকার কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে চাল্‌তা-বাগান পল্লীতে আমাদের বাড়ি ছিল। তখনকার দিনের ক'লকাতার চেহারাই ছিল আলাদা। চোখ বুজে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে, সে যুগের সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের ছবি এখনও বেশ মনে পড়ে। এখন রাস্তার ধারে কোথাও এক ছটাকও খালি জমি দেখা যায় না, কিন্তু তখন এখানে-ওখানে-সেখানে খালি মাঠের ছড়াছড়ি। আর মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পুখুর আর ডোবা। কোঠা বাড়ি এত ছিল না, আর বেশীর ভাগ কোঠা বাড়ি একতলা, সদর দরজার পাশে একটু রোয়াক, ছোট-ছোট জানালা, অনেক সময় জানালার গরাদে' কাঠের, রঙের বদলে বেশীর ভাগ আলকাতরা দিয়ে রঙানো জানালা আর দরজা। খোলার চালের বাড়ি এদিকে-ওদিকে দু'-চারখানা ছিল, কিন্তু গোলপাতায় ছাওয়া, বাঁখারি আর মাটির দেওয়ালের ঘর তখন চারিদিকে দেখা যেত। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট রাস্তায় সকলের চোখে-পড়ার মতো একটি ইমারত ছিল, সেটি এখনও আছে, সেটি হ'চ্ছে মহেশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়। এই মন্দিরটির একটু বিশেষত্ব আছে। এটির মধ্যে এক-ই খিলানের ভিতর ঠাকুরের ঘর—যাকে "গর্ভগৃহ" বলে—আর ঘরের বাইরের দরদালান তৈরী হ'য়েছিল। মদন মিত্রের গলির বাঁক থেকেই এই সাদা শিবের মন্দির আর তার সামনের কতকগুলি না'রকল গাছ দেখা যেত'। এই মন্দিরটি আমার ছেলেবেলার

একটি উজ্জ্বল স্মৃতি। আমার দাদা যে পাঠশালায় প'ড়্তে যেত, সেটি এই শিবের মন্দিরের সামনেই গোলপাতায় ছাওয়া একটি ছোট বাড়ির ভিতরে, খোলা উঠানে ব'স্ত। বাড়িটির দরজা দিয়ে ভিতর থেকে রাস্তার ওপারে মন্দির দেখা যেত'। রাস্তার উত্তর দিকে পাঠশালাটি ছিল, এই পাঠশালা থেকে টানা পশ্চিমে অভয়চরণ লাহার বিরাট প্রাসাদ, আর তার বাইরের ঘোড়ার আস্তাবল পর্য্যন্ত একখানাও কোঠা বাড়ি ছিল না। রাস্তার দক্ষিণ ধারেও শিবালয়ের পরে তাই। দাদা রোজ সকাল বেলা গুড়-মুড়ি, কিংবা বাসী রুটী আর আলু-পটল বা শাক ভাজা আর একটু দুধ খেয়ে পাঠশালা ক'র্তে যেত'। দাদা আমার চেয়ে এক বছরের বড়ো। আমারও খুব ইচ্ছে হ'ত আমিও যাই, কিন্তু যেতে পেতুম না। যে দিন সকালে মা ব'ল্লেন, আজ থেকে তুমি পাঠশালে যাবে, সেদিন আমার কী আনন্দ! দাদা তখনকার দিনের রেওয়াজের মতো তালপাতার পাত-তাড়ি নিয়ে যেত'। হাতে দড়িতে ঝোলানো মাটির দোয়াত, তা'তে চাল পুড়িয়ে হীরাকস আর কী সব মিলিয়ে ঘরে মায়ের হাতের তৈরী কালি থাক্ত, পাছে কালি প'ড়ে যায় সেই জন্য মাটির দোয়াতের ভেতর একটা ছোট ন্যাকড়া পূরে দেওয়া হ'ত, তা'তে কালি চ'ল্কে প'ড়্ত না, আর সঙ্গে থাক্ত একটি খাঁকের কলম। বোধ হয় তখনও স্লেটের প্রচলন তেমন হয়নি। এই পাততাড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে' আর পড়বার বই বর্ণমালা প্রথম ভাগ কি দ্বিতীয় ভাগ আর ধারাপাত, একটা ছোট আসনে বা মাতুরে জড়িয়ে নিয়ে, দাদা পাঠশালায় যেত'। আমাদের সময়ে ছোট ছেলেদের হাফ-প্যাণ্ট পরার রেওয়াজ ছিল না, পাঁচ থেকে ছয়, সাত, আট বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা হয় ধুতি প'র্ত আর নয় দিগম্বর হ'য়ে বেড়াত। ধুতির সামনে কোঁচা ক'রে ছেলে বয়সে আমরা রাখ্তে পার্তুম না। সেই জন্য প্রায়ই আমরা কোঁচা না ক'রে ধুতির সামনেটা দড়ির

মতন ক'রে নিয়ে কোমরে ফাঁস দিয়ে বেঁধে প'র্‌তুম—এ রকম ক'রে কাপড় পরাকে আমরা ব'ল্‌তুম "গেরো দিয়ে কাপড় পরা" ; কোথাও কোথাও একে "রাখালে' গেরো" বলা হ'ত। আমাদের গায়ে ছিটের কামিজ আর গলাবন্ধ কোট ছাড়া অন্য জামা উঠ্‌ত না। দাদার কাপড় আর জামা প'রে আর নোতুন পাততাড়ি নিয়ে যেদিন দাদার পাঠশালায় গেলুম, সেদিনের অস্পষ্ট স্মৃতি কিছু কিছু মনে আছে। সঙ্গে আমার জন্য আলাদা মাতুর সেদিন কেনা হয়নি, ঠিক হ'ল দাদার সঙ্গে এক মাতুরেই ব'স্‌বো। বাড়ির ঝি সেদিন আমাদের সঙ্গে গেল। বাড়ির খুব কাছেই পাঠশালা। ঐ পাঠশালার পাশেই আমাদের মুদির দোকান ছিল, ঝিয়ের সঙ্গে অনেক সময়ে সেখানে যেতুম, যখন ঝিকে দিয়ে কিছু কিন্‌তে পাঠানো হ'ত। এই মুদির দোকানের কথা পরে ব'ল্‌ছি।

পাঠশালার বাড়ির ভিতরে গিয়ে মনটা একটু দ'মে গেল। অতি সাধারণ গোলপাতা-ছাওয়া কুঁড়ে কতকগুলি। রাস্তার ধারে যে ঘরগুলি, সেগুলির দরজা রাস্তার উপরে, তাতে কতকগুলি হিন্দুস্থানী কাহার আর ভারী অর্থাৎ মুটে' থাক্‌ত। এই ঘরগুলো, আর বাড়ির ভিতরে আর এক সারি ঘর, আর মাঝখানে উঠোন। গুরু মশাই তাঁর স্ত্রী আর ছেলেপুলে নিয়ে উঠোনের পাশে একটি ঘরে থাকতেন, আর দু'-তিনখানি ঘরে অন্য ভাড়াটে' থাক্‌ত। এই ঘরগুলির সামনে একটু দাওয়া বা রোয়াক, তাতে একসারি চক্‌চকে হ'লদে বাঁশের খুঁটি, খুঁটির মাথায় বাঁখারিতে তৈরী চালের বাতা, তার উপর গোল-পাতার ছাউনি। গুরু মশাই উঠোনে দাওয়ার সামনে একখানি ছোট কাঠের টুলের উপর ব'স্‌তেন। একখানা মোটা কাগজে জড়ানো কতকগুলি কাগজপত্র তাঁর হাতের কাছে থাক্‌ত, আর থাক্‌ত দোয়াত কালি। তিনি মাঝে মাঝে অন্য লোকের হ'য়ে চিঠি লিখে দিতেন, আর হিসেব ক'রে দিতেন। একগাছা লম্বা বেতও

তাঁর হাতের কাছে থাক্‌ত। আর থাক্‌ত একটি ডাবা হুঁকো, তার গলায় একটি দড়ি বাঁধা, এই দড়ি দিয়ে হুঁকোটি যখন তিনি তামাক খেতেন না একটি বাঁশের খুঁটির গায়ে পেরেকে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন। গুরু মশায়ের সামনে উঠোনের উপরে দু'-তিন সার ছেলে নিজেদের আসন মাদুর পেতে, লম্বা সার দিয়ে ব'স্‌ত। সামনে তাদের পাত-তাড়ি আর দোয়াত কলম। আমি দাদার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালুম, ঝি গিয়ে গুরু মশাইকে ব'লে দিলে যে, আজ থেকে আমি পাঠশালায় ভর্‌তি হ'লুম। গুরু মশাই বেশ খুশী-ই হ'লেন, তার পরে আমাকে ডেকে উৎসাহ দিলেন, "বেশ, বেশ, আজ থেকে রোজ সকালে পাঠশালে আস্‌বি, আর আসবার সময় কান্নাকাটি ক'র্‌বিনি, আর মন দিয়ে প'ড়্‌বি ; নইলে এই বেত দেখ্‌ছিস্‌ তো, বেত মেরে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় ক'র্‌বো।" ছেলেবেলায় বাবাকে বড়ো ভয় ক'র্‌তুম, কিন্তু গুরু মশায়ের এই কথায় বড়ো ভয় হ'ল। আমি ঘাড় নেড়ে ব'ল্‌লুম, "হ্যাঁ, মন দিয়ে ভালো ক'রে প'ড়্‌বো।" তার পরে দাদার পাশে এসে ব'সে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

এই পাঠশালে কত দিন প'ড়েছিলুম মনে নেই। বোধ হয় মাস খানেক কি বড়ো জোর মাস দু'য়েক হবে। বাড়িতেই মায়ের কাছে বর্ণপরিচয় হ'য়েছিল। যাদের পাঠশালায় "হাতে-খড়ি" হ'ত তারা প্রথমটায় বোধ হয় রামখড়ি দিয়ে মাটিতে গুরু মশায়ের হাতের লেখা অক্ষর ধ'রে "দাগা বুলোত"। গুরু মশায় যেমন যেমন "দেগে দিতেন", তেমনি তেমনি ছেলেরা লিখ্‌তে শিখ্‌ত। তখন ব্ল্যাকবোর্ডের কথা পাঠশালায় কেউ জান্‌ত-ই না। মাটিতে দাগা বুলোনোর পর তাল-পাতায় কালি-কলম দিয়ে ছেলেরা লেখায় "হাত পাকাত"। আমার দাদাকেও তালপাতায় লিখ্‌তে হ'য়েছিল, আর আমিও কিছু দিন ঐ তালপাতাতেই পাঠশালায় ব'সে ব'সে লিখ্‌তাম। বাড়ি ফিরলে পরে, লেখা তালপাতাগুলি মা ধুয়ে দিতেন, তার পরের দিন

আবার এই ধোয়া পরিষ্কার পাতায় লেখা চ'ল্‌ত। যারা দু'-চার পয়সা খরচ ক'র্‌তে পার্‌ত, সেই-সব ছেলে কালি-কলম দিয়ে কাগজের উপরে "হাত পাকাত"। এই কাজের জন্য এক রকম পাতলা বাদামী বা হ'লদে কাগজ ব্যবহার হ'ত, সেই কাগজকে "বালির কাগজ" ব'ল্‌ত। এক ভাঁজ ক'রে একটা কাগজ মুড়ে বড়ো বড়ো আকারে খাতা হ'ত। সেই খাতায় একবার নয়, দু'বার, তিন বার, কখনও-কখনও চার-পাঁচ বার সোজা ভাবে আবার আড়াআড়ি আমরা লিখ্‌তুম—বাঙ্‌লা, আর তার পরে যখন ইংরিজি ধরি, তখন ইংরিজি। এই রকম, লেখার উপর বার বার লেখাকে আমরা ব'ল্‌তুম "মক্‌শ" করা। "মক্‌শ" ক'রে ক'রে কোনও কোনও পাতায় ফাঁক আর দেখা যেত না। আমি বোধ হয় পাঠশালাতেই কাগজে লেখা শুরু ক'রেছিলুম।

আমাদের গুরু মশাইটির চেহারা প্রায় ভুলে গিয়েছি। তবে আবছা-আবছা মনে হয়, তিনি পাতলা একহারা চেহারার লোক ছিলেন, খালি গায়ে টুলে ব'সে আমাদের পড়াতেন বা লেখাতেন। তাঁর হাতের কাছে বেত থাক্‌লেও তিনি বেতের ব্যবহার বড়ো একটা ক'র্‌তেন না। পাঠশালা বন্ধ হবার আগেই খানিকক্ষণ ধ'রে আমাদের "ধারাপাত" মুখস্থ করানো হ'ত। দু'জন "সর্দার প'ড়ো" বা প্রধান ছাত্র সুর ক'রে ক'রে "শট্‌কে'" বা "শতকিয়া", কড়াকে' প্রভৃতি এক'শ পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে ব'ল্‌ত, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে সেই রকম সুরে ব'লে যেতুম। এই ভাবে "নামতা" বা গুণফল আমরা অভ্যাস ক'র্‌তুম। এই সুর ক'রে ধারাপাত মুখস্থ করা, এটা আমার বেশ লাগ্‌ত—বিশেষ ক'রে যখন জান্‌তুম যে, ধারাপাত আবৃত্তি করার পরেই সারা দিনের মতো ছুটি।

পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে মহেশ ঘোষের শিবালয়টি রোজই একবার ভালো ক'রে দেখে নিতুম। মন্দিরের মধ্যে একটি

কালো পাথরের বিরাট্ শিবলিঙ্গ আছে। সেটি খুব পালিশ করা, চক্‌চকে’। ইচ্ছে হ’ত, শিবলিঙ্গটির গায়ে একটু হাত বুলিয়ে’ দিই। পরে একটু বড়ো হ’য়ে এই মহেশ ঘোষের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলুম। মহেশ ঘোষ আমাদের পাড়ায় সেকালে ছিলেন যাকে ইংরিজিতে বলে একটি character অর্থাৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। মহেশ ঘোষ অশিক্ষিত ছিলেন। পাড়ার লোকেরা তাঁকে সহজ ভাবে “ময়শা গয়লা” ব’লে উল্লেখ ক’র্‌ত। বাবার ছেলেবেলায় মহেশ ঘোষ বৃদ্ধ হ’য়ে গিয়েছিলেন। তিনি জাতিতে সদ্‌গোপ ছিলেন, আর পেশা ছিল গোরু রেখে দুধ বিক্রি। তাঁর এক বিরাট্ গোহাল ছিল। এ-সব আমাদের জন্মাবার ঢের আগেকার কথা। বড়ো-বড়ো হাঁড়ি ক’রে তাঁর দুধ নোতুন বাজারে বিক্রি হ’তে যেত (চিৎপুর রোডের ধারে বীডন্ স্কোয়ারের সামনে)। মহেশ ঘোষ খুব খাঁটি মানুষ ছিলেন, তাঁর একটা গর্বের বিষয় ছিল যে তাঁর দুধে তিনি কখনও জল মেশাতেন না। মহেশ ঘোষের চাকরেরা সুবিধে পেলেই দুধে জল ঢাল্‌ত, আর এই ভাবে কিছু পয়সা ক’র্‌ত। এক দিন নোতুন বাজারে অন্য গোয়ালাদের সঙ্গে মহেশ ঘোষের ঝগড়া হয়, মহেশ ঘোষ জাঁক ক’রে বলেন যে কেবল তাঁর-ই দুধ খাঁটি থাকে, একটুও জল দেওয়া হয় না। কিন্তু সেদিন দুধে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর ক’রে দেখানো হ’ল যে, তাঁর দুধেও জল ঢালা হয়। এইতে মহেশ ঘোষ দিব্যি গাল্‌লেন, তাঁর দুধ এইবার থেকে ভিজে গামছা দিয়েও ছাঁকা হবে না; আর তাঁর চাকরদের উপর এমনি কড়া নজর রাখবেন যে দুধে জল আর প’ড়্‌বে না। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষাও ক’রেছিলেন, আর শেষে তাঁর দুধের খুব সুনামও হয়। তখন নাকি না’রকল মালায় ক’রে দুধ মেপে বিক্রি হ’ত—না’রকল মালায় বাঁশের বাঁখারির হাতল, ঠিক যেন বড়ো হাতা। আর সকলের দুধের চেয়ে, মহেশ ঘোষের দুধের জন্যে মালা-পিছু এক পয়সা বা

দু'পয়সা ক'রে বেশী দাম ধরা ছিল। এই ভাবে তাঁর দুধের ব্যবসায় খুব ফেঁপে ওঠে, আর তাঁর গোহালে অনেক গোরু আসে। পরে মহেশ ঘোষ বুড়ো হ'য়ে—কেন তা জানি না—তাঁর দুধের ব্যবসায় বন্ধ ক'রে দেন, আর সব দামী গোরু বিক্রি ক'রে দেন। সঞ্চিত টাকা, আর ব্যবসায় তুলে নেবার সময় সব গোরু বিক্রি ক'রে যে টাকা পান, দুই মিলিয়ে' তিনি এই মন্দির করেন।

বাবার কাছে শুনেছি, মহেশ ঘোষ মন্দির তৈরী ক'রবার জন্য একটি হিন্দু বাঙালী মিস্ত্রীকে কোন্ পাড়াগাঁ অঞ্চল থেকে ক'লকাতায় আনেন। তখন এই সব অখ্যাত, অজ্ঞাতনামা হিন্দু আর মুসলমান গ্রাম্য মিস্ত্রী, প্রাচীন পদ্ধতি ধ'রে, অবলীলাক্রমে বড়ো-বড়ো দু'তিন তলার প্রাসাদ, ছোটো-বড়ো নানা রকমের মন্দির আর অন্য ইমারত তৈরী ক'রতে পার্‌ত। এই মিস্ত্রী খুব ওস্তাদ কারিগর ছিল, আর মহেশ ঘোষকে অনেক সময় যা-তা ব'ল্‌ত। কিন্তু গুণী লোক ব'লে মহেশ ঘোষ কিছু ব'ল্‌তেন না। এক দিনের কথা বাবার কাছে শুনেছিলুম, মন্দির-নির্মাতা মিস্ত্রী এক দিন মহেশকে ডেকে ব'ল্‌লেন, মন্দিরের কাজের জন্য একখানি ভালো দই চাই। মহেশ ঘোষ ভাবলেন, মন্দিরের গাঁথুনির জন্য মশলায় হয়-তো দই লাগ্‌বে। তাই তিনি খুব ভালো একখানি দই তৈরী করিয়ে' আনালেন। তখন মন্দিরের পূরো গাঁথুনিও হয়নি। দইয়ের হাঁড়ি পেয়ে মিস্ত্রী বাঁশের ভারা বেয়ে একেবারে উঁচু মন্দিরের যতটা গাঁথা হয়েছিল তার উপরে গিয়ে ব'স্‌ল, আর ব'সে-ব'সে দইয়ের সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে লাগ্‌ল। মহেশ ঘোষ তো চ'টে আগুন। মিস্ত্রী ব'ল্‌লে—শরীরটা একটু খারাপ ছিল —মনে হ'ল, একখানা ভালো দই খেলে আবার একটু চাঙ্গা হওয়া যায়, তাই তো তোমাকে ব'ল্‌লুম। আর দই খেয়ে এই হাতে যা কারিগরি দেখাবো, তাতে তোমার মন্দির চিরকালের মতো থাক্‌বে।

মহেশ ঘোষের নামে একবার একখানা ইংরিজি ওষুধের বিজ্ঞাপনের পুস্তিকা এসে প'ড়েছিল। বোধ হয় ক'লকাতার রাস্তার ডাইরেক্টরী দেখে সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটে অবস্থিত বাড়ির মালিকদের নামের মধ্যে মহেশ ঘোষেরও নাম পেয়ে, বিলেত থেকে পাঠিয়ে' দেয়। Mother Sigel's Syrup এই ওষুধের নাম। মহেশ ঘোষ এই বিজ্ঞাপন পুস্তিকাখানি পেয়ে বড্ড খুশী হ'ন, আর যত্ন ক'রে বইখানি রেখে দেন। আর যে তাঁর বাড়িতে আস্‌ত, তাঁকে এই বইখানি দেখাতেন, আর বিশেষ গর্বের সঙ্গে ব'ল্‌তেন, "দেখেছ, বিলেতেও আমাকে চেনে।" হিন্দু আর মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি এই গল্পটি ব'ল্‌তেন—"আগে হিন্দু আর মুসলমান দুইয়ে এক ছিল, দুই জা'ত তখন ছিল না। তখন সকলেই দু'খানি শাস্ত্রগ্রন্থ মান্‌ত,—একখানির নাম 'পুরাণ,' আর একখানির নাম 'কোরান'। মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষেরা হিন্দুদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোরান বইখানি নিয়ে আলাদা হ'য়ে গেল। আর যাদের কাছে পুরাণ র'য়ে গেল, তাদেরই নাম হিন্দু। আবার যখন পুরাণ আর কোরান এক হ'য়ে যাবে, তখন হিন্দু আর মুসলমানও এক হ'য়ে যাবে।" এই গল্পটি তিনি ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তেন।

আমাদের পাঠশালায় যাবার পথে সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের উপরে একটা মস্ত মুদীর দোকান ছিল। আমাদের সংসারের "মাসকাবারী বাজার," প্রতি ইংরিজি মাসের গোড়ায় বাবা মাইনে পাবার দু'-এক দিনের মধ্যেই আনা হ'ত। ঠাকুরদাদা সাধারণতঃ এই বাজার ক'রে আন্‌তেন। হেদুয়া পুখুরের কাছে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে এক বড়ো বাজার ছিল—শিমলার বাজার। সেই বাজারের সামনে খুব বড়ো একখানা গোলদারী দোকান ছিল, ৺গোবর্ধন পাল আর শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে—এঁদের দোকান ছিল। ঠাকুরদাদা এই দোকানকে "গোবর্ধন মুদী"র দোকান ব'ল্‌তেন। সারা মাসের উপযোগী চা'ল, দা'ল, তেল, ঘী,

গুড়, চিনি, নুন, আটা, ময়দা আর মশলা সংগ্রহ ক'রে রাখা হ'ত। একটু বড়ো হ'য়ে ঠাকুরদার সঙ্গে এই দোকানে আমিও যেতুম। সেখানে বিরাট্ বিরাট্ বস্তার মধ্যে মণ মণ রকমারী চা'ল, সে-রকম বিরাট্ আকারের জালার আর গামলার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দা'ল, মাটির মট্‌কীর মধ্যে আর ছোটো-বড়ো টিনের মধ্যে ঘী, ঘরের অর্ধেকখানা জোড়া গুড়ের নাগড়ি, সিমেণ্টের চৌবাচ্চা ভর্‌তি নুন, এ-সমস্ত আমার শিশু-মনকে তখন যেন অভিভূত ক'রে ফেল্‌ত। ক্রমাগত নানান রকমের জিনিস, কাঁচা খাদ্যদ্রব্য, বড়ো-বড়ো দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন হ'চ্ছে; খ'দ্দেরের ভীড়; একটি ছোটো বাক্স কোলের সামনে রেখে দোকানের মালিকেরা লম্বা সরু কাগজের ফালির উপর খস্‌খস্ ক'রে ফর্দ লিখ্‌ছেন, মুখে-মুখে হিসেব ক'রে টাকার অঙ্ক ফেল্‌ছেন; বাইরে ঝাঁকা নিয়ে ডজন খানেক পশ্চিমা মুটে' অপেক্ষা ক'র্‌ছে, ভিতরে এসে মাল ওজন ক'র্‌ছে, এরাই জিনিস-পত্র ঝাঁকায় ভ'রে মাথায় ক'রে খ'দ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দেবে। শিমলের বাজারে এই বড়ো মুদীর দোকানের কর্মব্যস্ততা আমার মনের উপর তখন খুবই ছাপ দিয়েছিল। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের মুদীর দোকানটি এত বড়ো ছিল না। সেখানে ঝিয়ের সঙ্গে কখনও কখনও ছোটো-খাটো দু' একটা জিনিস আন্‌তে যেতুম—হয়তো সাগু বা মিছরির দরকার, কিংবা ঘী বা তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, তখন এই দোকান থেকেই আনা হ'ত। এই দোকানটিকে আমরা দোকানীর নামে "উত্তম-মুদীর দোকান" ব'লে জান্‌তুম। দোকানের চারিদিকে নানা ধামার মধ্যে, মাটির গামলায় আর হাঁড়িতে চা'ল, দা'ল প্রভৃতি জিনিস রেখে, সামনে তেলের আর ঘিয়ের হাঁড়ি নিয়ে, বাঁশের উঁচু মাচার উপরে পসার সাজিয়ে' দোকানী ব'সে জিনিস বিক্রি ক'র্‌ত। খ'দ্দেরের বাটিতে বা অন্য পাত্রে একটি ছোট ছেঁদাওয়ালা কাঠের খুরির মতন পাত্রের মধ্য দিয়ে বাঁশের হাতাওয়লা না'রকেল মালায় ক'রে হাঁড়ি থেকে তেল নিয়ে



ঢাল্‌ত—ঐ কাঠের ছেঁদা-খুরিটি ফুন্দিলের কাজ ক'র্‌ত, তেল চারি-দিকে ছড়িয়ে' প'ড়্‌ত না। মুদীর সামনেই একটা মাটির গামলায় এক গামলা কড়ি থাক্‌ত, আর সেই কড়ির গামলার উপর একটি কাঠের বারকোশ। সেই বারকোশটি ছিল তখনকার দিনের দোকানের counter ; তার উপর জিনিস-পত্র রাখা হ'ত—খ'দ্দেরের বাটি, ঘটি, বোতল আর ওজন-করা জিনিসের ঠোঙা। কড়ির পাট আজকাল উঠে গিয়েছে। আমি যখন অতি শিশু, তখনও দোকানে কড়ি চ'ল্‌ত। আমার যত দূর মনে পড়ে, এক পয়সায় আশিটি কড়ি ছিল, আর পাঁচ গণ্ডা বা দশ গণ্ডা কড়ি নিয়ে অর্থাৎ কুড়ি বা চল্লিশটি কড়ি নিয়ে লোকে আধ পয়সা বা সিকি পয়সার জিনিস কিন্‌ত। আমাদের সময় সিকি-পয়সা সিকি-পয়সা ক'রে, এক পয়সায় চার রকম জিনিস কেনা যেত'। কড়ির ব্যবহার চট্‌ ক'রে উঠে গেল, জিনিস-পত্র দুর্মূল্য হবার সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু এখনও আমরা ব'লি, "তার অনেক টাকা-কড়ি আছে"। উত্তম-মুদীর দোকানে বারকোশ-কাউণ্টারের সামনে মাচার উপরে একটি ছোটো কাঠের চৌকির উপরে দোকানদার ব'স্‌ত। তার পাশে, মাথায় ছেঁদাওয়ালা একটা বাক্স থাক্‌ত, তার ভিতর টাকা-পয়সা ফেল্‌ত। দূরের গাম্‌লা বা ধামা থেকে কোনো জিনিস নিতে হ'লে, খুব লম্বা, বাঁশের হাতলে বড়ো মালা লাগানো থাক্‌ত, তাই দিয়ে জিনিস তুলে নিত'। একটা জিনিস আমার বেশ লাগ্‌ত, উপরের চালের বাঁশ থেকে একটা মোটা শক্ত দোড়ি মুদীর মাথার কাছে ঝুল্‌ত, তার তলায় কতকগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুঠো ক'রে বেশ একটা ধর্‌বার জায়গা, যাতে হাত পিছ্‌লে না যায়। উঠে দাঁড়াতে হ'লে মুদী ঐ দোড়ি ধ'রে উঠ্‌ত, আর দূরের জিনিস নিতে হ'লে দোড়ি ধ'রে ঝুঁকে' নিত'। এখন শহরে এ রকম দোকান উঠে যাচ্ছে। সুকিয়াস্‌ ষ্ট্রীটের এই অঞ্চলটায় এখন পশ্চিমে' পুরানো-লোহাওয়ালাদের গুদাম আর

গদি হ’য়েছে। আর তাদের সব দো-তলা মাটকোঠা উঠেছে। অন্য প্রদেশের লোক এসে পাড়ার চেহারা একেবারে ব’দ্‌লে দিয়েছে।

উত্তম-মুদীর দোকানের প্রায় সামনে, রাস্তার ওধারে একটি মুড়ি-মুড়কির দোকান ছিল। দোকানটি চালাত’ একটি দাড়িওয়ালা বুড়ো বামুন, অতি রোগা হাড়-বা’র-করা চেহারা। একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোকও এই বামুনের সঙ্গে দোকানের মালিক ছিল। এখানে মুড়ি, মুড়কি, খই, চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা, ছাতু এই সব তখনকার দিনের সাধারণ জলখাবার বিক্রি হ’ত। আর বিক্রি হ’ত, নানান রকমের তেলে-ভাজা খাবার—সকালে বিকালে দা’ল-বাটার ফুলুরি, বেগুনি, পেঁয়াজি, কচুরি, সিঙাড়া প্রভৃতি, আর গুড়ে পাকানো কট্‌কটে নাড়ু, চালের গুঁড়ো তিল আর গুড়ের তৈরী আনন্দনাড়ু, যা গৃহস্থ-বাড়িতে পৈতে, ভাত প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানে তৈরী হ’ত, আর কুঁচো গজা—গুড়ের রসে ফেলা তেলে ভাজা পাতলা-পাতলা গজা। আর শীতকালে, ‘মুড়ির চাক,’ ‘চিঁড়ের চাক’ আর ‘ছোলার চাক’—মুড়ি, চিঁড়ে-ভাজা আর ছোলা-ভাজা গুড়ে পাক ক’রে, হাতের চাপে গোল-গোল চাক্‌তি করা। ভালো খাবারের দোকান পাড়ায় ছিল না, একটু দূরে ছিল, সেইজন্য এই-সব খাবার-ই আমাদের কাছে বড়ো লোভনীয় ছিল। দোকানের মালিক বামুন ঠাকুর মিষ্টান্ন তৈরী ক’র্‌ছে, মালপো ভাজ্‌ছে খই আর গুড় দিয়ে মুড়কি তৈরী ক’র্‌ছে, আর স্ত্রীলোকটি বালির খোলায় মুড়ি ভাজ্‌ছে,—পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াবার শক্তি হ’ল, তখন লোভী চোখে কত দিন দাঁড়িয়ে এই-সব ব্যাপার দেখেছি। এখনকার দিনের শহরের ছেলেরা যারা চকোলেট, টফি আর পেস্ট্রির মর্ম বুঝেছে, তারা কুঁচো গজা আর তিলকুটোর স্বাদ বুঝ্‌বে না। তখন ঐ মুড়ি-মুড়কির দোকানে কাঁদি-শুদ্ধ কলা বিক্রির জন্য ঝুল্‌ত—এক পয়সায় ছ’টা, একটু বড়ো হ’লে চারটে ক’রে

চাঁপা কলা পাওয়া যেত'; ভালো চাটিম মর্তমান কলা পয়সায় দু'টো বা একটা ছিল—পরে দু'পয়সায় একটাও হয়।

আমাদের ছেলেবেলায় স্বয়ংগচ্ছ যান অর্থাৎ মোটর কার, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, বাস্‌, এ-সব হয়নি। একটু সংগতিপন্ন ব্যক্তির বাড়িতেই গাড়ি আর ঘোড়া থাক্‌ত। এই গাড়ি আর ঘোড়া আমাদের শিশুজীবনের অভিজ্ঞতার আর কল্পনার অনেকখানি জুড়ে' থাক্‌ত। আমার মামার বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি ছিল। পাড়ার ধনী পরিবার লাহাদের বাড়িতে বড়ো-বড়ো ঘোড়া আর গাড়িও ছিল। আজকালকার ছেলেরা এই ঘোড়ার প্রতি আমাদের শিশুমনের আকর্ষণ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। শহরের ছেলেদের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে মাতামাতি আজকাল আর দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই "ঘোড়া ঘোড়া" খেল্‌তুম। এক জন হ'ত ঘোড়া, তার মুখে দোড়ির লাগাম লাগিয়ে' পিছনে-পিছনে ছুটে আর এক জন সেই ঘোড়া চালাত'। নিজেরাও ঘোড়া সেজে, ঘোড়ার অনুকরণে কত রকম দৌড়-ঝাঁপ আমরা ক'র্‌তুম। আমাদের বাড়ির কাছে কিছু দিনের জন্য এক ভাড়াটে'-গাড়ির আড্ডা বসেছিল। লাহা বাবুদের মাঠে এক বিরাট্‌ মাটকোঠা উঠ্‌ল, তার নিচে গোটা কুড়ি-পঁচিশ ঘোড়ার আস্তাবল, আট-দশখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি, তার বেহারী সহিস আর গাড়োয়ান। ঘোড়ার পাশেই খাটিয়া পেতে তারা শুত'। মাট-কোঠার উপরের তলায় এই ঘোড়া আর গাড়ির মালিক একজন খুব জবরদস্ত হিন্দুস্থানী বিধবা মহিলা থাক্‌ত। ঘোড়া আজকাল ছেলেরা তাদের কল্পনা থেকে অনেকটা হারিয়ে' ফেলেছে—এখন তারা রোল্‌স্‌-রয়েস নিয়ে রোমান্স করে। কে এক জন বলেছিলেন, গোলা-বারুদ কামান এসে সাবেক কালের chivalry—"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি" নারীর রক্ষক বীর যোদ্ধাদের পাট—তুলে' দিয়েছে।

আমার মনে হয়, আজকাল যন্ত্রচালিত গাড়ি এসে ঘোড়ার অন্ন যেমন মেরে দিয়েছে, তেমনি আমাদের জীবনে প্রাচীন কাল থেকে যে রোমান্সের ধারা চ'লে এসেছে তাকেও বাতিল ক'রে দিয়েছে। Other times, other manners—যা অবশ্যম্ভাবী, যা ভবিতব্য, তা হবেই, কিছু-ই চিরস্থায়ী থাকে না। কিন্তু ছেলেবেলার আকর্ষণ, বিদেশী বা ভারতীয় Knights in armour, on horseback, কিংবা মহাভারতের বা ইলিয়াদের দু'চাকার ঘোড়ায়-টানা রথে অর্জুন আর আখিল্লেউস্—এদের উজ্জ্বল স্মৃতি ঘোড়া, আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে চ'লে যাওয়ায়, আমাদের শিশু বা কিশোর-মনকে আর আগেকার মতন আকুল ক'রে তুল্‌বে না॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৮

হেড-পণ্ডিত মশায়

আমরা ইস্কুলে হেড-পণ্ডিত মশায়ের পূরো নামটা ভালো ক'রে জান্‌তুম না। প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন বোধ হয় তাঁর নাম ছিল, কিন্তু আমরা সকলে "হেড-পণ্ডিত মশায়" ব'লে উল্লেখ ক'র্‌তুম, আর তাঁর পিছনে ছাত্রেরা সকলেই তাঁকে "পাগলা পণ্ডিত মশায়" ব'লে অভিহিত ক'র্‌ত। আমাদের ইস্কুলে আটটি শ্রেণীতে আটজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা ইংরিজি পড়াতেন, আর এঁদের নাম ধ'রেই ক্লাসগুলির নামকরণ করা হ'ত। যেমন, অমুক বাবুর ক্লাস, অর্থাৎ যে ক্লাসে তিনি ইংরিজি পড়াতেন। তখন ক্লাসের সংখ্যাকরণ অন্যভাবে হ'ত —এ আমি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর পূর্বেকার কথা ব'ল্‌ছি। ইস্কুলের সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আট। আর যে শ্রেণীতে উঠে তখনকার দিনে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশান) দিতে হ'ত, সে শ্রেণী ছিল ফার্স্ট ক্লাস বা প্রথম শ্রেণী। উপরের কয়টি ক্লাসে গণিত, ইতিহাস আর ভূগোল পড়াবার জন্য দু'জন শিক্ষক ছিলেন; আর দু'জন পণ্ডিতমশায় ছিলেন—একজন হেড-পণ্ডিত মশাই, যাঁকে আমরা "পাগলা পণ্ডিত মশায়" ব'ল্‌তুম, তিনি উপরের চার শ্রেণীতে (ফোর্থ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস পর্য্যন্ত) আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন, আর নিচের চার ক্লাসের জন্য বাঙলা পড়াতেন রাম পণ্ডিত মশায়। তখনকার দিনে একখানি বাঙলা গদ্য-পদ্য সংগ্রহ ছাড়া আর কোনও বাঙলা বই পড়ানো হ'ত না। বাঙলার ক্লাসটা নিতান্তই ফাঁকির ক্লাস ছিল। রাম পণ্ডিত মশায় হয়-তো আমাদের কিছু ডিক্‌টেশ্যন্ দিতেন, নয়-তো পাঠ্য পুস্তক ধ'রে দুই-একটি শক্ত কথার মানে ব'লে দিতেন। ব্যস, এইতেই কাজ হ'য়ে যেত। বাঙলা ব্যাকরণের পাট আমাদের এই হাই-স্কুলে ছিল না। তবে যে-সব

ছেলে মিড্‌ল্‌-ইংলিশ ইস্কুলের পড়া সমাধা ক'রে উপরের ক্লাসে যোগ দিতে আস্‌ত, তাদের রীতি-মতো বাঙলা মায় ব্যাকরণ পর্য্যন্ত শিখ্‌তে হ'ত। সেকালে যখন এ-রকম বাঙলা ইস্কুল থেকে পাস-করা ছেলে আমাদের ইস্কুলে ফোর্থ ক্লাসেভর্‌তি হ'ত—তখন দেখ্‌তুম, তারা ইংরিজি ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদে: থেকে ঢের এগিয়ে আছে। বাঙলা ভাষায় আগত সমস্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি তারা জান্‌ত। সন্ধি, ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান, কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয়—তারা সব-ই জান্‌ত। এ-সব বিষয়ে আমরা ছিলুম একেবারে নিরেট। যাই হ'ক, ইংরিজি ইস্কুলে ইংরিজির উপর জোর দেওয়া হ'ত। আমরা ইংরিজি প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে যতটুকু শিখে নিতুম, বাঙলার পক্ষে তা'ই যথেষ্ট হয়েছিল। তাই সম্বল ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা বাঙলা লিখেছি, আর তাতে আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি।

রাম পণ্ডিত মশায় অনেক দিন, বিশেষতঃ গ্রীষ্মের দিন ঘুমিয়েই কাটাতেন। দুই-একটি উৎসাহী ছেলে তাঁকে ঘুম পাড়াবার জন্য পয়সা খরচ ক'রে বরফ কিনে এনে বরফ-জল ক'রে খাওয়াত'। খাতা দিয়ে বাতাস ক'র্‌ত। পণ্ডিত মশায় দশ-পনেরো মিনিট দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। আমাদের উপর হুকুম ছিল, আমরা যেন বেশি চেঁচামেচি না করি; আর দুটি ছেলেকে পাহারার কাজে লাগিয়ে' দেওয়া হ'ত—হেড-মাষ্টার মশায় অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায় ক্লাসের দিকে আস্‌ছেন যদি দেখা যেত, তখন-ই তাঁকে জাগিয়ে' দিতে হ'ত। পণ্ডিত মশায় সকলের উপর খুশী ছিলেন, আর তাঁর ঘণ্টাটাকে ছুটির ঘণ্টা ব'লে আমরা মনে ক'র্‌তুম। এই-ভাবেই আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করা হ'ত।

কিন্তু যখন আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে উঠ্‌লুম, তখন সংস্কৃত আরম্ভ ক'র্‌তে হ'ল হেড-পণ্ডিত মশায়ের কাছে। এখানকার ব্যবস্থা উল্টো। নিচের ক্লাসটিতে রাম পণ্ডিত মশায় ছিলেন অত্যন্ত মোলায়েম—

টাক-মাথা গৌর-বর্ণ পুরুষ, সদাই মুখে হাসি লেগে আছে, ছেলেদের সঙ্গে বেশ আত্মীয়তা ক'রে কথা ব'ল্‌তেন। আর হেড-পণ্ডিত মশায় তার একেবারে উল্টো। একটু ময়লা রঙের দীর্ঘকায় পুরুষ, রাম পণ্ডিত মশায়ের মতো তাঁর গায়ে কখনো কামিজ বা পিরহান দেখি নি, ধুতি প'রে আর চাদর গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে তিনি ইস্কুলে আস্‌তেন। একটি শামুকে ক'রে নস্যি নিয়ে আস্‌তেন, সেটি ট্যাঁকে গুঁজে রাখ্‌তেন, আর মাঝে-মাঝে নস্য নিতেন। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, বোধ-হয় মাথার সঙ্গে কোনোদিন চিরুনির সংস্পর্শ হয় নি—আর তার-ই মধ্যে একটি ছোটো টিকিও ছিল। সপ্তাহে বোধ-হয় একবার ক'রে কামাতেন, আর সেই জন্যে মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়িও থাকৃত। তাঁকে হাস্‌তে কখনও দেখা যেত' না। ইস্কুলের মধ্যে পণ্ডিত মশায়দের নিয়ে বেলেল্লাগিরি করা সাধারণ ছিল। নানাভাবে পণ্ডিত মশায়দের বৈষয়িক অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, তাঁদের প্রতি ছেলেরা অশোভন ব্যবহার ক'র্‌ত। পণ্ডিত মশায়রা সে বিষয়ে সাধারণতঃ উদাসীন থাক্‌তেন, কোনও কিছু গায়ে মাখ্‌তেন না। ছাত্রদের রসিকতা তাঁদের কাছে পৌঁছত-ই না। আর পৌঁছলেও সে-সব জিনিস তাঁরা উপেক্ষা ক'র্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন। আমরা এই পণ্ডিত মশায়দের সম্বন্ধে নানারকম গল্প শুন্‌তুম। আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁদের অবলম্বন ক'রে ঠাট্টাও ক'র্‌তুম, তাঁদের ভয়ও ক'র্‌তুম।

আমাদের হেড-পণ্ডিত মশায় ভালো সংস্কৃত জান্‌তেন ব'লে, হেড-মাষ্টার মশায়ও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ক'র্‌তেন। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতির হ'লেও, প্রাণমন দিয়ে ছেলেদের পড়াতেন। ছেলেরা যাতে দেবভাষা আয়ত্ত ক'র্‌তে পারে, সেজন্য তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে পড়ানোর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন। ক্লাসে সুবিধে পেলেই ছেলেরা তাঁকে বিব্রত করার চেষ্টা ক'র্‌ত, তিনি সেইজন্যে একটু-আধটু মা'র-ধ'র-ও ক'র্‌তেন। তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায়ের শাস্তি-মূলক

বেতের বা তাঁর বিখ্যাত গাঁট্টার মতন পণ্ডিত মশায়ের কান ধ'রে টানা বা চুলের মুটি ধ'রে ঝাঁকানো ভীতিপ্রদ ছিল না। পণ্ডিত মশায় সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে পড়িয়ে' যেতেন। তখন খুঁটিনাটি ব্যাকরণ আলোচনা, আর সময়ে-সময়ে সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ, সব-ই ক'র্‌তেন। এই পড়ানো'তে আমরা হ'তুম নির্বাক্‌ শ্রোতা, এবং তিনি একাই ক্লাস মাত ক'রে রাখ্‌তেন। এখন যেমন পড়ানোর কাজে ছেলেদেরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করা হয়, তখন সেটা ছিল না।

"পাগলা পণ্ডিত" মশায়ের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে' যায় যে, গরীব ছেলের প্রতি তিনি বিশেষ সদয় ছিলেন। খোশ-পোশাকী বড়ো লোকের ছেলেদের তিনি পছন্দ ক'র্‌তেন না। অত্যন্ত গরীবানা চালে যে-সব ছেলে তাঁর সামনে উপস্থিত হ'ত, যেমন খালি পা, তালি-দেওয়া জামা, ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল, তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতি নানাভাবে নাকি দেখা দিত। আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে' গিয়েছিল যে, যখন মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হ'ত (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত মৌখিক-ই হ'ত), তখন যে-সব ছেলে এ-রকম গরীবানা চালে যেত', তারা তাঁর কাছ থেকে একটু বেশী নম্বর পেত'। সেই জন্য হেড-পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পরীক্ষা দেবার দিন বড়ো-লোকের ছেলেরাও ময়লা কাপড় প'রে দারিদ্র্যের তক্‌মা এঁটে আস্‌ত।

পণ্ডিত মশায় আমাদের সংস্কৃত অনুবাদের ক্লাসও নিতেন, আর ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রশ্নও ক'র্‌তেন। তিনি কতকগুলি বাঙলা বাক্য ব'লে যেতেন, আমরা সেগুলোর সংস্কৃত ক'রে নিয়ে তাঁকে দেখাতুম। অনুবাদের জন্য তিনি এই রকম উপদেশ-মূলক বাক্য বেশি দিতেন— "দুরাত্মার মরণই মঙ্গল। যাহারা যথাকালে বিদ্যাভ্যাস না করে, তাহারা উত্তরকালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। সর্বদা গুরুর প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইবে। কদাচ নিজের কর্তব্যে অবহেলা করিবে না।

ছাত্রদিগের পক্ষে বিদ্যাভ্যাসই একমাত্র তপস্যা—" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই-রকম বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ ক'রতে বেগ পেতে হ'ত না। আর তাতে ক'রে তিনি আমাদের উপর প্রসন্ন-ই ছিলেন। তবে তাঁকে মাঝে-মাঝে রাগাবার জন্য আমরা খুব মোটা-রকম ইচ্ছাকৃত ভুল-ও ক'র্‌তুম।

ক্লাসে নরেন মুখুজ্যে ব'লে একটি ছেলে ছিল। বাস্তবিক-ই গরীব ঘরের ছেলে। পড়া-শুনোতেও ভালো ছিল, আর তার মাথায় একটি ছোটো টিকিও ছিল (আমাদের সময়ে বামুনের ছেলেরা প্রায় সকলেই নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক ক'র্‌ত। এ বিষয়ে প্রায় ব্যত্যয় হ'ত না। আজকাল অবশ্য এ ব্যবস্থা উঠে গিয়েছে)। নরেনকে পণ্ডিত মশায় স্নেহ ক'র্‌তেন, সে লেখাপড়ায় তো ভালো ছিলই, আর তার টিকি থেকে তার ধর্মভাবও সূচিত হ'ত। সেই নরেন একদিন "বৃক্ষ হইতে" পদের সংস্কৃত অনুবাদ করে "গাছাৎ" রূপে। এটা পণ্ডিত মশায়কে চটাবার জন্যেই ক'রেছিল। পণ্ডিত মশায় তার খাতায় "গাছাৎ" কথাটা পেয়ে, যে-ভাবে কাতর চোখে তার দিকে তাকালেন, তা'তে মনে হ'ল, তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছেন। তখন পণ্ডিত মশায়ের কাছে গিয়ে জোড় হাত ক'রে নরেন ব'ল্‌লে, "পণ্ডিত মশায়, আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন, এমন ভুল আর কোনদিন হবে না।" তা'তেও তাঁর রাগ পড়ে নি ; দু'-তিন দিন তিনি নরেনের সঙ্গে কোন কথা-ই বলেন নি। আমরাও এ ব্যাপারে যেন পণ্ডিত মশায়ের কাছে লজ্জিত বোধ ক'রেছিলুম। ব্যাপারটি ছোটো, কিন্তু এ-থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, আমরা পণ্ডিত মশায়কে "পাগলা পণ্ডিত" ব'ল্‌লেও, আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে একটি গভীর স্নেহের ও ভক্তির যোগ ছিল।

পণ্ডিত মশায় অনেক সময় শাস্তি দেবার জন্যে ছেলেদের মাথার চুল ধ'রে টেনে ঝাঁকানি দিতেন। তাঁর এই দৌর্বল্য দেখে, একটি

ছেলে একদিন আভাঙ্‌ ক'রে মাথায় সরষের-তেল মেখে আসে আর পণ্ডিত মশায়কে ইচ্ছে ক'রে কোনও কারণে চটিয়ে' দেয়। পণ্ডিত মশায় বিচার না ক'রে তার মাথার চুলগুলো ধ'রে বেশ ক'রে যেমনি ঝাঁকানি দিয়েছেন, অমনি তাঁর আঙুলের মধ্যে দিয়ে সরষের-তেল গড়িয়ে' প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। এই ব্যাপার এত-ই অনপেক্ষিত আর অতর্কিত যে, তিনি ঘৃণায় তেল-জব্‌জবে হাতখানি তুলে ধ'রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে' রইলেন। আমরাও তৈরী ছিলুম। সঙ্গে-সঙ্গে কেউ রুমাল নিয়ে, কেউ গায়ের চাদর নিয়ে (তখন ছেলেদের কেউ-কেউ শার্ট বা কোটের উপর চাদর প'র্‌ত), কেউ খাতা থেকে দু'-খানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে, পণ্ডিত মশায় যাতে হাত মুছ্‌তে পারেন সেই আগ্রহে, তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালুম। কা'র সেবা তিনি নেবেন, তা চারদিকে তাকিয়ে' তিনি ঠিক ক'র্‌ছেন, এমন সময় তাঁর নজরে প'ড়্‌ল একটি ছেলে, রুখুরুখু চুল। তিনি সেই দিকে গিয়ে তাঁর হাত দিয়ে তার মাথার চুল ধ'রে খুব ঝাঁকানি দিলেন—তেলা হাতের তেল রুখু মাথায় গেল, আর তাঁর হাত হ'ল কতকটা পরিষ্কার। তারপর বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে, চাদরের সঙ্গে তিনি গামছা নিয়ে আস্‌তেন, সেই গামছায় হাত মুছ্‌তে-মুছ্‌তে তিনি ফিরে এলেন। এর পর তিনি কারোর মাথার চুল ধ'রে টান্‌তে গেলে আগে ভালো ক'রে reconnoitre বা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে নিতেন, তার মাথায় স্নেহদ্রব্য কতটা আছে।

পণ্ডিত মশায়ের মধ্যে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রেছিলুম যে, যদিও তিনি খুব গম্ভীর ছিলেন এবং বেশি কথা ব'ল্‌তেন না, তা-হ'লেও কিন্তু তিনি ছাত্রদের প্রাণের ভিতর থেকে ভালো-বাস্‌তেন। মনে আছে, একদিন সরস্বতী পূজোর সময়ে আমরা তাঁকে একটু বিপন্ন করবার কুমতলব নিয়েই ব'ল্‌লুম, "পণ্ডিত মশায়, এবার সরস্বতী পূজোয় আপনার বাড়িতে আমরা অঞ্জলি দিয়ে আস্‌বো, আর

প্রসাদ পাবো।” তা’তে পণ্ডিত মশায় যেমন একদিকে খুব খুশী হ’লেন, তেমনি আর একদিকে বড়ো বিপন্নও হ’য়ে প’ড়্লেন। ব’ল্লেন, “বাবা, নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি, থা-কি ছোটো একটি খোলার চালের বাড়িতে, তোমরা আমার ছাত্র, পুত্রতুল্য, তোমরা আস্‌বে সে তো আমার সৌভাগ্য, তবে ক’জন আস্‌বে আমাকে জানিও—আমি যথাসাধ্য সেইমতো চেষ্টা ক’র্‌বো। আর বাড়িতে তো একমাত্র ব্রাহ্মণী, তোমাদের তিনি ছেলের মতোই দেখ্‌বেন।” তাঁর কথা শুনে’ আমরা নিজেদের মধ্যে আপসে বিচার ক’রে তু’-এক টাকা ক’রে চাঁদা তুলে’ কিছু অর্থ পণ্ডিত মশায়ের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এলুম, তাতে তাঁর চিন্তার সবটুকু-ই লাঘব হ’ল। তাঁর বাড়িতে—সুদূর না’রকেল-ডাঙায় তিনি থাক্‌তেন —সরস্বতী পূজোর দিন আমি যেতে পারি নি’। তবে যারা গিয়েছিল, তাদের তিনি আর তাঁর গৃহিণী যত্ন ক’রে লুচি, আলু-কুমড়োর ছক্কা, ছোলার দা’ল, লাউয়ের চাটনি, দই, পায়েস, বোঁদে খাইয়েছিলেন। প্রায় সকলেই উচ্চ স্বরে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক’রেছিল।

পণ্ডিত মশায়ের প্রাণটি নিতান্ত কোমল ছিল। উড়িয়া কুলিরা রাস্তার খোয়া সমতল করার জন্য লোহার রোলার টান্‌ছে, তিনি কাতর-ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে’ দেখ্‌তেন, বেচারীদের খালি পায়ে কত না জানি যন্ত্রণা হ’চ্ছে। গোরুকে নিষ্ঠুর-ভাবে মারার বিরুদ্ধে, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কাছে তাঁকে কাতর-ভাবে অনুযোগ ক’র্‌তে আমাদেরই তু’একজন দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প ছিল যে, একবার তিনি কই না মাগুর মাছ কিনে বাড়ি নিয়ে আস্‌ছেন। যখন তিনি গামছা-বাঁধা মাছ নিয়ে পোলের উপর দিয়ে খাল পার হ’চ্ছেন, তখন তাঁর মনে হ’ল, জল দেখে বুঝি মাছগুলি ছট্‌ফট্‌ ক’র্‌ছে। গামছা-বাঁধা মাছগুলোকে তিনি

উপরে তুলে' ধ'রে অত্যন্ত কোমল-ভাবে ব'ল্‌লেন, "ঘর যাবি বাবা, ঘর যাবি ?" তারপর গামছাটা খুলে উজাড় ক'রে মাছগুলোকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। আমাদের মধ্যে একটি ছেলের পিতার মৃত্যুর কথা শু'নে তাঁর কী কান্না !

পণ্ডিত মশায় ইংরিজি জান্‌তেন না। আমরা ইস্কুল ছেড়ে যাবার পরেও বহু বছর তিনি ইস্কুলে কাজ ক'রে যান। তারপরে বার্ধক্যের আতিশয্য-হেতু তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর এক ছেলে সংস্কৃত ভালো ক'রে শিখেছিলেন। তিনি পিতার পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত মশায়ের পুত্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। এঁরই এক পুত্র, অর্থাৎ পণ্ডিত মশায়ের নাতি, জাহাজের খালাসী হ'য়ে বিলেতে ও আমেরিকায় যান। আমেরিকাতে গিয়ে সেখানকারই একটি মহিলাকে বিয়ে করেন। বোধ-হয় এ ঘটনা আমাদের পণ্ডিত মশায়ের দেহরক্ষার পরে ঘটেছিল। তিনি জীবিত থাক্‌লে এ ব্যাপার কিভাবে গ্রহণ ক'র্‌তেন, জানি না। তিনি নিশ্চয়-ই প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প'ড়্‌তেন, কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে মেনে নিতেন-ও নিশ্চয়-ই।

যাক্‌ সে কথা। আমাদের পণ্ডিত মশায়ের কথা মনে হ'লে এবং ইস্কুলের আমাদের অন্যান্য শিক্ষক মশায়দের কথা মনে হ'লে, তাঁদের চরণে কোটি-কোটি প্রণাম নিবেদন করি। ব্যক্তিগত-ভাবে, আর সমবেত-ভাবে, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্র এই "পাগলা পণ্ডিত" মশায়ের কাছ থেকে যে নীরব অনুপ্রেরণা পেয়েছি—যথার্থ পণ্ডিত, আর সঙ্গে-সঙ্গে জাগতিক বিষয়ে নিস্পৃহ, হৃদয়বান্‌ ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের যে আদর্শ তাঁর মধ্যে দেখেছি—তার পুণ্য প্রভাব আমাদের জীবনে অলক্ষ্যে এসে গিয়েছে॥

বঙ্গাব্দ ১৩৬৪

লণ্ডনে আমাদের দুর্গোৎসব

লণ্ডন শহর, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি, পাঁচটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই অন্ধকার হ'য়ে যায়। এখনও খুব শীত পড়েনি, তবে যে দিন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ বিকালের দিকে—অর্থাৎ সপ্তাহে প্রায় পাঁচ দিন—সে দিনটায় ওভারকোট না নিয়ে বেরুলে রাস্তায় শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফির্‌তে হয়, ইচ্ছে হয় ঘরে এসে আগুনটা জ্বেলে বসি। শরৎকাল, দম্‌কা হাওয়া এসে রাস্তার দু'ধারের আর বাগানগুলোর ভিতরের প্লেন-গাছগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের পাতা ঝরাচ্ছে—এদেশে এসে শরৎকালের এই উদাস-করা সৌন্দর্য্যটুকু নোতুন আর বড়ো মধুর লেগেছিল। শরৎকালকে নাকি হিন্দুস্থানীতে "পত্‌ঝরী" অর্থাৎ 'পাতা-ঝরা' বলে —এমন সার্থক নাম বুঝি আর হয় না। অতি পুরোনো ইংরেজিতে, চার ঋতুর জন্য যে চারটি শব্দ ব্যবহৃত হ'ত, সে চারটিই ছিল খাঁটি ইংরেজি শব্দ—Spring, Summer, Harvest, Winter ; Harvest বা শরৎকালের জন্য কোথাও-কোথাও Fall শব্দ চ'ল্‌ত—এটিও খাঁটি ইংরেজি শব্দ। কিন্তু পরে, লাটিন-ভাষা থেকে ধার-ক'রে-আনা Autumn শব্দটি খাঁটি ইংরেজি Fall অর্থাৎ কিনা 'পাতা-ঝরা' শব্দটির চেয়ে বেশী প্রচলিত হ'ল—শরৎকালের অর্থে Harvest একেবারে অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়্‌ল, বিদেশী শব্দ হ'লেও Antumn ইংরেজিতে সর্বত্র গৃহীত হ'য়ে গেল। তবে শরৎ-অর্থে ইংলাণ্ডের কোনও-কোনও পাড়াগাঁ অঞ্চলে এই Fall শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়; আর আমেরিকায় তো Fall শব্দ এখনও সজীব শব্দ—Autumn শব্দটি ততটা চলে না। ইংলাণ্ডে পৌঁছেছিলুম এই শরৎকালের প্রারম্ভেই। নোতুন দেশের জানা-অজানা নোতুন

জিনিস, বিশেষ ক'রে শরতের দমকা বাতাস, গাছের পাতার হ'লদে-রঙ-ধরা, আর এই 'পত্‌ঝরী', এই-সবে চিত্তকে কেমন একটা মোহাবিষ্ট ক'রে তুলেছিল, তার স্মৃতি এখনও মনে জেগে আছে।

লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের কাছে একটি ছাত্রাবাসে আমি থাক্‌তুম। আমাদের বাসায় প্রায় পঞ্চাশটি ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে তখন আমি একমাত্র ভারতবাসী। বাকি সব ইউরোপীয়। বেশীর ভাগ—জন তিরিশেক হবে—ইংরেজ। বাকি ফরাসী, ইতালীয়, স্কাণ্ডিনেভীয়, সুইস্‌, গ্রীক, রুমানীয়, এই সব নানা জাত জড়িয়ে'। সাতটায় আমাদের সন্ধ্যার আহার ব'স্‌ত। পৌনে-আটটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরে, ডাইনিং-হল বা সাধারণ ভোজনাগার থেকে বেরিয়ে, ছাত্রের দল খনিকক্ষণ ধ'রে লাউঞ্জ বা সাধারণ আড্ডা-ঘরে আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে' ব'সে গল্প-গুজব ক'র্‌ত; সঙ্গে-সঙ্গে আহারের মুখশুদ্ধি কাফি-পান করা চ'ল্‌ত। আটটা সওয়া-আটটায় আড্ডা-ঘরের ভিড় অনেকটা পাতলা হ'য়ে যেত'। পড়াশুনা-ক'র্‌তে অনেকগুলি ছেলে যে যার ঘরে চ'লে যেত' কিংবা স্টাডি বা সাধারণ পড়্‌বার ঘরে কেতাব-পত্র নিয়ে ঢুকত—সে ঘরে ফিস্‌ফাস্‌ ক'রে ছাড়া কথা কওয়া ছিল নিষিদ্ধ। আড্ডা-ঘরে বা লাউঞ্জে যতক্ষণ খুশি তাস পাশা খেলা, বা খবরের-কাগজ দেখা, বা ঘরের কোণে একটা পিয়ানো ছিল সেইটে নিয়ে টুংটাং করা—এ-সব চ'ল্‌ত। হট্টগোলের অভাব এখানে হ'ত না। আবার মাঝে-মাঝে রাজনৈতিক আলোচনাও বেশ জ'মে উঠ্‌ত, আর কখনও-কখনও বা খুব হৈ-হৈ ক'রে ছোকরা জন-বুলের দল গান ধ'র্‌ত। কিন্তু যখন ব্রিজের আড্ডা কিংবা রাজনৈতিক আলোচনায় উৎসাহ, কিংবা গানের সময়ে দশজন জোয়ানের সাধা-গলায় চীৎকার জ'মে উঠ্‌ত না, তখন এই লাউঞ্জে পঁচিশজন লোক থাক্‌লেও টুঁ-শব্দটি টের পাওয়া যেত' না—ইংরেজ সমাজের সভ্য আদব-কায়দা তখন পুরো দস্তুর মেনে যাওয়া হ'ত—

দু-চার জনে ক'থা কইছে তো চাপা গলায়—কারণ, আর সকলে খবরের কাগজ প'ড়্ছে, বা বই প'ড়্ছে। সকলে মিলে একটা তর্কে তখন যোগ দেয় নি, চেঁচিয়ে কথা কইলে সকলের পক্ষে অস্বস্তিকর হ'তে পারে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যার আহার শেষ ক'রে ড্রইং-রুমে বা লাউঞ্জে ব'সে আছি, আগুনের ধারে ব'সে বই প'ড়্ছি, আরও জনদশেক ছাত্রও ঘরে রয়েছে। সে দিন বেশ ঠাণ্ডার দিন ব'লে হৈ-হৈ কর্‌বার পালা নয়, চুপ-চাপের পালা। মাঝে-মাঝে খালি খবরের কাগজ পাল্‌টানোর বা ভাঁজ করার খস্-খস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কেউ-বা হয়তো এক আধবার কাশ্‌ছে, কোথাও বা দুজ'নে tete-a-tete বা মুখোমুখি ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা কইছে। এই-সব চাপা শব্দ, আর আগুনের চুল্লিতে কয়লা পোড়ার ঝাঁ-ঝাঁ আর মাঝে-মাঝে চড়-চড় শব্দ ছাড়া, আমাদের মস্ত বড়ো লাউঞ্জ-ঘরটায় আর কোনও শব্দ নেই। ঘরটার বাইরেই রাস্তা, আমাদের রাস্তাটি সাধারণতঃ বড়ো নির্জন। তবুও রাস্তায় দু'-একজন লোক যাওয়া-আসা ক'র্‌ছে, তাদের পায়ের আওয়াজ বন্ধ কাঁচের সার্সী ভেদ ক'রে আস্‌ছে। অর্গান বাজিয়ে ভিখিরীরা লণ্ডনে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়—একখানা ঠেলা-গাড়ির উপর স্বয়ং-চালিত অর্গান-যন্ত্র রেখে তার হাতল ঘুরিয়ে' যন্ত্রটিতে দম দিয়ে দিলেই নিজে বাজ্‌তে থাকে। আর ভিক্ষার্থী টুপী হাতে ক'রে, পাত্রের মতন ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে, বা লোকের জানালার সামনে বাইরে রাস্তায় দাঁড়ায়—দু'এক পেনী ভিক্ষে টুপীতে পড়ে। সেই রকম এক অর্গানের আওয়াজ দূরের অন্য এক রাস্তা থেকে কানে এসে বাজ্‌ছে। এমন সময়ে তিন-চার জন লোকের জুতোর আওয়াজ রাস্তায় শোনা গেল। রাত্রি সাড়ে আটটায় ডাক আসে, এ তো ডাক-ওয়ালার চির-পরিচিত পায়ের আওয়াজ নয়। ক্রমে সেই আওয়াজ

এসে আমাদের বাড়ির দরজায় থাম্‌ল। তারপর বাড়ির দরজায় বিজলীর ঘণ্টায় কিড়িং-কিড়িং ক'রে আওয়াজ হ'ল। ঝী চাকরেরা তখন নিচে Basement-এ বা বাড়ির মাটির নিচের তলায় রান্না-ঘরে বাসনকোসন ধুচ্ছে, নিজেদের খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌ছে—ঘণ্টার আওয়াজ তাদের মহলে পৌঁছুল। আমাদের ছোকরা চাকর চার্লি মস্‌-মস্‌ ক'রে উপরে এসে দরজা খুলে দিলে। হল-ঘরে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা হ'ল, তারপর চার্লি আমাদের দরজাটি খুলে আমার চেয়ারের কাছে এসে আস্তে আস্তে কানের কাছে ব'ল্‌লে, Mr. Chatterji, some Indian gentlemen to see you, Sir মিস্টার চ্যাটার্জি, কতকগুলি ভারতীয় ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছেন। চার্লির কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে, আমার সঙ্গে চোখাচুখি হ'তেই, ঘরে নানা লোকের দৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে, আমাদের বটু চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"এই যে সুনীতি-দা, তোমাকে আমাদের বড্ড দরকার।" বটুর পিছনে-পিছনে ঢুক্‌ল আর তিনজন বাঙালী। বটু হ'চ্ছে আমার এক সহপাঠীর ছোটো ভাই, দেশে থাক্‌তে সে আমায় বেশ চিন্‌ত। বিলেতে এসেছে ইঞ্জিনিয়ারিং প'ড়্‌তে—আমার বিলেতে যাওয়ার এক বছর পরে সে এসেছে, তার থাক্‌বার ব্যবস্থা, লণ্ডনে তাকে প্রথম সপ্তাহটা ধ'রে চরিয়ে' নিয়ে বেড়ানো কতকটা আমাকেই ক'র্‌তে হ'য়েছে, তা'তে তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা একটু বেড়ে গিয়েছে। প্রথম বিলেতে আগমন, ইংরেজি আদব-কায়দার ধার ধারে না। তাই আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত আনন্দে চেঁচিয়ে কথা শুরু ক'র্‌লে! আর পাঁচ জনের তাতে অসুবিধা হ'চ্ছে, বিশেষতঃ বাঙ্‌লায় কথা তারা বুঝ্‌ছে না ব'লে। সভার মধ্যে অপরিচিত ভাষায় চেঁচিয়ে কথা বলা যে ভদ্রতা-সম্মত নয়, এ বোধ তার ছিল না; আর ঘরের মধ্যে এই রকম উচ্চ-কণ্ঠ শুন্‌তে তারা অনভ্যস্ত, এটা তার খেয়ালে আসে

নি। চেয়ার থেকে উঠে, "এই চুপ, আস্তে-আস্তে, চলো, আমার ঘরে চলো উপরে—কানু, এসো হে, আসুন আপনারা"—ব'লে সকলকে তেতলায় নিজের ঘরে নিয়ে গেলুম। বটুর সঙ্গে আর যে তিনটি বাঙালী ছোক্‌রা এল, তাদের মধ্যে একজন যার নাম কানু, সে আমার সহপাঠী, প্রায় এক সময়েই আমরা বিলেতে আসি; সে তখন আইন প'ড়্‌ছিল। (আশা করি ভবিষ্যতে সে একজন সি-আর-দাশ বা লর্ড সিংহ হ'তে পার্‌বে)। আর দু'জনের সঙ্গে আমার আলাপ লণ্ডনেই। একজন বেশ ছিপছিপে, ফর্‌সা, সুন্দর চেহারা, বেশ সপ্রতিভ ছোক্‌রা। পূর্ববঙ্গে বাড়ি, কিন্তু তিন পুরুষে ক'লকাতাই ছেলের চেয়েও চালাক-চতুর—বিলেতে এক বছর হ'ল এসেছে, তখনও সে ভালো ক'রে ঠিক ক'র্‌তে পারে নি কী বিষয় সে প'ড়্‌বে; দেশে বি-এস্‌-সি দু'-দু' বার ফেল ক'রে বাপের টাকায় বিলেতে এসেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং বা খনির কাজ শিখ্‌বে ব'লে; আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে এক জাহাজে বিলেতে আসে, তাঁকে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তার মত ব'দ্‌লে গেল। সে জাহাজে স্থির ক'র্‌লে যে রসায়ন শাস্ত্র-ই প'ড়্‌বে। তারপর লণ্ডনে পৌঁছে দেখ্‌লে যে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাস না ক'র্‌লে তাকে বি-এস্‌-সি বা আর কিছু প'ড়্‌তেই দেওয়া হবে না। তা'তে তার বড়ো রাগ হয়, পরীক্ষা দেবে কিনা এই ভাব্‌তে-ভাব্‌তে তার একটি বছর কেটে গেল। এখন সে স্থির ক'রেছে, লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেশনটাই সে কোনও রকমে দিয়ে ফেল্‌বে, তারপর বেলফাস্টই হোক বা গ্লাসগোই হোক, কোনও মফস্‌সলের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পালি ভাষা সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে গবেষণা ক'র্‌বে। কলিকাতার ম্যাট্রিকে তার পালি পড়া ছিল, আর তা'তে সে নাকি খুব ভালো নম্বর পেয়েছিল। ছোকরার নামটি হ'চ্ছে রঞ্জন। দেশে সে বিয়ে ক'রে এসেছে,

ভারি স্ত্রী-বৎসল—ফী সপ্তাহে আট পাতা দশ পাতা চিঠি লেখে স্ত্রীকে, আর সঙ্গে রেখেছে ছুটো ঘড়ি, একটা হাতে বাঁধা বাজু-ঘড়ি, তা'তে লণ্ডনের সময় আছে, আর ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আছে ছোটো একটি ট্যাঁক-ঘড়ি, তাতে আছে ক'লকাতার সময়—আমাদের মাঝে-মাঝে ট্যাঁক-ঘড়িটি বা'র ক'রে শোনাত—"এখন নিশ্চয়-ই আমার স্ত্রী চুল বাঁধ্‌ছেন।" একটা নোতুন কিছু করার দিকে তার বড়ো ঝোঁক ছিল। সে ব'ল্‌ত, I believe in doing something uncommon —আমি চাই যে পাঁচজনে যা করে আমি তা ক'র্‌বো না। এতদিন বিলেতে থেকে কিছু না ক'রেই সে ফিরে আস্‌বে, বোধ হয় আর পাঁচ-জনের মতন হ'তে চায় চায় না ব'লে। দ্বিতীয় ছেলেটির নাম পাঁচু-গোপাল—খুব প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা, ভয়ানক কুড়ে, বেশী কথা ব'ল্‌ত না, খুব ঘুমোতে পার্‌ত—পরিশ্রম না ক'রে কেবল ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অত বলবান্ শরীরটা কি ক'রে সে গ'ড়ে তুল্‌লে, তাই ভেবে আমরা আশ্চর্য্য হ'তুম। সে বিলেতে গিয়েছিল accountancy বা হিসাব শিখ্‌তে, ফিরে এসে অডিটার হ'য়ে বোম্বাই অঞ্চলে কোথায় এখন চাকরি ক'র্‌ছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে-উঠ্‌তে বটু তার সদলে আগমনের কারণটা আমায় ব'ল্‌লে। তিন দিন পরে পূজো, পরশু দিন ষষ্ঠী। তিন দিন পরে পূজো শুনেই যেন একটু চ'ম্‌কে উঠ্‌লুম—এটা তো খেয়াল ছিল না! বটু নোতুন দেশ থেকে এসেছে, তাদের বাড়িতে পূজো হয়। তার মাথায় এক মতলব এসেছে—এবার জন কতক বাঙালীতে মিলে লণ্ডনে পূজো celebrate ক'র্‌লে হয় না? অবশ্য পূজোর দিন জন কতক বাঙালীতে মিলে একটু মেলা-মেশা আমোদ-আহ্লাদ আর সম্ভব হ'লে খাওয়া-দাওয়া করা—এই যা অনুষ্ঠান—সেখানে তো আর পূরো-দস্তুর পূজা করা হ'তে পারে না। কানু, রঞ্জন আর পাঁচুগোপালের সঙ্গে সে এক বাসাতেই থাকে—তাদের বুঝিয়ে' সে

নিজের মতে এনেছে—এখন তাদের সঙ্গে ক'রে আমার কাছে হাজির—আমি কী বলি? বন্ধুবর কানু তার সঙ্গে একমত হ'য়েছে। রঞ্জন তো মহা খুশি—that will be a capital thing—আর পাঁচ জন বাঙালী কে বা কবে দুর্গা-পূজোর দিন বিলেতে হুজুক ক'রেছে? এর কৃতিত্ব সে আমাদের দলে থেকেই নিতে পার্‌বে। পাঁচুগোপালের এ বিষয়ে হাঁ না কোনও মত ছিল না—আর তিন জন বাঙালী মিলে' ঠিক ক'রেছে যে জিনিসটা মন্দ হবে না, তা'তে তার আপত্তি নেই। বস্‌, আমার ঘরে এসে বস্‌বার জায়গা ক'রে নেওয়া গেল—দু'খানি চেয়ারে দুজনকে বসিয়ে বাকি সব বিছানার উপর বসা গেল। গ্যাসের স্টোভটা জ্বালিয়ে' দেওয়া গেল।

পূজোর অনুষ্ঠান কি ভাবে করা যায়? বটুর উৎসাহ বেশী কিনা, সে চায় যে অনেকগুলি বাঙালীর ছেলেকে কোনও জায়গায় একত্র ক'রে এনে সেখানে কিছু একটা 'ঘটা' করা হয়। কিন্তু সেটা সুবিধার হবে ব'লে মনে হ'ল না। কারণ সময় অল্প, তারপর বিস্তর খরচ তা'তে—একটা বড়ো হল বা ঘর ভাড়া করা, আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'র্‌তে যাওয়া, এতে বিস্তর খরচ প'ড়ে যাবে। অত টাকা আস্‌বে কোথা থেকে? আমি ব'ল্‌লুম—"না হে, অত সব ক'র্‌তে যেও না, তার চেয়ে, তোমাদের মাথায় যখন খেয়াল এসেছে, তোমরাই কাজটি নিজেরা করো, নিজেদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখো। তিন দিন মিলে' উৎসব করা চ'ল্‌বে না, কারণ কলেজ আছে, কাজ-কর্ম আছে, ছুটি নেই। খালি মহাষ্টমীর দিন কোথাও জন কতকে একত্র হওয়া যাক্‌। তোমাদের বাসাতেই হোক—কী বলো? তোমাদের ল্যাণ্ড-লেডি মানুষটি ভালো, আর ওখানে তোমরা চারজন বাঙালী তো আছোই, আর দু'জন অন্য প্রদেশীয় ভারতবাসী—তার একজন তো তামিল আর একজন বিহারী—আর বাইরে থেকে দু'একজন বন্ধুকে ডেকে আনা যাবে এখন--সব শুদ্ধ জন দশের বেশী নয়—সকলে অষ্টমীর দিন জমা

হওয়া যাক্—কানু তুমি তো পাকা রসুইয়ে’ হে, আর রঞ্জনবাবু আপনি তো দশকর্মান্বিত ব্যক্তি, রান্নাটাও নিশ্চয়-ই আপনার আসে—ছ’জনে মিলে’ তোমাদের ল্যাণ্ড-লেডিটির অনুমতি নিয়ে তার রান্নাঘরে খিচুড়ী আর পায়েস ভোগ তৈরী করো—তারপর একটু গান-টান হবে—লণ্ডনে এই আমাদের ছুর্গোৎসব হবে।”

এই বন্দোবস্ত সকলের মনঃপূত হ’ল। স্থির হ’ল, মহাষ্টমীর দিন সকলে সারা ছুপুরটা কানুদের বাসায় জটলা ক’র্‌বো—ওদিন কলেজ বা মিউজিয়াম বা আপিসে কেউ যাবে না। একটি ভালো বাঙালী গাইয়ে’ ছেলেকে নিমন্ত্রণ করা যাবে, আর কানুর আর আমার একটি বন্ধুও আস্‌বে। এই ব্যাপারে কানুর বাসার ছেলেরা হবে আমাদের গৃহকর্তা, আমরা হবো নিমন্ত্রিত মাত্র।

যথাদিনে বেলা এগারোটায় বাড়ি থেকে বেরুনো গেল। আমাদের বাসা থেকে হেঁটে টটেনহাম-কোর্ট-রোডের মোড়ে পৌঁছে টিউব বা পাতালে’ রেল ধরা গেল—হ্যাম্পস্টেডে কানুরা থাক্‌ত, লণ্ডনের উত্তরে, হ্যাম্পস্টেড স্টেশনে নামা গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে উঁচু ঢালু সড়ক দিয়ে মিনিট পাঁচেক পথ বেয়ে কানুদের বাসায় আসা গেল। সারি সারি তেতালা বাড়ি, সব এক ধাঁজের। সামনেটা রেলিং দেওয়া, ভিতরেই একটু বাগান মতন, বাড়ির সদর দরজাটার সামনে porch বা ঢাকা বারান্দা,—এই রকম মামুলী একটি বাড়ি। নম্বর দেখে নিয়ে বারান্দায় উঠে দরজার বাজুতে বিজলীর ঘণ্টার বোতাম টেপা গেল, ভিতরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। নীল গাউন, সাদা টুপী, গাউনের উপরে ধব্‌ধবে’ সাদা apron বা তোয়ালের মতো একখানা কাপড় পরা ইংরেজ ঝী ত্রস্তে দরজা খুলে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বটু এসে, “এই যে সুনীতি-দা, এসো এসো” ব’লে, আমাকে বস্‌বার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা কোচের উপর পাঁচুগোপাল আধশোয়া হ’য়ে ব’সে জান্‌লার পরদার

কাপড়ের ভাঁজ গুন্‌ছেন দেখ্‌লুম, আর তিলকধারী প্রসাদ ব'লে বিহারী ছোকরাটি ব'সে ব'সে চুরুট খাচ্ছে। কানু আর রঞ্জন নিচে রান্নাঘরে রাঁধ্‌বার আয়োজন ক'র্‌ছে, আর তামিল ভদ্রলোক সুব্বারাউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাদের সাহায্য করবার জন্য যোগ দিয়েছে। আমি ব'সে এদের সঙ্গে আড্ডা দিতে লাগ্‌লুম। তিলকধারী প্রসাদের বাড়ি ভাগলপুর কি পাটনায় কি দারভাঙ্গায় সেটা ভুলে' গিয়েছি। সে বেশ বাঙ্‌লা জানে, বাঙ্‌লা বেশ ব'ল্‌তে পারে, বাঙ্‌লা সাহিত্যও খুব প'ড়েছে। দুর্গাপূজার সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সে পরিচিত। খানিক গল্প ক'রে বটুর সঙ্গে নিচে রান্নাঘরে গেলুম। সেখানে কামিজের আস্তিন গুটিয়ে' রান্নার কাজে লেগে গিয়েছে কানু আর রঞ্জন—সুব্বারাউ আলু কুট্‌ছে, আর ঝী আর ল্যাণ্ডলেডি কৌতুক-স্মিত হাসির সঙ্গে দেখ্‌ছে, আর টুকিটাকি সাহায্য ক'র্‌ছে। এর বাড়িতে যে ছয়জন অতিথি বা ভাড়াটে' বাস ক'র্‌ত, সে ছয়জন-ই ছিল ভারতীয়। বাজে লোকের ভিড় ছিল না তাই। রান্নার সুবাসটা বেশ পাওয়া গেল। নিচের পাচকেরা ব'ল্‌লেন যে, ঘণ্টা খানেক বা জোর দেড় ঘণ্টার মধ্যে সব তৈরী হবে। তখন উপরে আসা গেল। ড্রয়িং-রুম বা বস্‌বার ঘরে ব'সে গল্প চালানো গেল। ইতিমধ্যে আর দু'জন নিমন্ত্রিত এসে প'ড়্‌লেন —একটি তার মধ্যে গাইয়ে' ছেলেটি, আর একটি আমাদেরই একজন বন্ধু।

বটুর উৎসাহের সীমা নেই। একবার সে নিচে যায়, একবার উপরে আসে—ভারি ব্যস্ততার ভাব। তা হবেই তো, কারণ এ যে তারই বাড়িতে পূজোর উৎসব হ'চ্ছে—হ'লই বা লণ্ডনে, আর হ'লই বা অন্য ধরনে। যথা সময়ে আমরা উৎফুল্ল কর্ণে সংবাদ পেলুম—আমাদের ভোজ প্রস্তুত। হাত মুখ ধুয়ে কোট জামা প'রে কানু, রঞ্জন আর সুব্বারাউ ড্রয়িং-রুমে এল।

ঝী ওদিকে ডাইনিং-রুমে খাবার সাজাচ্ছে, ল্যাণ্ডলেডিও আমাদের এই উৎসবের নেশায় যেন কতকটা প'ড়ে গিয়েছেন। তিনি তার তদারক ক'র্‌ছেন। এদিকে বটু ড্রয়িং-রুমে এসে আর একটি অনুষ্ঠান ক'র্‌তে লেগে গেল। ঘরের দেয়ালের গা কেটে, অগ্নিকুণ্ডের উপরটি ছিল মার্বেল পাথরের, তার উপরের দেয়ালে আঁটা মস্ত এক আরসী। অগ্নিকুণ্ডের মাথাটা (যাকে mantle-piece বলে) বটু পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে—সেখানে টুকি-টাকি জিনিস যা ছিল সব সে সরিয়ে ফেল্‌লে। তারপরে উপরে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একখানা ফ্রেমে বাঁধা দুর্গার ছবি নিয়ে এল, আর একরাশ ফুল। তেরঙা হাফ-টোন ছবি, ক'লকাতায় ছাপা—২৷৩ আনায় বিক্রি হয়, দু'চারখানা ঠাকুর দেবতার ছবি আর দেশের নেতাদের ছবি সে তার বাঙ্‌লা বই, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, আর একখানা গীতার সঙ্গে একত্রে এনেছিল, তার জাতীয়তার নিশানা হিসাবে। আমাদের পূজোর জন্য মতলব ক'রে দুর্গার ছবিখানি বা'র ক'রে ইতিমধ্যে কবে বাঁধিয়ে এনেছে। ছবিখানি সে ম্যাণ্টেলপীসের উপর রাখ্‌লে; তারপরে তার আনা ফুলগুলি ছবির তলায় সাজিয়ে দিলে। আর ছবির দু'পাশে দুটি ফুলদানীতে বড়ো বড়ো গোটা কতক গোলাপ ফুল রাখ্‌লে। সুব্বারাউয়ের কাছে মাদ্রাজী ধূপ কিছু ছিল, ধূপগুলি আর একটি ফুলদানীর ভিতর খাড়া ক'রে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জ্বেলে দেওয়া হ'ল, তারপর দুর্গার ছবিটির সামনে আর একটি ছোটো টেবিলের উপর ধূপ রাখা হ'ল, ধূপের গন্ধে ঘর ভ'রে গেল, আর সেই এক ধূপের সৌরভেই আমাদের সকলকার মনকে বিলেত থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে আমাদের ভারতবর্ষে এনে আমাদের সামাজিক আর ধর্ম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের ভাবে আমাদের মনকে ভরপূর ক'রে সুরভি ক'রে দিলে। বিদেশে বহুদিন পরে হঠাৎ এক চরণ বাঙ্‌লা গান শুনে মনটা যেন আপনহারা হ'য়ে যেত', এই ধূপের সৌরভও মনটাকে

সেই রকম ক'রে দিলে। আমাদের, বিশেষতঃ বাঙালী কজনের, চোখের সামনে আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের ছবি ভেসে উঠ্‌ল— আমাদের আড্ডার গল্প-গুজব, ঠাট্টা-ইয়ার্কি, পলিটিক্সের তকরার আর পরচর্চা আপনা থেকেই খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ রইল। তখন বটু ব'ল্‌লে, "সুনীতি-দা, তুমি একটা কিছু মন্ত্রটন্ত্র, বা স্তোত্র-টোত্র যা হয় একটা কিছু সংস্কৃত বলো।" এই রকম একটা কিছু অনুরোধ আস্‌তে পারে অনুমান ক'রে আমি তার আগের দিন আমাদের কলেজের লাইব্রেরী থেকে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তটি নকল ক'রে নিয়ে এসেছিলুম—সেটি সঙ্গে পকেটেই ছিল, সেটি বা'র ক'র্‌লুম। বন্ধুদের অনুরোধে জুতো খুলে পেনটুলেন সমেত একটা কোচে 'বাবু হ'য়ে' ব'স্‌তে হ'ল; তারপর সেইটি পাঠ ক'র্‌লুম; তারপর সেটি বাঙ্‌লায় আর সুব্বারাউয়ের বোধের জন্য ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করা গেল। আমার সুবিধা এই ছিল যে, সেখানে আর কেউ সংস্কৃত জান্‌ত না, অন্ততঃ ভালো সংস্কৃত জান্‌ত না, আর আমি সংস্কৃতে একজন মহাপণ্ডিত এই রকম একটা শ্রদ্ধা (অনুচিত ভাবে হ'লেও) সকলেরই আমার প্রতি ছিল। কাজেই কেউ কোনও প্রশ্ন ক'র্‌লে না, বেশ শুন্‌লে। সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুধর্ম আর দর্শন, শক্তিবাদ প্রভৃতি নিয়ে একটু আলোচনা চ'ল্‌ল। এমন সময়ে কানু ব'ল্‌লে, "চাটুজ্জে, তোমার মাথার ভিতর তো 'সুসভ্য দ্রাবিড়' আর 'বর্বর আর্য্যে'র পোকা ঢুকেছে। এই শক্তি-পূজার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু শুনিয়ে দাও না হে।" আমি ব'ল্‌লুম —"তুমি আমার প্রিয় আলোচনার বিষয় একটা ধ'রেছ বটে, কিন্তু সে আলোচনা হ'চ্ছে ঐতিহাসিক আর নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়—destructive ব্যাপার, আর সে আলোচনায় আমাদের স্বীকৃত ধর্ম-সম্বন্ধীয় আর অন্য নানা মতকে আঘাত ক'রে ভেঙে-চুরে একটা বিশ্লেষণ ক'রে দেয়, তা'তে অন্ধ ভক্তি বা ধর্ম-ভাব উড়ে যায়, অথচ সকলের মনে

যুক্তি-তর্কের উপর স্থাপিত আস্থা সহজে আসে না—সেরূপ আলোচনার স্থান এ নয়। ভাব আর ইতিহাস, এ দুইয়ের সামঞ্জস্য একটু কঠিন ব্যাপার। শক্তিবাদের বা দুর্গাপূজার মূলে যা'ই থাক, সেটা অনার্য্যদের কাছ থেকেই আসুক বা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আমদানী-করা জিনিস-ই হোক, তা'তে কিছু আসে যায় না। মা দুর্গা আমাদের ঘরোয়া জীবনে আর জাতীয় জীবনে—আমাদের মনের দিকে, ভাবের দিকে, শক্তিশালী হ'তে, মানুষ হ'তে চেষ্টা করার দিকে—যে বিরাট্‌ ভাব-সাম্রাজ্যের মহৎ Symbol বা প্রতীক হ'য়ে আমাদের চিত্তপটে বিরাজমান, তাকে বিশেষতঃ আজ এই মহাষ্টমীর দিনে ঐতিহাসিক বিশ্লেষে ফেল্‌তে চাই না। মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি রঙে, সাজে, ফুলে, আলোয় মণ্ডপ আলো ক'রে র'য়েছে, তার ভিতরের-কাঠামো, খড় মাটি বাঁখারি এ'সব বিশ্লেষ ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা এখন উচিত নয়।"

আমাদের এই সব কথা হ'তে-হ'তে ল্যাণ্ডলেডি দরজায় টোকা দিয়ে ঢুক্‌লেন। ঘরে ঢুকেই ধূপের গন্ধ তাঁর নাকে লাগ্‌ল—জোরে নিঃশ্বাস টেনে তিনি ব'ল্‌লেন—How lovely this perfume—I see it is incense—now what are you doing here? "কী চমৎকার খোশবয়! এ যে ধূপের গন্ধ দেখ্‌ছি—তোমরা এখানে ক'র্‌ছ কী?" বটু ব'ল্‌লে—Mrs Johnson, we are holding a Hindu religious service here and here is Mr. Chatterji—he is our priest—"মিসেস্‌ জন্‌সন্‌, আমরা এখানে হিন্দু পূজার অনুষ্ঠান ক'র্‌ছি, আর এই চাটুজ্জে মশাই, ইনি আমাদের পুরোহিত।" মিসেস্‌ জন্‌সন্‌টি অতি অমায়িক বৃদ্ধা, সাধারণ ল্যাণ্ডলেডি বা বাড়িউলী শ্রেণীর মতো অশিক্ষিতা বা অর্ধ-শিক্ষিতা নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক নন। ইংলাণ্ডের ভদ্রঘরের মেয়ে। একটি ছেলে ছিল, সেটি যুদ্ধে মারা গিয়েছে, একটি বিবাহিতা মেয়ে আছে; তার

সংসারে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু তা না ক'রে স্বাধীন-ভাবে নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্য গুটিকতক ভারতীয় ছাত্র অতিথিকে নিয়ে এই বাসাটি চালাচ্ছেন। ছেলেদের যত্ন আত্তিও খুব করেন। লেখা-পড়া জানা থাকার দরুন ধর্ম-মত সম্বন্ধে খুব উদার। রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত পাঠিকা, ভারতের চিন্তা ও সভ্যতার প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীলা, তাই তাঁর বাড়িতে সব অতিথি কটিই ভারতবাসী। তিনি ব'ল্‌লেন, That's fine : now, is that an altar ? What picture is that ? "বেশ চমৎকার। এটা কি একটি বেদি ? আর কী ছবি ওটি ?" ব'লে ছবির কাছে গেলেন। দুর্গামূর্তির মামুলী এক ব্যাখ্যা তখন আমাকে সংক্ষেপে ক'র্‌তে হ'ল। আর রোমান কাথলিকদের পূজা-পাঠের সঙ্গে বাহ্যতঃ আমাদেরও পূজার ধরনটা যে মেলে, সেটাও ব'লে দিলুম। ল্যাণ্ডলেডি একটু বেশ নিবিষ্ট-ভাবে শুনে ব'ল্‌লেন, "চলো সব ছেলেরা, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, তোমাদের খাবার অনেকক্ষণ টেবিলে দেওয়া হ'য়েছে, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।" আমরা তখন সামনের ডাইনিং-রুমে খেতে গেলুম।

সেদিন খাওয়াটি হ'ল চমৎকার, ঠিক দেশেরই মতো। বিলেতে তখন মাখন বড় মাগ্‌গি, তার বদলে চর্বি, নারকেল তেল, আর নানা রকমের বাদামের তেল জড়িয়ে রিফাইন ক'রে "মার্জারীন" ব'লে একটা জিনিস বাজারে খুব চ'ল্‌ছে। মাখনের বদলে সেটি রুটির সঙ্গে আর ভাজাভুজিতে ব্যবহৃত হয়। এই জিনিসটা, আমাদের দেশে ঘীয়ের বদলে তেল থেকে তৈরী যে-সব "ভেজিটেবল ঘী" চ'ল্‌ছে, তারই মতন। আমার কখনও এই বস্তুটা ভালো লাগ্‌ত না। দেখ্‌লুম, কাম্নুরা মাখন-গালানো ঘী দিয়ে তোফা মুসুর ডালের খিচুড়ী রেঁধেছে, ও ঘরে ধূপের মতন এ ঘর খিচুড়ীর সৌরভে ভরপূর। টাট্‌কা হ্যাডক মাছ ভাজা আর আলু ভাজা ক'রেছে জলপাইয়ের তেলে, তাজা খাঁটি সরষের তেলের চেয়ে সে জিনিস

খারাপ নয়। জলপাইয়ের তেলে পাঁপর ভাজা হ'য়েছে, টোমাটো বা গুড়্-বেগুনের চাট্‌নি বানিয়েছে, অতি মুখরোচক লাগ্‌ল তার স্বাদ। আর পেস্তা বাদামের কুঁচি আর কারান্ট কিশমিশ দেওয়া পায়েস হ'য়েছে—বিলেতে "রাইস-পুডিং" ব'লে একটা পায়েসের অপচার মাঝে মাঝে খেতুম, জিনিসটা হ'চ্ছে ভাতে একটু দুধ আর চিনি (আর বোধ হয় ভাঙা ডিম-ফেটানো একটু) দিয়ে কড়ায় চড়িয়ে একটু লাল্‌চে রঙ ধ'র্‌লেই নামিয়ে নেওয়া—সত্যিকারের পায়েসের কথা স্মরণ ক'রে জিভ বেচারী অশ্রুসংবরণ ক'র্‌তে পার্‌ত না। এ ছাড়া ছিল আমাদের ল্যাণ্ডলেডির তৈরী ভেড়ার মাংসের কারী। আর অতিথি সৎকারের বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য বটু আর কানু কিছু অর্থ ব্যয় ক'রে আবদুল্লার হোটেল থেকে আনিয়েছিল মিঠাই খাবার—কিছু গোলাপজাম, কিছু জিলিপী। লণ্ডনে আমরা যে সময়ে ছিলুম, সে সময়ে দুটি ভারতীয় রেস্তোরঁা বা ভোজনাগার ছিল। একটি বীরস্বামী ব'লে এক মাদ্রাজীর, আর একটি হচ্ছে আবদুল্লা ব'লে এক পাঞ্জাবী মুসলমানের। প্রথমোক্তটির অবস্থা তখন বড়োই খারাপ, একদিন খেতে গিয়েই তা বুঝেছিলুম। আবদুল্লার রেস্তোরঁা তখন বেশ জোরের সঙ্গে চ'ল্‌ছে, তার জিনিস-পত্রের তার যেমন, দামও ছিল তেমনি বেশী। ছোটো পানতুয়ার আকারের একটি গোলাপজামের দাম ছ' পেনী, একখানি জিলিপীর দামও ঐ, এক প্লেট বেগুনের তরকারী এক শিলিং, এক প্লেট মাংসের কোর্মা এক শিলিং তিন পেনী। কিন্তু ঐ সব জিনিস যে বিদেশে পাওয়া যেত', সেটাই একটা আনন্দের বিষয় ছিল। আমাদের মধ্যে আমাদের মতন যারা একটু বেশী পেটুক ছিল, তাদের মাঝে-মাঝে বেপরোয়া হ'য়ে খরচ ক'রে আবদুল্লার হোটেলে গিয়ে মুখ ব'দ্‌লে আস্‌তে হ'ত।

ঘণ্টা খানেক ধ'রে, খুব গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে আমাদের তো মাধ্যাহ্নিক সেবা হ'ল। এত' ভর-পেট তৃপ্তি ক'রে খাওয়া অনেক

দিন হয় নি। অবশ্য আমরা বিলেতে যে সাধারণতঃ খিদে রেখে খেতুম, তা নয়। আমাদের ল্যাণ্ডলেডি আর তাঁর ঝীকে ভারতীয় রান্নার তারিফ কর্‌বার জন্য প্রথমেই তাদের উপযোগী প্রচুর খিচুড়ী আর চাট্‌নি আর পায়েস, আর কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দেওয়া হ'য়েছিল। হাঁড়ী চাঁছপুছ ক'রে আমরা আহার সমাধা ক'রে পাশের্ ঘরে এসে আবার জমা হ্'লুম। ঘরে ঢুকেই যে পার্‌লে এক একখানা কৌচ দখল ক'রে লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়্‌ল। তারপরে হ'ল গানের পালা। মহাষ্টমীর দিন—সৈনিকোচিত কসরৎ বা ব্যায়াম ক'রে লাঠি ঘুরিয়ে' তলওয়ার খেলে দিন-মাহাত্ম্য পালন করা উচিত, কিন্তু নানা কারণে আমাদের দ্বারায় তা সম্ভব হ'ল না। প্রথম, লাঠি তলওয়ার খেলা আমাদের কারো আসে না; দ্বিতীয়, এলেও বিলেতের এক বৈঠক-খানা, যার মধ্যে সুস্থ-ভাবে হাত-পা-ই ছড়ানো যায় না (চারদিকে কৌচ আর চেয়ার আর ছোটো টেবিলে ভরা), সেখানে পাঁয়তারা করা আর লাফাঝাঁপি করা অসম্ভব; আর তৃতীয় হ'চ্ছে, গুরু ভোজনের ফলে আমরা সকলেই hors-de-combat অর্থাৎ সব কাজের বা'র। সুব্বারাউ আরও কতকগুলি ধূপ এনে জ্বালিয়ে' দিলে।

তারপরে গানের পালা। আমাদের গায়কের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে টেনে বসিয়ে' দেওয়া গেল। তারপর তাকে পিয়ানোর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পিয়ানোটা সাধারণতঃ বন্ধই থাক্‌ত—মিসেস জন্‌সন্ কখনো-কখনো নিজে এক-আধ বার বাজাতেন। তাঁর অতিথিদের মধ্যে কেউ পিয়ানো-বাজিয়ে' ছিল না। তাঁর কাছ থেকে পিয়ানোটির চাবি আজ বটুরা চেয়ে রেখেছিল। গান আরম্ভ হ'ল। একটি পরিচিত গানের সুর একটু কানে পৌঁছুতেই আমরা ধড়্‌মড়িয়ে' উঠে প'ড়্‌লুম, এমন কি পাঁচুগোপাল পর্য্যন্ত। তখন রবীন্দ্রনাথের গান, দ্বিজেন্দ্রলালের গান, 'শ্মশান ভালো বাসিস্ ব'লে

মা শ্যামা'র মতো দু'একটি শ্যামা-সংগীত চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের বাঙালী গায়ক শ্রান্ত হ'লে আমরা তিলকধারীকে ধ'র্‌লুম্‌, সেও গুণী ছেলে, সে আরম্ভ ক'র্‌লে গজল আর ঠুমরী। রঞ্জনবাবুর বাঁশী বাজানো আস্‌ত। দু-একটি গং তিনি শুনিয়ে দিলেন। আমাকে ধরা হ'ল, সংস্কৃতে আবৃত্তি ক'র্‌তে হবে। রঘুবংশ আর মেঘদূত থেকে খানিক আবৃত্তি করা গেল। কাউকেও বাদ দেওয়া হ'ল না। আমাদের আট জনের প্রত্যেককেই হয় আবৃত্তি, নয় গান, নয় বক্তৃতা একটা কিছু ক'র্‌তে হ'ল। বেচারী সুব্বারাউকে ধ'রে, মাদ্রাজে তার কলেজে তামিল নাট্যাভিনয়ে একবার সে সেজেছিল—ইন্দুমতী না কি নাম আমার মনে নেই—এক নায়িকার ভূমিকা, তাকে দিয়ে তার তামিল অভিনয় করিয়ে নেওয়া গেল। তার কথা কিছু-ই বুঝ্‌লুম না, কিন্তু সকলেই বুঝ্‌লুম যে, সে খুব feeling বা ভাবের গভীরতার সঙ্গে আবৃত্তি ক'র্‌ছে। পাঁচুগোপাল Twinkle, twinkle, little star আর "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল" আবৃত্তি ক'র্‌লে।

সাড়ে চারটে বেজে গেল। আমাদের চা-পান করার ডাক এল। নাম-মাত্র চা আর দু'এক টুক্‌রো কেক খেয়ে আবার গানের মজলিস জমানো গেল। এইরূপে খুব আনন্দের সঙ্গে সারাদিনটা কাটিয়ে' আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় বিদায় নিলুম।

মহাষ্টমীর দিনটা এই রকম ভাবে উৎসব ক'রে আমরা বিলেতে দুর্গাপূজার আনন্দ অনুভব ক'র্‌লুম।

অষ্টমীর দিন তো এই ভাবে গেল। নবমীর দিন কিছু আর নেই। বিজয়া দশমীর দিন, আমাদের হোস্টেলে রাত্রের আহার চুকে গেলে পরে, আটটা আন্দাজ হ্যাম্পস্টেডের দিকে চ'ল্‌লুম। পরিষ্কার রাত্রি, একটা 'তীক্ষ্ণ শাণিত' ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বায়ু-মণ্ডলের ধোঁয়া কাটিয়ে' লণ্ডনের আকাশ যতটা সম্ভব পরিষ্কার হ'তে পারে ততটা

পরিষ্কার। পাতালে' রেলে যেতে মন চাইলে না, বাসে চড়া গেল। বাসের দোতলার উপরে ওভার-কোট গায়ে দিয়ে ব'সে আছি, উত্তর-মুখো হ্যাম্পস্টেডের দিকে বাস ছুটেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া সোঁ সোঁ ক'রে দুই কানের পাশ দিয়ে ব'য়ে চ'লেছে, ভীষণ ঠাণ্ডা সেই বাতাস, নাক কান যেন খ'সে যাবার মতো হ'চ্ছে, কিন্তু তবুও চমৎকার লাগ্‌ছে, শিরায়-শিরায় রক্ত যেন চন্‌চন ক'রে স্ফূর্তির সঙ্গে বইছে। বিশ মিনিটের মধ্যে গন্তব্য স্থানে নাম্‌লুম। কানু আর বটুদের বাসায় গেলুম। সুব্বারাউ বাইরে ড্রয়িং-রুমে ব'সে আগুন পোহাচ্ছিল, ঘণ্টা দিতে সে এসে দরজা খুলে দিলে। শুন্‌লুম, সবাই যে যার ঘরে গিয়েছে। টোকা মেরে কানুর ঘরে ঢুক্‌লুম। তখন সে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শোবার পোশাক প'রে টেবিলের ধারে ব'সে বই প'ড়্‌ছে। তার সঙ্গে বিজয়ার কোলাকুলি হ'ল। আমি এসেছি খবর পেয়ে আর সকলে কানুর ঘরে এসে জড়ো হ'ল। আর সবাই জেগে ছিল, হয় পড়া-শুনো ক'র্‌ছিল, না হয় চিঠি লিখ্‌ছিল। বাড়িতে প্রণাম আশীর্বাদ জানিয়ে বিজয়ার চিঠি সবাই-ই লিখ্‌ছিল। আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ছিলুম—কিছু মিষ্টি চকলেট, ওখান-কার সন্দেশ যাকে বলতে পারা যায়, আর নারকেলের কুচি চিনিতে পাক-করা Cokernut Kornel ব'লে এক রকম নারকেল-ছাবার বিলিতি সংস্করণ। তবে সিদ্ধির ব্যবস্থাটা হয় নি, আর কলাপাতায় লাল কালি দিয়ে দুর্গানাম লেখাও হ'য়ে উঠ্‌ল না। শুনেছি, ইংলাণ্ডের কোন কোনও মফস্‌সল শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বাঙালী অ-বাঙালী মিলে বিজয়া-দশমীর দিন রাত্রে 'ভাঙ-পার্টি' বা সিদ্ধির ঘোঁট ক'রে থাকে—অন্ততঃ আমার স্বচক্ষে দেখা, বিজয়ার দিন না হোক, অন্য একদিন এডিনবরায় এক ছাত্রাবাসের ছেলেরা এই রকম ভাঙ খাবার পার্টি ক'রেছিল। নারকেল চিনির মেঠাইটি দেখ্‌লুম যে, হ্যাম্পস্টেডের বাসার কেউ-ই খায়নি, ইংলাণ্ডে যে ও জিনিস

পাওয়া যায় তার ধারণা-ই ছিল না। নারকেল কুচি চিনিতে পাক ক'র্‌লে যে এমন চমৎকার খেতে লাগে, তা সকলের কখনও মনে হয় নি।

রাত্রি দশটার দিকে বাড়ি ফিরে আসা গেল। ঘরে এসে কাপড় ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে দেখি, তু'জন বাঙালী বন্ধুর কার্ড আর চিঠি—এরা বিজয়ার কোলাকুলি ক'র্‌তে এসেছিল, দেখা না পেয়ে চ'লে গিয়েছে। তারপরে দেশে যেমন, তেমনি ওখানেও বিজয়ার পরে প্রথম বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লেই আগে কোলাকুলিটা হ'য়েছে। বাঙালীর এই সামাজিক অনুষ্ঠানটি দেখ্‌লুম সকলে স্বতঃই স্বাভাবিক-ভাবেই বিলেতেও পালন ক'র্‌ছে।

বিলেতে আমাদের তুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান এই ভাবেই হ'ল॥

ভ্রমণ-প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

১৯২২ সাল। গ্রীসদেশে ভ্রমণের কালে রাজধানী আথেনাই (আথেন্স্) থেকে প্রাচীন দেবভূমি, সূর্য্যদেব আপোল্লোন্-এর ক্ষেত্র দেল্‌ফয় বা দেল্‌ফী নগরের মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে যাচ্ছি। সকালে আথেন্স্-এ স্টীমারে চ'ড়ে, ঈজিনা উপসাগর দিয়ে, কোরিন্থ্-এর খালের ভিতর দিয়ে, কোরিন্থ উপসাগরে প'ড়্‌তে হয়; তারপর কোরিন্থ উপসাগরের উত্তরে Itea ইতেআ বন্দর; ইতেআয় বিকালের দিকে নেমে, ঘোড়ায় চ'ড়ে কিংবা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে চড়াই পথ ধ'রে দেলফীতে পৌঁছুতে হয়। গ্রীক কোম্পানীর ছোটো স্টীমার, আমাদের পদ্মা নদীর যাত্রী স্টীমারগুলির দ্বিগুণ আকারের হবে। আমি শস্তায় ভ্রমণ ক'র্‌ছি, দিনের পাড়ি—তাই একখানি ডেক-টিকিট কিনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে চ'লেছি। ডেকটা যাত্রীতে ভর্‌তি, প্রায় সব-ই ঐ দেশের লোক, গ্রীক; পুরুষ-ই বেশী। আধাআধি যাত্রী পাড়াগাঁ অঞ্চলের সেকালের পোশাক প'রে—পায়ের জুতোতে রঙীন পশমের থোপা, সাদা রঙের আঁটো মোজা হাঁটু পর্য্যন্ত, আঁট-সাঁট পাজামা হাঁটু অবধি নেমে এসেছে, কাবুলীওয়ালাদের জামার মতো একটা আচকান জাতীয় জামা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত এসেছে, এই জামার কোমরের তলার দিকটা কুঁচিয়ে খুব ফুলিয়ে দেওয়া, গায়ে একটা ক'রে রঙীন জরীদার বা রঙীন সূতোর নক্‌শা-কাটা ওয়েস্টকোট। এদের দেখ্‌তে আমার বেশ্ লাগ্‌ছিল। তবে এদের ভাষা ব'ল্‌তে পারি না—আলাপ করা অসম্ভব ছিল, আমার গাইড-বুকের গ্রীক আলাপের বচন আউড়ে দু'চারটে কথা আমি

ব'ল্‌তে পার্‌লেও তাদের কথা বোঝার শক্তি আমার নেই। খালি হেসে আর হাত নেড়ে বেশীক্ষণ চলে না। এদের প্রায় সকলের সঙ্গেই একটা ক'রে পশমে বোনা থ'লে—তাতে পশমের নেয়ারের মতো দড়ি লাগানো, আর থ'লের গায়ে রকমারি অতি সুন্দর নক্‌শা করা। শুনলুম এ-রকম থ'লে সচরাচর কিন্‌তে পাওয়া যায় না—পল্লীগ্রামের কৃষক-কন্যা আর বধূরাই ঘরে এগুলি বানায়, বাড়ির ব্যবহারের জন্য। ডেকের উপরে তেরপল টাঙিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, তাতে দুপুরের প্রখর রোদ্দুর অনেকটা আট্‌কেছে। নীল সাগরের উপর দিয়ে মিঠে হাওয়ার মধ্যে আমাদের জাহাজ তর্‌তর ক'রে চ'লেছে। দুপুরের দিকে এদের অনেকে খাবার বের ক'রে খেতে লাগ্‌ল—বিরাট্ বিরাট্ চক্রাকার অত্যন্ত পুরু লাল আটার পাঁউরুটী, আর ছাগল-দুধের cheese বা শক্ত ছানা; ছুরি দিয়ে রুটী কেটে নিয়ে, ছানাও ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে তার টাক্‌না দিয়ে রুটী খেতে লাগ্‌ল। আমাকেও ঐ খাবারের ভাগ দিতে চাইলে—আমার সঙ্গে আমি খাবার নিয়েছিলুম—রুটী, কেক, চকলেট, ফল—আমি ধন্যবাদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লুম। একটি ছোটো ছেলে ছিল, তাকে কিছু চকলেট দিলুম—অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সে নিলে।

ডেকে অন্য যাত্রীদের মধ্যে আমেরিকা-ফেরত একজন গ্রীকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমেরিকা-ফেরত ব'লে ইংরিজি ব'ল্‌তে পারে। প্রতি বছর হাজার হাজার গ্রীক আমেরিকা যায়, আমেরিকায় কিছু পয়সা ক'রে আবার স্বদেশে ফিরে আসে। নিউ-ইয়োর্ক আর তার কাছাকাছি জায়গায়—বিশেষ ক'রে শহর-অঞ্চলে—ওরা বাস করে; ছোটা-খাটো হোটেল আর জুতো-বুরুশের কাজ, এটা যেন গ্রীকদের একচেটে। আমেরিকায় গিয়ে দু'চার বছর থেকে কিছু কামিয়ে' নিয়ে এসে, এরা দেশে ফেরে—দু-এক বছর দেশে কাটিয়ে'

আবার আমেরিকা যায়। গ্রীসের পাড়াগাঁ অঞ্চলে রেলে ভ্রমণকালে দেখেছি, দুই গ্রীক যাত্রী মাতৃভাষার বদলে ইংরিজিতে কথা ব'ল্‌ছে—নিতান্ত পারিবারিক ঘরোয়া কথা। নাকী উচ্চারণের ইয়াঙ্কি উচ্চারণ শুনে বুঝ্‌তে দেরী হয় না যে, এরা আমেরিকা-ফেরত—ইংরিজি ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয়টিতে স্বদেশে চর্চার অভাবে যাতে ম'র্‌চে ধ'রে না যায়, সেই জন্য এই রকমে আপসের মধ্যে কথাবার্তা কইবার সুযোগ হ'লে ঝালিয়ে' নেয়। আমি ইংরিজি জানি দেখে খুশী হ'য়ে জাহাজের যাত্রী এই আমেরিকা-ফেরতা গ্রীকটি বেশ আলাপ জুড়ে' দিলে। অন্য গ্রীক যাত্রী যারা ইংরিজি জানে না, তারা প্রসন্নমুখে আমাদের এই আলাপ দেখ্‌তে লাগ্‌ল—ভাষা নাই বুঝুক, তাদের দেশের একজন লোক বিদেশী ভাষায় তড়বড় ক'রে এই বিদেশী মানুষটার সঙ্গে কথা চালাচ্ছে, এটা দেখেই তারা খুশী।

এই আমেরিকা-ওয়ালা গ্রীকটি বেশ হুঁশিয়ার। নিউ ইয়োর্কে তার একটি কুলফী-বরফের দোকান ছিল। বেশ চ'ল্‌ছিল দোকানটি, কিন্তু সে গ্রীস-রাজ্যের প্রজা;—তুর্কীদের সঙ্গে গ্রীকদের লড়াই বাধায়, তাকে দোকান ফেলে বন্দুক ধর্‌বার জন্য গ্রীক-সরকার ডাকিয়ে' এনেছে। দেশের বাইরে যত সব কর্মঠ লোক আছে, তাদের লড়াইয়ে যাবার পালা যেমন যেমন আস্‌ছে, তেমন তেমন তাদের ডাক প'ড়্‌ছে। ১৯২২ সাল থেকে পাঁচ বছর ধ'রে এই লোকটির লড়াইয়ের কাজে যোগ দেবার কথা, সেইজন্য কর্তব্য-পালন ক'র্‌তে তাকে ব্যবসা ছেড়ে দেশে ফিরে আস্‌তে হ'য়েছে। লোকটি এতে কিন্তু আদৌ খুশী নয়—কবে এ পাপ চুক্‌বে, সে আমেরিকা ফির্‌তে পার্‌বে, সেই চিন্তাতেই আকুল। দিন কতকের ছুটিতে এখন বাড়ি যাচ্ছে। লোকটির আর স্বদেশ ভালো লাগে না। আমায় ব'ল্‌লে—"মশাই, আমেরিকায় খাসা আছি,—কোথায়

নিউ-ইয়োর্ক-এ ব'সে দোকান চালাবো, ছ'পয়সা জ'ম্‌ছিল, না, এই সাত সাগর পেরিয়ে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে এশিয়া-মাইনোরে ঘোরা! আমি ভাব্‌ছি এই বার আমেরিকা ফিরে যেতে পার্‌লে, আমেরিকার প্রজা ব'নে যাবো—গ্রীক প্রজা আর থাক্‌বো না। ছেলেপুলে স্ত্রী সব তো আমেরিকাতেই আছে, ছেলেরা গ্রীক ব'ল্‌তেই পারে না—দেশে যা কিছু আছে বেচে-কিনে নিয়ে চুকিয়ে' দিয়ে যাবো।" অবশ্য সব গ্রীক-ই যে এই ধরনের, তা নয়। আথেন্স-এ আর একজন গ্রীকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—সেপাইয়ের উর্দী-পরা—আমাকে দেখে ভারতবাসী ঠাউরে', হিন্দুস্থানীতে কথা আরম্ভ ক'রে দিলে, দেখ্‌লুম লোকটি বেশ ভালো বাজারিয়া বা চল্‌তি হিন্দুস্থানী বলে। এই লোকটি ক'লকাতা আর রেঙ্গুনে বহুত দিন ধ'রে ছিল—রালি ব্রাদার্স-এর আপিসে কাজ ক'র্‌ত—বছর তিরিশ বয়েস হবে—একেও যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আনা হ'য়েছে। এর কিন্তু বেশ স্ফূর্তি দেখ্‌লুম—আমায় ব'ল্‌লে—"লড়াঈ খালাস হো জানে সে ফির হম ইন্দিয়া মেঁ জায়েঙ্গে—লড়াঈ মেঁ তকলীফ তো হৈ হী, দুশ্‌মনকে সাথ লড়্‌নে বখৎ আরাম কহাঁ—তো ভী হম্‌ মরদ্‌ হৈঁ, মরদ্‌ কো চাহিয়ে কি অপনা মুলুক কো বচানে কে লিয়ে, মুলুক কা ইজ্জৎ কে লিয়ে সিপাহী বন্‌না।"

জাহাজের যাত্রী আমেরিকা-ওয়ালাটি নিছক materialistic। আমি গ্রীসে দেখ্‌তুম, প্রায়ই গ্রীক লোকেরা—কি সেকেলে গ্রীক পোশাক পরা, কি আধুনিক সাধারণ ইউরোপীয় পোশাক পরা—প্রায় সকলে হাতে এক ছড়া ক'রে জপমালা রাখে—গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্টানী মন্ত্র জপ করে। জাহাজের যাত্রীদের মধ্যেও অনেকের হাতে জপমালা দেখি। আমি আমেরিকা-ফেরত গ্রীকটির দৃষ্টি মালার দিকে আকর্ষিত ক'র্‌লুম। সে হেসে ব'ল্‌লে—"কী আর দেখ্‌লেন—যত সব silly business।" তার নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লুম—আমি আগে শুনেছিলুম যে গ্রীকেরা খুব ধর্মপ্রাণ বা ভক্ত জাতি নয়, খ্রীষ্টান ধর্মমত ওদের মধ্যে মোটেই প্রবল নয়, যদিও দেশে গির্জে আছে অনেক, আর পাদ্রিও খুব (গ্রীক পাদ্রিরা বিবাহ ক'র্তে পারে, রোমান কাথলিক পাদ্রিদের মতো ওরা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী নয়)। আমেরিকা-ফেরত গ্রীকটি আমায় ব'ল্লে—"ও তোমার ঈশ্বর-ফিশ্বর আমি বুঝি না—দু'মুঠোর সংস্থান করাই আমার business—গাড-বিজ্‌নেস (God-business) নিয়ে আলোচনা ক'র্তে পার্বে পাদ্রিরা, তারা তো ঐ বিজ্‌নেস ক'রেই খায়।" ধর্মকে বিষয়কর্মের পর্য্যায়ে নিয়ে এসে ফেলা—কার্য্যতঃ সব দেশেই এ জিনিস চ'ল্ছে—এই গ্রীকটির কাছ থেকে এই বিষয়কর্মের বেশ একটি নাম পাওয়া গেল—ধর্ম কিনা God-business—যাকে Organized Religion বলে, তা প্রায় সর্বত্রই God-কে নিয়ে business-এ দাঁড়িয়েছে।

॥ ২ ॥

১৯২৭ সালে শ্রীরবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা শ্যামদেশে যাচ্ছি। পিনাঙ দ্বীপের ওপারে রেল স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেন ধ'রে শ্যামের রাজধানী বাঙ্কক পর্য্যন্ত সোজা রাস্তা। সকাল নটায় আমরা ট্রেনে উঠ্‌লুম। এই ট্রেন পরের দিন সকালে বাঙ্কক পৌঁছুবে—চব্বিশ ঘণ্টার পথ। ট্রেনটিকে International Mail বা আন্তর্জাতিক ডাকগাড়ি বলে। ব্রিটিশ-শাসিত মালাই-দেশের মধ্যে খানিকটা পথ, তারপরে শ্যামদেশের সীমা। পাদাঙ্‌-বেসার ব'লে একটা স্টেশনে আমরা বেলা দুটোর কাছাকাছি পৌঁছুলুম, এখানে ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ, শ্যামরাজ্যের আরম্ভ। এখানে ট্রেনখানি শ্যামরাজ্যের কর্মচারীদের দখলে গেল—ইংরেজ রেল কোম্পানীর লোকেরা গাড়ি ছেড়ে দিলে। গাড়ির গার্ডেরা আগে

ছিল ফিরিঙ্গি আর মাদ্রাজী, এখন হ'ল্ শ্যামী ; গাড়ির ড্রাইভার, ফায়ারমান ভারতীয় ছিল, এখনও ভারতীয় ড্রাইভার আর ফায়ারমান এল, তবে এরা শ্যামদেশের রেল বিভাগের কর্মচারী, ব্রিটিশ রাজের বা ব্রিটিশ রেল কোম্পানীর নয়। এই কর্মচারী পরিবর্তনে আধ ঘণ্টাটাক্ সময় লাগ্‌ল। কবি যাচ্ছিলেন এক বিশেষ সেলুন গাড়িতে, আমরা ছিলুম একটি প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে —আমরা অর্থে; কবির অনুগামী হিসাবে শান্তি-নিকেতনের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর আর আমি।

পাদাঙ্-বেসারে বিশেষ পার্থক্য কিছু নজরে এল না—সেই মালাই, চীনে, আর ভারতীয় লোকের সমাবেশ ; এ অঞ্চলটায় বৌদ্ধ-শ্যামীদের বেশী বাস নেই, মুসলমান মালাই-ই বেশী। স্টেশনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা শ্যামী, তবে সংখ্যায় কম। রেলটা প্রায় মাদ্রাজী আর হিন্দুস্থানীদের হাতে। রেলের কুলীরা মাদ্রাজী, রেলের পুলিস্ হিন্দুস্থানী।

পাদাঙ্-বেসার থেকে গাড়ি যাত্রা ক'র্‌লে। খানিক পরে, একটি শ্যামী ভদ্রলোক আমাদের কামরায় এলেন। তাঁর পরনে শ্যামদেশের সরকারী চাকুরের পোশাক। অতি অদ্ভুত লাগ্‌ল এই পোশাক। আগে ছবিতে দেখেছিলুম—এবার প্রত্যক্ষ ক'র্‌লুম। ভদ্রলোক প'রেছেন শ্যামদেশের বিশিষ্ট পরিধেয়, যাকে 'ফানুম্' বলে ; এটা হ'চ্ছে একটা লুঙ্গি, মালকোঁচা মেরে পরা। এই ভদ্রলোকের ফানুম্‌টা নীল রঙের রেশমের। এই নীল রঙের একটা কারণ আছে, সেটা পরে ব'ল্‌ছি। ফানুম্‌টা কোনওক্রমে হাঁটুর একটু নীচে পর্য্যন্ত এসেছে। ফানুম্-এর নীচে হাঁটু পর্য্যন্ত সাদা সুতির মোজা। পায়ে কালো ক্রোম চামড়ার বিলিতী জুতো। গায়ে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট। মাথায় সাদা কাম্বিস মোড়া সোলার টুপি। এঁর এই পোশাকে প্রাচ্য আর

প্রতীচ্যের এক অপূর্ব সমাবেশ। এই হ'ল শ্যামদেশের রাজকর্মচারীদের official dress বা সরকারী উর্দী। শ্যামীদের ফানুম্ লুঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে মালকোঁচা দিয়ে পরে, এই যা। ফানুম্ নানা রকমের রঙের আর নকশার হয়—তবে সরকারী চাকুরেরা—বিশেষতঃ উঁচু পদবীর বা পর্য্যায়ের—নীল রঙের ফানুম্-ই প'রে থাকেন। আমরা যখন শ্যামদেশে যাই, তখন রাজা ছিলেন প্রজাধিপক সপ্তম রাম। এঁর পূর্বে এঁর ভাই রাজত্ব ক'র্‌তেন—তাঁর নাম ছিল বজ্রায়ুধ ষষ্ঠ রাম। (শ্যামদেশের এখনকার 'মহাচক্রী' রাজবংশের রাজারা পর পর 'রাম' এই উপনামে প্রসিদ্ধ—১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই রাজবংশ শ্যামদেশে রাজত্ব ক'রে আস্‌ছে)। বজ্রায়ুধের জন্ম-বার ছিল শনিবার; শনি গ্রহের প্রিয় রঙ হচ্ছে নীল, সেই জন্য বজ্রায়ুধ নিয়ম করেন, তাঁর কর্মচারীরা নীল রঙের ফানুম্ প'র্‌বে—সেই থেকে নীল রঙের ফানুম্ রাজ-কর্মচারীদের অবশ্য-পরিধেয় হয়। শ্যাম রাজ্য-সরকার বিভিন্ন বিভাগে অনেকগুলি ইউরোপীয় রাখ্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন—ইংরেজ, ফরাসী, নরউইজীয়, জর্‌মান; এদেরও রাজ-দরবারের পোশাক হিসাবে ফানুম্ প'র্‌তে হয়।

মালকোঁচা-মারা ফানুম্ দক্ষিণ-শ্যামের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পোশাক। পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা পরে এই রকম কাছা-দেওয়া লুঙ্গী, আর বুকে বাঁধে একখানা গামছার মতো কাপড়, পুরুষেরাও ঐ ফানুম্ পরে, গায়ে দেয় একখানা রঙীন কাপড় বা চাদর। মেয়ে পুরুষ দুইয়েরই মাথার চুল কদম-ছাঁটা ক'রে রাখা হয়; আবার মোঙ্গোলীয় জাতি ব'লে পুরুষদের গোঁফ দাড়ী প্রায় হয়ই না; কাজেই অনেক সময়ে দূর থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় না, মানুষটি মেয়ে কি পুরুষ। এই ফানুম্ বা কাছা-দেওয়া লুঙ্গী ছিল দক্ষিণ-শ্যামের আদি অধিবাসী মোন্ আর খে্‌মর জাতির পোশাক;

শ্যামীরা উত্তর থেকে এসে, দক্ষিণে মোন্‌দের হারিয়ে' দিয়ে তাদের রাজা হ'য়ে বসে, কিন্তু তাদের ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম নেয়, তাদের লিপি নেয়, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি নেয়, পোশাক-পরিচ্ছদ নেয়। শ্যামী পুরুষেরা উত্তরে আগে ঢিলে ইজের প'র্‌ত, মেয়েরা লুঙ্গী কাছা না দিয়ে প'র্‌ত, আর গায়ে একটা ব'রে ঢিলে জামা দিত; এখনও উত্তর-শ্যামে শ্যামীদের জ্ঞাতি লাও জাতির লোকেরা আর অন্য শ্যামীরা এই পোশাক পরে। মেয়েদের এই পোশাক ভব্যতর বিধায়, এখন শ্যামের অভিজাত আর শিক্ষিত ঘরের মেয়েরা আবার পূর্বেকার মতো লুঙ্গী আর জ্যাকেট ধ'র্‌ছে, কাছা-আঁটা ফানুম্‌ ত্যাগ ক'র্‌ছে—পাঞ্জাবের শিক্ষিত হিন্দু আর শিখ মেয়েরা যেমন অনেকে এখন শালওয়ার আর কুর্তা ছেড়ে শাড়ি আর চোলী ধ'রেছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের শিক্ষিত মুসলমান মেয়েদের মধ্যেও যেমন শাড়ির চল্‌ আরম্ভ হ'য়েছে।

এই ভদ্রলোকটি এসে আমাদের 'গুড মর্নিঙ্‌' জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি একজন রেলের কর্মচারী, এই গাড়িতেই যাচ্ছেন, যাতে কবির কোনও কষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ্‌বার জন্য তাঁর প্রতি আদেশ হ'য়েছে; আর কবির মতন একজন মহোদয় ব্যক্তির সেবা ক'র্‌তে পার্‌লে তিনি নিজেও কৃতার্থ হবেন—কবির আর তাঁর সহযাত্রীদের সুখ সুবিধা আরামের জন্য তিনি কিছু ক'র্‌তে পারেন কি না, আমাদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। আমরা ধন্যবাদ দিলুম, তাঁকে ব'স্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লুম—তাঁর সঙ্গে আমাদের কার্ড বিনিময় হ'ল। তাঁর কার্ড নিয়ে দেখি, এক দিকে শ্যামী অক্ষরে তাঁর পরিচয় লেখা, আর অন্য দিকে ইংরিজি অক্ষরে। ইংরিজি লেখাটা হ'চ্ছে Phra Rathacharnprachaks। 'ফ্রা' শব্দটি শ্যামীরা আমাদের 'শ্রী'-র মতো ব্যবহার করে—এটি আমাদের সংস্কৃতের 'বর' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ' শব্দের-ই বিকৃত রূপ;

আর Rathacharnprachaks, অনুমান ক'র্‌লুম, হ'চ্ছে 'রথচারণ-প্রত্যক্ষ।' এটা এঁর নাম হ'তে পারে না—ভেবে দেখ্‌লুম, এটা এঁর উপাধি বা পদবী হবে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—"মহাশয়, এদিকে ইংরিজিতে যা লেখা আছে তা তো আপনার ব্যক্তিগত নাম ব'লে মনে হ'চ্ছে না—এ বোধ হয় আপনার রাজকীয় উপাধি।" তিনি ব'ল্‌লেন—"আপনি ধ'রেছেন ঠিক—আমি হ'চ্ছি একজন District Traffic Superintendent, আমাদের ভাষায় আমরা আপনাদের সংস্কৃত ভাষার শব্দ খুব ব্যবহার করি—ইংরিজি নামের অনুবাদ হ'চ্ছে ঐ কথাটা।"

শ্যামদেশের একজন রাজকর্মচারী বাঙ্ককে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তেন—কতকটা প্রদর্শকের মতো ; ইনি ছিলেন শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারী। ইনি আমাদের ব'লেছিলেন—"আমরা জা'তে চীনাদের জ্ঞাতি, কিন্তু সভ্যতা ও মনোভাবে ভারতীয়।" শ্যামদেশের ভাষায় এই ভাবটা খুব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এদের ভাষায় উচ্চভাব-দ্যোতক যত শব্দ, যত ঐশ্বর্য্যময়-ভাব-প্রকাশক শব্দ, সব সংস্কৃত থেকে নেওয়া। পদবী উপাধির তো কথাই নেই। শিক্ষা-বিভাগের ঐ কর্মচারীর সরকারী পদবী—'ফ্রা রাজধর্মনিদেশ'। মুর্শিদাবাদের এক বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোক ওভারসিয়ার হ'য়ে শ্যামদেশে যান, তারপরে ওদেশে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে' খুব উঁচু পদ পেয়েছেন। এখন ওদেশেরই প্রজা হ'য়ে গিয়েছেন—ভদ্রলোকের নাম হ'চ্ছে 'ওয়াহেদ আলি', কিন্তু ঐ নাম তাঁর নিতান্ত ঘরোয়া নাম—তাঁর উপাধির দ্বারাই তিনি এখন পরিচিত : তিনি Irrigation Officer বা জল-সেচ বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী—তাঁর কার্য্যভারের অনুরূপ উপাধি হ'চ্ছে Phra Warisimajhaks 'বারিসীমাধ্যক্ষ'। এখনকার রাজধানী বাঙ্ককের উত্তরে অযোধ্যা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে—

এই 'অযোধ্যা'কে শ্যামীরা বলে 'আইয়ুথিয়া'। সেখানে শ্যামীয় রাজাদের এক বাগান-বাড়ি আছে। এঁরা আমাদের অযোধ্যা দেখাতে নিয়ে যান। রেলে যাই, ষ্টীমারে ফিরি—মাঝে লঞ্চে ক'রে খুব খানিকটা ঘুরি। অযোধ্যা রেল-স্টেশনের স্টেশন-মাষ্টার হ'চ্ছেন একজন সিংহলদেশী বৌদ্ধ—তাঁর রাজকীয় পদবী হ'চ্ছে 'ফ্রা বিজিত ভৃত্যাধিকার', শ্যামী উচ্চারণে 'রাচফচাথিকান্', । রাজা বজ্রায়ুধ খুশী হ'য়ে এই পদবী তাঁকে দেন, কারণ তিনি সেবার দ্বারা রাজভৃত্যের অধিকার জয় ক'রেছেন। এ-সব তো হ'ল সরকারী পদবীর কথা। বাইরে থেকে এসে যারা শ্যামদেশে বাস ক'র্‌ছে, তাদেরও কেউ কেউ আবার শ্যামী নাম—গুরুগম্ভীর, সংস্কৃত থেকে আনা এই সব নাম নিয়ে ফেল্‌ছে। একটি বাঙালী মুসলমান ছেলে অনেক দিন ধ'রে বাঙ্ককে আছে—শ্যামী ভাষাটা সে ভালো রকমেই শিখে নিয়েছে—সে ছোকরা দীর্ঘ কাল শ্যামে অবস্থানের দরুন তার মুসলমানী নামটার যথাসম্ভব অনুবাদ ক'রে নিয়েছে ;—তার নাম ছিল সৈয়দ আলী ; তার জায়গায় 'মহাচরিতবং আরি' ; 'সৈয়দ' অর্থে মোহম্মদের বংশধর ; 'মহাচরিতবং' অর্থাৎ 'মহাচরিত বংশ', অর্থাৎ কিনা পুণ্যচরিত মোহম্মদের বংশ, সৈয়দ। আলি নামটার অনুবাদ না পাওয়ায় ঐ শব্দ শ্যামী উচ্চারণ অনুসারে 'আরি' এই রূপটি গ্রহণ ক'রেছে।

শ্যামদেশের মধ্যে একবার প্রবেশ ক'রে, এদের ভাষায় আর জীবনে সংস্কৃতের প্রভাব দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যেতে হয়—এ যেমন অপ্রত্যাশিত, আমাদের মতন ভারতবাসীর পক্ষে তেমন-ই প্রীতিকর। তখন শ্যামী ভদ্রলোকটির উক্তি মনে পড়ে—"আমরা জা'তে চীনে, কিন্তু সংস্কৃতিতে ভারতীয়।" শ্যামদেশের পয়সার নাম 'সতাঙ্' satang, এক শ' সতাঙ্ মিলে এক 'টিকল' tical হয় ; এই 'সতাঙ্' শব্দ হ'চ্ছে সংস্কৃত 'শতাংশ' শব্দের শ্যামী উচ্চারণ।

শ্যামী বর্ণমালা ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছে। একজন শ্যামী ভদ্রলোক তাঁর কার্ড দিলেন, তাতে এক দিকে শ্যামী ভাষায় শ্যামী অক্ষরে আর অন্য দিকে ইংরিজি ভাষায় তাঁর নাম ধাম দেওয়া আছে, বাড়ির টেলিফোনের নম্বরও দেওয়া আছে। আমি তো এখানে বাঙ্‌লা লিখ্‌তে লিখ্‌তে অম্লান-বদনে অতি সহজভাবেই 'টেলিফোন' লিখ্‌লুম—কিন্তু শ্যামী অক্ষরে যা লেখা র'য়েছে তা প'ড়্‌লুম—দেখ্‌লুম, শ্যামী ভাষায় টেলিফোনের প্রতিশব্দ বানিয়েছে আমাদের সংস্কৃত থেকেই—'দূর-শব্দ'। অবশ্য শ্যামী মতে এ শব্দের উচ্চারণ কানে শুন্‌লে শব্দটিকে ধরাই যাবে না—ওরা লেখে 'দূরশব্দ', বলে 'থোরো-সাপ্'। তদ্রূপ, হাওয়াই জাহাজের শ্যামী প্রতিশব্দ হ'চ্ছে 'আকাশ-যান', উচ্চারণে 'আগাৎ-ছান্'। এইরূপ শত শত শব্দ আছে। রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চ সম্প্রদায়ের অভিজাতবর্গের নাম সর্বত্রই সংস্কৃত শব্দ দিয়ে হ'য়ে থাকে।

॥ ৩ ॥

১৯২০ সালে ছাত্রাবস্থায় লণ্ডন থেকে স্কটলাণ্ড বেড়াতে গিয়েছিলুম। লণ্ডন থেকে আমার এক স্নেহাস্পদ বন্ধু আর আমি দু'জন এডিনবরা গেলুম—পথে এক রাত্রের জন্য ইয়োর্ক শহরে নেমেছিলুম—উদ্দেশ্য ছিল, ইয়োর্ক-এর সুবিখ্যাত গির্জা দেখ্‌বো। এডিনবরাতে বাঙালী বন্ধু ছিলেন, তাঁকে আগে থাক্‌তেই খবর দিয়ে রেখেছিলুম, তিনি আমাদের জন্য তাঁরই বাসাতে ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, সেখানেই উঠ্‌লুম। এডিনবরা শহরে আমরা দিন দশ-বারো ছিলুম; তারপরে আমরা তিনজনে—লণ্ডন থেকে আগত আমরা দু'জন, আর আমাদের এডিনবরার বন্ধু, এই তিনজন বাঙালী—মিলে উত্তর স্কটলাণ্ডটি একটু ঘুরে আসি—একেবারে Inverness ইনভার্‌নেস্, তারপরে ক্যালিডোনিয়ান-ক্যানেল দিয়ে,

ফোর্ট অগস্‌টস্‌-এ একদিন থেকে, Oban ওবান থেকে পাহাড়ে' অঞ্চল ঘুরে Trossachs ট্রসাখ্‌স্‌ হ'য়ে ফের এডিনবরা। এডিন-বরাতে ক'দিন থাক্‌তে থাক্‌তে ওখানকার হাল-চাল আর তখনকার দিনের ভারতীয় ছাত্রসমাজের ব্যাপার সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। দেখ্‌লুম, সাধারণ স্কচ গৃহস্থেরা অত্যন্ত গোঁড়া, যাকে বলে 'কট্টর্' খ্রীষ্টান—আর এদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ-বিদ্বেষ বড্ড বেশী। লণ্ডন ˘ শহর অনেকটা cosmopolitan—আন্তর্জাতিক-ভাবাপন্ন, নানা জা'তের আর নানা রঙের লোক লণ্ডনে আসে, লণ্ডনের হোটেল-ওয়ালারা, আর বাড়িওয়ালা ও বাড়িওয়ালীরাও বিদেশী কালো রঙের লোকেদের সর্বদা ভাগিয়ে' দেয় না। এডিন-বরায় এসে চারিদিকে বেয়ে চেয়ে বুঝ্‌লুম, বন্ধুর চেষ্টায় তাঁরই বাসাতে ঘর ঠিক করা না থাক্‌লে, মাথা গোঁজবার একটি জায়গার জন্য বড্ডই বেগ পেতে হ'ত।

আমার বন্ধুটি যে বাসায় ছিলেন, সে বাসায় একটি মাদ্রাজী—তামিল ছেলে ছিল। বয়স কম—২০।২১ হবে, ছেলেমানুষ-ছেলে-মানুষ, গোলগাল চেহারা—দেখে মনে হয়, বাপমায়ের আদুরে' ছেলে। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। খুব খোশ-পোশাকী—প্রত্যেক দিনই নোতুন নোতুন রঙওয়ারী রেশমের টাই রুমাল মোজা কামিজ বার ক'রে প'র্‌ছে। কিন্তু ভগবান একদিকে মেরে দিয়েছেন—ছেলেটি ভীষণ কালো, কষটি-পাথরের মতো রঙ। ছেলেটির নাম কী জিজ্ঞাসা করায় বন্ধুবর ব'ল্‌লেন—ওর নাম হ'চ্ছে T. S. Manian। এখন মালয়ালী বা মালাবারীদের মধ্যে Menon 'মেনোন্' নাম আছে জানি—Manian 'মেনিয়ান্' নাম তো কখনও দক্ষিণীদের মধ্যে, দ্রাবিড়দের মধ্যে পাই নি। তাই এই নাম সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হওয়ায় বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—"কই মশাই, এ নাম তো মাদ্রাজীদের মধ্যে কখনও পাই নি?" বন্ধুবর হেসে ব'ল্‌লেন—

"পাবেন কোথা মশাই—এ নাম তো ভারতবর্ষ থেকে আসে নি—এ নাম যে এখানে পয়দা হ'য়েছে।" আমি ব'ল্‌লুম—"সে কী রকম? ব্যাপারটা খোলসা ক'রে বলুন।" তখন বন্ধুবর ঘটনাটি বিবৃত ক'র্‌লেন। মাদ্রাজী ছোকরা যখন দেশ থেকে আসে, তখন তার পিতৃদত্ত নামটি নিয়েই সে এসেছিল; তার পাসপোর্টেও ঐ নাম-ই ছিল—T. Subramanian (অর্থাৎ 'সুব্রহ্মণ্যন্'—'সুব্রহ্মণ্য' হ'চ্ছে তামিল দেশে কার্ত্তিকেয়ের অন্যতম লোকপ্রিয় নাম)। একে স্কটলাণ্ডের মতো গোঁড়া খ্রীষ্টান আর বর্ণবিদ্বেষীর দেশ, তায় তার গায়ের রঙ কালো। অনেক কষ্টে বেচারী একটি বাড়িতে বাসা পেলে। ল্যাণ্ডলেডি গরীব আর অশিক্ষিত; অভাবে প'ড়ে কালা আদমীকে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছে, এই যথেষ্ট। তারপর যখন নাম দেখে, Subramanian—তখন সে ব'ল্‌লে, ও নাম আমি উচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌বো না। বাড়িউলীর মুখে নামটি ইংরিজি শব্দ Submarine-এ রূপান্তরিত হ'ল—বেচারী 'সুব্রহ্মণ্যন্' হ'য়ে গেল Mr. Submarine। এই নামে—আর তার কালো রঙেও বটে—বাসার অন্য পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ আর পাড়ার ছেলেরা—বড় কৌতুক অনুভব ক'র্‌ত। ব্যাপারটি কিন্তু বেচারী সুব্রহ্মণ্যনের পক্ষে বড়োই অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠ্‌ল। অনেক চেষ্টা ক'রে সে বাসা ব'দ্‌লে নোতুন বাসায় এল'। কিন্তু 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র'। সেখানেও ঐ Mr. Submarine; যেন তাকে এই Submarine-এ তাড়া ক'র্‌লে। শেষটা মরিয়া হ'য়ে এক পথ বার ক'র্‌লে—T. Subramanian-কে নোতুন ভাবে কেটে-ছেঁটে নিয়ে, সহজ ক'রে দিলে T. S. Manian; S-তে Subra—কোনও মানে হয় না, কিন্তু তার পর থেকে বেচারী একটু আরামে হাঁফ ছাড়্‌তে পার্‌লে।

বাস্তবিক, বড়ো নাম বিদেশী লোকের পক্ষে বিভ্রাট্‌কর। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে আমার পদবী 'চাটুর্জ্যে' যথা-

রীতি তার সভ্য সাধু সংস্কৃত রূপ ‘চট্টোপাধ্যায়’ Chattopadhyay-রূপে লিখিত আছে—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এই সংস্কৃত রূপটি তাদের কাগজপত্রে মেনে নিলে। সাধারণতঃ চাটুর্জ্যের ইংরিজি রূপ Chatterji আমরা ইংরিজি লিখবার কালে ব্যবহার ক’রে থাকি, আমার পাসপোর্টে এই Chatterji লেখা আছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে Chattopadhyay, আর সরকারী কাগজপত্রে Chatterji—এই পদবীর পার্থক্যটুকু বাইরের লোকে বুঝ্‌বে না—ব’ল্‌বে, এটা বদমাইষ লোক, a man with several aliases. তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক পত্র দিয়ে গিয়েছিলুম যে Chattopadhyay আর Chatterji এক-ই নামের বিভিন্ন রূপ, আর Chatterji শব্দও বিভিন্ন প্রকারে ইংরিজিতে বানান করা হয়। (এও আমাদের পক্ষে কম বিভ্রাট্ নয়—টেলিফোন গাইড খুঁজে Chatarji, Chatterjea, Chatterjee, Chatterji প্রভৃতির বানানের অরণ্যের মধ্য থেকে ঠিক লোকটিকে বার করা এক বিপদ্—চৌধুরী, বাঁড়ুর্জ্যে, মুখুর্জ্যের বেলায় আরও গোলমাল; এর একটা প্রতীকার দরকার—একটা সহজ সর্বজন-গ্রাহ্য একমাত্র রূপকে স্বীকার করিয়ে নিয়ে, বাকীগুলোর বিলোপ-সাধন)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটের সার্টিফিকেটে আমার নাম ক’লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা গৃহীত বাঙ্‌লা নামের বর্ণান্তরীকরণ মোতাবেক Sunitikumar Chattopadhyay-রূপে লিখিত হ’ল; আর লণ্ডনের Convocation বা সমাবর্তনের সময়ে যখন ডিগ্রী নেবার জন্য সমাবর্তনের সভায় আমাকে ভাইস-চ্যান্সেলারের সামনে হাজির হ’তে হ’ল, তখন ওখানকার অনুষ্ঠানের রীতি অনুসারে Usher বা পরিচায়ক আমার পূরো নামটি চেঁচিয়ে প’ড়্‌তে গিয়ে, ছুটো নামের বহর দেখে ভিরমী যাবার মতো হ’লেন—কপাল দিয়ে তাঁর কালঘাম ছুটতে লাগ্‌ল—দু-তিনবার হোঁচোট খেয়ে কোনো রকমে আমার

নামটি হ-য-ব-র-ল বা 'হরেকরকম্বা' ক'রে ব'লে উদ্ধার পেলেন। বহু পূর্বে স্যার ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যখন বিলাতে গিয়েছিলেন, তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি পত্রিকায় তাঁর নাম Brajendranath, ইংরেজের জীভে দুরুচ্চার্য্য ভেবে, এই নামটিতে আরও দু'চারটি অক্ষর জুড়ে দিয়ে এক বিভ্রাট্ সৃষ্টি ক'রে একটি রসের কবিতা লিখে কে বা'র ক'রেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় বহু বৎসর পূর্বে বিলাতে পাস ক'রে কিছুকাল ধ'রে ওয়েল্‌সে একটি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর এক জন ছাত্র—এখন তিনি লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজের Phonetics Laboratary-তে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও গবেষক, শ্রীযুক্ত Stephen Jones—ইনি জাতিতে ওয়েল্‌শ্, এঁর অধীনে আমি কিছুকাল কাজ ক'রেছিলুম—আমায় শ্রীযুক্ত মহলানবিশের সুখ্যাতি ক'রে বলেন যে, "ভদ্রলোক যেমন মানুষ চমৎকার তেমনি সুযোগ্য শিক্ষকও ছিলেন। কিন্তু এক বিপদ্ হ'ত তাঁর নাম নিয়ে—Mahalanobis নামটি আমাদের কাছে মস্ত বড়ো ঠেক্‌ত (ওয়েল্‌শ্ ভাষায় Cadwalladar, Llewellyn নাম আছে, আর ছত্রিশ না সাঁইত্রিশ অক্ষরের একটি গ্রামের নাম আছে, শুনেছি—সেই ওয়েল্‌শ্-ভাষীদের Mahalanobis নামে আতঙ্ক, যা'তে একটাও সংযুক্ত ব্যঞ্জন নেই!)—তাই আমরা লাটিন প্রার্থনার বচন Ora pro nobis (অর্থাৎ, 'আমাদের জন্য প্রার্থনা করো') আউড়ে' নামটির সঙ্গে মিল ক'রে মনে রাখ্‌তুম।" স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী যখন বিলাতে যান, তাঁর নাম Devaprasad Sarvadhikari নিয়েও ঝঞ্ঝাট হ'ত। একজন ইংরেজ তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রেছিলেন এই ব'লে—the gentleman with an unpronounceable name.

আমাদের ভারতীয় দীর্ঘ নাম নিয়ে বাইরের লোকেরা যে

বিপদে পড়ে, সে বিষয়ে একটি মজার গল্প—বোধ হয় H. G. Wells-এর লেখা—কয়েক বছর আগে একখানা ইংরিজি পত্রিকায় প'ড়েছিলুম—গল্পের ঘটনাটি ওয়েল্‌স্‌-এর নিজ অভিজ্ঞতায় হ'য়েছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ তখন সবে নোবেল-পারিতোষিক পেয়েছেন। ইউরোপে কেউ তাঁর নাম জানে না,—ইংলাণ্ডেও না। সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছেন—কে এ আধা-বর্বর ভারতবর্ষের কবি—যাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মর্য্যাদা দেওয়া হ'ল? অনেকে চ'টেও ছিল; আমি জর্‌মান পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র বেরিয়েছে দেখেছিলুম—নগ্নকায় জঙ্গলী কাফরী গাছের উপর চ'ড়ে ব'সে আছে—তলায় লেখা, এই কাফ্‌রী কবি মনসা গাছের সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন, এইবার তাঁকে নোবেল পারিতোষিক দেওয়া হ'ল। এ হ'ল কালা আদমীর ভালাই যারা দেখ্‌তে পারে না—সেইরূপ বর্বর মনোভাবের অধশিক্ষিত ইউরোপীয়দের কথা। শিক্ষিত সংস্কৃতিমান্‌ ইউরোপীয়েরা সর্বত্রই শ্রীরবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জান্‌তে কৌতূহলী হ'লেন—'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ চট্‌পট নানা ইউরোপীয় ভাষায় বেরিয়ে গেল। কিন্তু এই কৌতূহল ইংলাণ্ডের বাইরেই বেশী প্রবল—ইংলাণ্ডের তরুণ সম্প্রদায় ফুটবল, ঘুষাঘুষি আর ঘোড়দৌড়ের খবর নিয়েই মত্ত, মানসিক জগতের চিন্তা আর ভাবের জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বা জিজ্ঞাসা মোটেই নেই। এই অবস্থায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ নোবেল-পারিতোষিক পাবার কিছু পরে ওয়েল্‌স্‌ জর্‌মানিতে গিয়েছিলেন। জর্‌মানিতে একটি ছোটো শহরে তিনি আছেন, শহরটিতে একটি ছোটো অথচ প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। শহরের রাস্তা দিয়ে একদিন সন্ধ্যার পর তিনি বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে দেখেন, দূরে একটি গ্যাসের আলোর থামের পাশে কতকগুলি কলেজের ছাত্র জটলা ক'রে র'য়েছে—আর চেঁচামেচি তর্ক ক'র্‌ছে, তর্কের মধ্যে মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথের নাম শোনা যাচ্ছে—'রাবীন্দ্রনাট্‌ টাগোরে, রাবীন্দ্রনাট্‌ টাগোরে'। ব্যাপার দেখে' পুলকে

আর ক্ষোভে ওয়েল্‌স্‌ সাহেবের গায়ে রোমাঞ্চ হ'ল; পুলক এই জন্য যে, জর্‌মান জাতি কী সমঝদার সংস্কৃতিমান্‌ জাতি, যে-জাতির তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে এর-ই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম আর বাণী পৌঁছেছে। আর ক্ষোভ এই জন্য যে, ওয়েল্‌স্‌ সাহেবের স্বদেশ ইংলাণ্ডের ছেলেদের মধ্যে এ-সব বিষয়ে কতদূর অজ্ঞতা আর উপেক্ষা। কিভাবে এই জর্‌মান যুবকেরা রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ক'র্‌ছে তা শোনবার জন্য তিনি একটু কাছাকাছি হ'লেন। কাছে এসে যা দেখ্‌লেন, তা'তে তাঁর পুলক অন্যভাব ধারণ ক'র্‌লে। তিনি দেখ্‌লেন সব ছেলে কটি-ই মাতাল হ'য়েছে, কিন্তু সকলেই ব'ল্‌ছে, আমি ঠিক আছি, আরও দু'বোতোল খেতে পারি। শেষটা কে কম মাতাল হ'য়েছে তা স্থির করবার জন্য ওরা একটা উপায় বা'র ক'রেছে—বিদেশী আর কঠিন নাম হিসাবে, টানা আছাড় না খেয়ে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' Rabindranath Tagore এই নামটি উচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌বে, সকলেই স্বীকার ক'র্‌বে যে সত্যি-ই সে মাতাল হয় নি। বিশ্বকবির নামের এই অভাবনীয় ব্যবহার দেখে ওয়েল্‌স্‌ বিস্মিত হ'য়ে গেলেন—যে-জর্‌মান ভাষায় নিজস্ব দাঁত-ভাঙ্গা ছ'ফুট লম্বা শব্দের অভাব নেই (জর্‌মান ভাষায় 'ঘোড়ার ট্রাম-গাড়িকে' বলে Pferdstrasseisenbahnwagen! তারা কিনা এই অদুরুচ্চার্য্য নামটিতে এত ভয় পায়!

যা হোক, নামকরণের সময়ে পরের সুবিধা অসুবিধার দিকে একটু নজর রাখ্‌লে, ছেলেও বেঁচে' যায়, বাইরের লোকেরাও বেঁচে যায়। প্রায় সব ভাষার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর এ-কথা বলা চলে। Vijiaraghavachariar, Anavaratavinayakam, Prabirendrasundar, Abul Fazl Muhammad Muslihuddin Muzaffarabadi,—আজকালকার দিনে এ-সব নামের জালে

জড়িয়ে মানুষকে বিশেষ নাকাল হ'তে হয়। মাদ্রাজী চেট্টী ক'লকাতা থেকে মাল পাঠাবে; জাহাজ-কোম্পানীতে এসে নাম ব'ল্‌ছে—Tamana Ramana Nambuttiri Guruwaya and Company; বাঙালী কেরানী তিন চারবার "কেয়া বোল্‌তা? কেয়া বোল্‌তা?" ব'লে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন সুবিধে ক'র্‌তে পার্‌লে না, তখন চ'টে গিয়ে খাতা বন্ধ ক'রে ব'ল্‌লে—"দেখো, এত্তা বড়া নামসে চলেগা নেহি; হম্‌ বোল দেতা, এইসা তুম লিখো: T. R. N. Guria and Co." "চেট্টি নিরুপায় হ'য়ে তাই মেনে নিলে—তার অসুবিধা বিশেষ কিছু হ'ল তা মনে হয় না। অনেকেই বাধ্য হ'য়ে বা সুবিধার জন্য Subramanianকে S. Manian ক'রে নিই। অধ্যাপক স্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্‌ নিজের নাম গতানুগতিক-ভাবে C. Venkataraman ব'লে না লিখে যে C. V. Raman (রামন্‌—আমরা বাঙ্‌লায় যে 'রমণ' বলি তা ভুল) ক'রে নিয়েছেন, মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌বো ভালো-ই ক'রেছেন।

এদিকে যেমন আমাদের বিকট-বিকট বিরাট্‌-বিরাট্‌ নাম, ওদিকে চীনাদের নাম কখনও তিন অক্ষরের বেশী হয় না, এবং প্রায়-ই দুই অক্ষরের হয়: যেমন—Sun yat Sen, Chiang Kai Shek, Yuan Shih Kai, Hu Shih, Liang Chi Chiao. আবার এরকম নামও আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী গ্রাজুয়েটদের তালিকায় দেখেছি—একাক্ষর নাম—যেমন Ab (আব), Tee (টী): ব্যস, আর কিছু না; এ যেন আদিম যুগের সম্বন্ধে আমাদের কল্পিত নাম—কোন্‌ জা'তের লোকেদের তা মনে প'ড়্‌ছে না, বোধ হয় যেন ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জের। উত্তর-ভারতে কখনও কখনও পদবী-বর্জিত নাম এইরূপ সংক্ষিপ্ত দুই অক্ষরের দেখা দেয়: 'রাম্‌-লাল্‌, জৈ-চন্দ্‌, জৈ-ত্ত্যাল্‌', ইত্যাদি; এক অক্ষরের নামও পাওয়া যায়—যেমন 'রাম, দেও; চন্দ্‌'—আর কিছু নয়।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হ'য়ে প'ড়্ছে। নাম-রহস্য আলোচনা ক'রে, আর আধুনিক সভ্যজগতের পক্ষে সুষ্ঠু আর উপযোগী কী রকমের নাম হ'লে ভালো হয়, কোন্ ধরণের নামের দিকে এখনকার সভ্য-জগতের ঝোঁক বা গতি চ'লেছে—এ বিষয়ে বিচার প্রকট ক'র্তে পারা যায়। আপাততঃ এখানেই ইতি॥

আমার নিগ্রো বন্ধুরা

ছাত্রাবস্থায় বিলাতে অবস্থান-কালে—পনেরো বৎসরের উপর হ'ল—কতকগুলি নিগ্রো (আফ্রিকান) ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছিল।

লণ্ডনে ছিলুম দু'বছর ১৯১৯ থেকে ১৯২১; এই দু'বছরের মধ্যে মাস ছয় দু'টো বিভিন্ন বাসায় কাটাই। তারপরে আসি এক Y.M.-C.A. ছাত্রাবাসে। এই Y.M.C.A. ছাত্রাবাসটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। পঞ্চাশ জন ছাত্র এখানে থাক্‌ত; এদের মধ্যে ৩০ জন ছিল ব্রিটিশ—ইংরেজ, ওয়েলশ, স্কচ, আইরিশ; আর বাকি কুড়ি জন ছিল ইউরোপের নানা জাতির ছেলে, সব লণ্ডনে পড়াশুনো ক'র্‌তে এসেছে। এদের মধ্যে ফরাসী, ইতালীয়, স্যুইস, জর্‌মান, অস্‌ট্রিয় (জর্‌মান), রূমানীয়, রুষ, যুগোশ্লাব, গ্রীক—এই-সব জা'তের ছেলে ছিল। ভারতবাসী আমি একা ছিলুম প্রথমটা, তারপরে একটি তমিল ছেলে আসে। একজন তিব্বতী ছেলেও এসে দিনকতক ছিল। তারপরে আসে একজন শিখ ছোকরা, ভারতীয় সওয়ার রেজিমেণ্টের অফিসার, লড়াইয়ে ছিল, বিলেতে হাওয়াই জাহাজ চালানো শিখ্‌তে এসেছিল, সে-ও ছিল। আমাদের এই ছাত্রাবাসটি ব্লুমস্‌ব্যরিতে বেডফোর্ড-প্লেস রাস্তায় ছিল। প্রথমে আমাকে যে ঘরটি দেয়, তা থেকে ব্রিটিশ-মিউজিয়ামের বাড়ি দেখা যেত'। একজন ইংরেজ পাদ্রি ছিলেন এই ছাত্রাবাসের পরিচালক।

অনুরূপ আর একটি ছাত্রাবাস ছিল কাছেই, গিল্‌ড্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে। এখানেও ইংরেজ আর নানা জাতির অন্য ইউরোপীয় ছেলে থাক্‌ত। আমাদের এই দুই ছাত্রাবাসের ছেলেরা নিজেদের কতকটা এক-ই

বাড়ির অধিবাসী বা এক-ই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে ক'র্‌ত, এক বাড়ির ছেলেরা অন্য বাড়িতে যাওয়া-আসা ক'র্‌ত। খ্রীষ্টমাসের সময়ে আমরা ওদের ওখানে গিয়ে ডিনার খেয়ে এসেছি, আবার ওরাও আমাদের এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া ক'রেছে। এখানকার ছেলেরা নাচের ব্যবস্থা ক'রে এদের নিমন্ত্রণ ক'রেছে। যাওয়া-আসার সূত্রে লক্ষ্য করি যে, গিলড্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসে জন ৩।৪ নিগ্রো ছেলে আছে।

এই নিগ্রো ছেলেদের সঙ্গে ভাব কর্‌বার খুব ইচ্ছে হ'ত, কিন্তু তেমন সুযোগ ঘ'ট্‌ত না। গায়ে-পড়া হ'য়ে আলাপ ক'র্‌তে তেমন ইচ্ছেও হ'ত না। তার পরে, অনেকটা সময় নিজের কাজ-কর্ম নিয়েই থাকৃতে হ'ত, তাই সময় করা যেত' না যে গিল্‌ড্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে গিয়ে আড্ডা দিই। ব্রিটিশ-মিউজিয়মে গিয়ে, পশ্চিম- আর মধ্য-আফ্রিকার নিগ্রো শিল্পের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার ক'রেছি। পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনের ব্রোঞ্জ মূর্তি আর ফলক-চিত্র, আর অন্য জায়গার কাঠে-খোদাই মুখস, কঙ্গোর কাঠের মূর্তি প্রভৃতি, আমাকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট ক'রেছে। আমি নিগ্রোদের জীবন, ইতিহাস আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে, হাতের কাছে যে-বই পাচ্ছি, প'ড়্‌ছি। পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনের নিগ্রো—য়োরুবা দাহোমে, আশান্তি প্রভৃতি নিগ্রো জাতি, যেগুলির নামমাত্রের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাদের সম্বন্ধে আগের চেয়ে একটু বেশী ওয়াকিফ্‌-হাল হ'চ্ছি।

ইতিমধ্যে একদিন গিল্‌ড্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটের একটি নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ হ'ল। দুই ছাত্রাবাসের পরিচালকেরা একদিন আমাদের পল্লী-ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। তখন ইংলাণ্ডে গ্রীষ্মকাল, বোধ হয় মে মাস হবে; সমস্ত দেশে একটা সবুজের স্রোত বইছে যেন। গ্রীষ্মকালে ইংলাণ্ডের মতন দেশের পল্লীশ্রী বর্ণনাতীত সুন্দর। আমরা ছোটো-ছোটো দল ক'রে, এক-

এক জন নেতা বা পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে বেরুবো— ট্রেনে বা বাসে ক'রে লণ্ডন শহরের বাইরে ৩০।৪০ মাইল দূরে কোনও গ্রামে নাম্‌বো, সকাল সাতটার মধ্যেই বেরিয়ে প'ড়ে আটটা আন্দাজ গন্তব্য স্থানে উতরাবো। তার পরে, ম্যাপ নিয়ে পল্লীভূমির মধ্যে সারাদিন টহল দিয়ে, মাঠ আর গাছপালার মধ্যে ঘুরে ফিরে জিরিয়ে', ব'সে, বিকালে আবার ট্রেনে বা বাসে ক'রে লণ্ডনে ঘরে ফির্‌বো। আমি যে দলে যোগ দিয়েছিলুম, তা'তে আমরা ছয় জন ছিলুম—একজন স্থইস, একজন জর্‌মান, দু'জন ইংরেজ, একজন নিগ্রো, আর আমি।

এই নিগ্রো ছাত্রটি আমার প্রথম নিগ্রো বন্ধু বা আলাপী। আমাদের সঙ্গে একটা ঝুলিতে সারা দিনের রসদ ছিল—একগাদা সাণ্ডউইচ্। একজন ইংরেজ যুবক ছিল আমাদের রাহ-নুমা বা পথ-প্রদর্শক, সর্দার প'ড়ো-গোছ। বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ আর আমুদে' লোক।

নিগ্রো ছেলেটি বয়সে আমার চেয়ে ঢের ছোটো ছিল—বিশ বৎসরের বেশী তার বয়স হবে না। কিন্তু বোধ হয়, ছ' ফুট লম্বা, চেহারা যেমন জবরদস্ত তেমনি মজবুত। প্রায় একেবারে কয়লার মতো কালো রঙ্, তবে একটু কটা ভাব,--চকলেট রঙের আমেজ আছে। ছোকরার মুখে কিন্তু বেশ সরল একটা হাসি লেগেই আছে। এর নাম জেনে নিলুম—নামটি ছিল N. A. Fadipe ফাডিপে। একটা পূরো দিন এর সঙ্গে কাটাই, কাজেই এর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ আলাপ জ'মে ছিল। আমি জান্‌তে চাই তার জা'তের খবর—কী ভাষা তারা বলে, তাদের রীতি-নীতি কেমন, ধর্ম কী, কী খায়-দায়, থাকে কি-ভাবে, তাদের বৈশিষ্ট্য কী, আর নিজেদের সম্বন্ধে আর জগৎ সম্বন্ধে তাদের ধারণা কী, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল কোথায়, ইত্যাদি। এ-সব ঘরের কথা

আমার সহযাত্রী ইউরোপীয়দের সামনে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আমার একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌ছিল, আর বুঝ্‌লুম, তারও একটু সংকোচ হ'চ্ছিল। তাই যথাসম্ভব এদের এড়িয়ে' আমি এই নিগ্রোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'র্‌তে চাইছিলুম।

ফাডিপের বাড়ি হ'চ্ছে পশ্চিম-আফ্রিকার British Nigeria ব্রিটিশ নাইগিরিয়ার Lagos লেগস্‌ শহরে। ফাডিপে Yoruba য়োরুবা জাতীয় নিগ্রো। ব্রিটিশ নাইগিরিয়াতে Hausa হাউসা, য়োরুবা, Ibo ইবো প্রভৃতি বিভিন্ন-ভাষাভাষী বিভিন্ন-জাতীয় নিগ্রো বাস করে। য়োরুবারা হ'চ্ছে এদের মধ্যে একটা বড়ো জা'ত, সংখ্যায় এরা তিরিশ লাখ হবে। এদের নিজস্ব ধর্ম আর সংস্কৃতি আছে, কিন্তু নানা কারণে এদের অনেকেই বিধর্মী হ'য়ে গিয়েছে। উত্তরের হাউসারা বহু পূর্ব থেকেই মুসলমান, মুসলমান হাউসাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে হাউসাদের চাপে, আর দক্ষিণে খ্রীষ্টান মিশনরিদের প্রভাবে প'ড়ে, এখন য়োরুবাদের মধ্যে ধর্মভেদ ঘ'টেছে —এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে, এক-তৃতীয়াংশ খ্রীষ্টান, আর বাকী এখনও পুরাতন পৈতৃক ধর্ম আঁক্‌ড়ে আছে। খ্রীষ্টান য়োরুবারা অনেকটা ইংরেজ-ভাবাপন্ন হ'য়ে যাচ্ছে, প্রধানতঃ তারা-ই হ'চ্ছে উচ্চ-শিক্ষিত, আর এই য়োরুবারা-ই ইউরোপীয় নানা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বেশী ক'রে ইংলাণ্ডে আসে।

ছোকরার নামের মানে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। য়োরুবাদের পূজিত Ifa ইফা ব'লে এক দেবতা আছেন, তাঁর নামে নাম—নামের অর্থ হ'চ্ছে "ইফার দান"। ইফা দেবতা কে, তাঁর শক্তি বা গুণ কী, তাঁর চেহারা কেমন-ভাবে কল্পনা করা হয়, তাঁর পূজা কি-ভাবে হয়—এ-সব কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। সে ব'ল্‌লে যে সে খ্রীষ্টান—তার বাপ না ঠাকুরদাদা কে খ্রীষ্টান হ'য়েছিলেন—সে

নিজের জা'তের Pagan-দের Paganism-এর অর্থাৎ য়োরুবাদের আদিম ধর্মাবলম্বী অ-খ্রীষ্টান লোকেদের রীতিনীতি আর অ-খ্রীষ্টান খুঁটিনাটি ধর্মের খবর তেমন জানে না, সে-সব কথা সে ব'ল্‌তে পার্‌বে না। তবে ইফা দেবতা হ'চ্ছেন ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা। তাঁর দেয়াসী বা পুরুত আছে, তার হাত দিয়ে এই দেবতার পূজা বা বলি দিতে হয়—ফল, মূল, মদ, মুরগী, সুপারির মতো একরকম ফল আছে, এই-সব দেবতাকে অর্পণ করা হয়। দেয়াসীরা প্রার্থীর প্রশ্নের উত্তরে, কাঠের বারকোষে ষোলোটি কালো Kola nut বা কোলা ফল রেখে, সেগুলি নেড়ে-চেড়ে, দেবতার কাছ থেকে তাঁর অভিপ্রেত উপদেশ পায়; এই অনুষ্ঠান বেশ একটা নিয়ম ধ'রে হয়। এই ভাবে ইফা দেবতার কাছ থেকে বিশ্বাসী ভক্ত-জন উত্তর পায়। এই দেবতার প্রতিপত্তি খুব। Pagan বা আদিম ধর্মাবলম্বীরা এঁকে খুব মানে। ফাডিপের বাবা বা ঠাকুরদাদা যিনি খ্রীষ্টান হন, তিনি পূর্ব নাম ত্যাগ করেন নি। য়োরুবাদের মধ্যে—আর পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতির মধ্যে—জাতীয়তাবোধটুকু এখনও বেশ বিদ্যমান। খ্রীষ্টান বা মুসলমান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই পূর্ব নাম ত্যাগ করে না; যদিও আজকাল খ্রীষ্টান হ'লে সাধারণতঃ ইংরিজি পদবী আর সাধারণ ইংরিজি খ্রীষ্টান নাম, আর মুসলমান হ'লে আরবী নাম নেওয়াটা-ই এদের মধ্যে রীতি দাঁড়িয়ে' যাচ্ছে।

ফাডিপে তার নিজের জা'তের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানে না। নিগ্রো ব'লে, কালো রঙের জন্য তার মনে একটা অস্বস্তি আছে—বিশেষ ক'রে ইংলাণ্ডে সেটা সে বেশী ক'রে অনুভব করে। নিজের দেশে সে দেশবাসী, Native, কালা আদমী Black Man, তার হাজার হাজার বা লাখ লাখ স্বদেশবাসী নিগ্রোদের মধ্যে তার লজ্জা বা সংকোচ নেই। এখানে সাদা মানুষদের মধ্যে পদে-পদে তাকে বুঝিয়ে' দেওয়া হ'চ্ছে যে, সে কাফ্রি, পূরো বর্বর না হ'লেও অর্ধ-সভ্য।

যেখানেই যাক্ না কেন, লোকে—ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলে—তার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে, ঘৃণা আর অপমানের দৃষ্টিতে। একটু স্পর্শকাতর হ'লে, জিনিসটা প্রাণে বড়োই লাগে। ফাডিপে আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাস বংশের ছেলে নয়। আমেরিকায় নিগ্রোদের অপমান গা-সহা হ'য়ে গিয়েছে, তাদের সেখানে নিম্ন স্থান স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা হ'য়েছে। কিন্তু নিগ্রোর দেশ আফ্রিকায় অতটা খারাপ অবস্থা নয়। সুতরাং এই আবহাওয়ায় তার অস্বস্তি হবার-ই কথা। সে তার দেশের বিষয়ে বেশী কথা কইতে চায় না। বেশী কিছু জানে না ব'লে হয়-তো কতকটা; আর হয়-তো ভাবে, এ ভদ্রলোকের আবার আমাদের মতো অবজ্ঞাত জাতির সম্বন্ধে কৌতূহল কেন? কোনও মতলব নেই তো? আমিও তাকে বেশী প্রশ্ন ক'রে ত্যক্ত ক'র্‌লুম না। সে আমায় ব'ল্‌লে—"দেখুন, আপনাদের গায়ের রঙ্‌ আমাদের মতো এত কালো নয়, আপনারা তো ফরসা জাতি, White Man-এর সামিল—আপনারা আমাদের দুঃখ বুঝ্‌বেন না। আপনাদের এরা যে চোখে দেখে, আমাদের সে চোখে দেখে না, আমাদের সবচেয়ে হেয় আর নিকৃষ্ট ভাবে।" খ্রীষ্টানী সভ্যতা পেয়ে, দু' তিন পুরুষ ধ'রে ইংরেজ পাদ্রি আর সাধারণ ইংরেজদের সংস্পর্শে আর আওতায় থেকে, এদের মাজা যেন ভেঙে গিয়েছে, জাতীয়তাবোধের সঙ্গে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ানো যেন এদের পক্ষে কঠিন। নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞানও হারিয়েছে বা হারাচ্ছে, অপরের অজ্ঞ সহানুভূতি-বিহীন ধারণা এরা যেন মেনে নিচ্ছে। বিশেষতঃ বাস্তব জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরা তেমন কিছু উন্নতি ক'র্‌তে পারে নি, তাই আত্ম-বিশ্বাস নেই। একদিকে ইউরোপীয়েরা, আর অন্য দিকে আরবেরা, কয় শ' বছর ধ'রে এদের শুনিয়ে' এসেছে যে এরা অসভ্য, জগৎকে এরা কিছু দিতে পারে নি, ভবিষ্যতে দিতে পারাও এদের

পক্ষে কঠিন। আর চালাক-চতুর জা'ত নয় ব'লে, আপনার খেয়ালেই কাটিয়ে এসেছে ব'লে, পদে-পদে এরা অন্য জাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হ'টে আস্‌ছে। অনেকে তাই মুসলমানী বা খ্রীষ্টানীর ময়ূরপুচ্ছ প'র্‌ছে। কিন্তু তা'তে বেশী উন্নতি হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। তবু বরং ব'ল্‌তে হয় যে, খ্রীষ্টান ধর্মের চেয়ে ইসলাম এদের মুসলমান গৌরবে (নিগ্রো জাতীয়তার গৌরবে নয়) খাড়া ক'রে তুল্‌তে কতকটা সাহায্য ক'রেছে।

ফাডিপের সঙ্গে তখন এর বেশী আলাপ এগোয় নি।

* * *

কিছুদিন পরে, আর একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে আর কতকগুলি নিগ্রো ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তখন পরিণত বুদ্ধির জাতীয়তাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত, দুই-একটি নিগ্রো ভদ্রলোকের মনোভাব-জগতে কিছু পরিমাণ উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে পাই—আর দেখে খুব-ই প্রীত হই।

লণ্ডনের দক্ষিণে Surrey স্যরে প্রদেশের Woking উওকিঙ্‌ গ্রামে একটি মসজিদ আছে। ভূপালের এক বেগম এই মসজিদটি ক'রে দেন। এটিকে কেন্দ্র ক'রে, পাঞ্জাবের আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের কতকগুলি ইসলাম-প্রচারক, ইংলাণ্ডে আর সাধারণ-ভাবে ইউরোপে মুসলমান ধর্মের ব্যাখ্যা করেন, ঐ ধর্ম প্রচার করেন। আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা মুহম্মদ আলী, যিনি কোরানের একটি সুন্দর ইংরিজি অনুবাদ মূল আরবীর সঙ্গে একত্র ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন, তিনি উওকিঙ্‌-এর এই কেন্দ্রের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। এখন, আবদুল কয়্যুম মালিক ব'লে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক লণ্ডনের স্কুল-অভ্‌-ওরিয়েণ্টাল স্টডীজ—যেখানকার ছাত্র আমি ছিলুম,—সেখানে উর্দু পড়াতেন, তাঁর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা হয়। তিনি উওকিঙ্‌-এ থাক্‌তেন, ট্রেনে ক'রে লণ্ডনে পড়াতে

বা অন্য কাজের জন্য আস্তেন। তিনি আমাকে উওকিঙ্-এর মসজিদে ঈদুল্‌ফিতর্ পর্বের উৎসবে যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বহুদিন ধ'রে উওকিঙ্ মসজিদের কথা শুনে আস্‌ছি, দেখ্‌বার খুব-ই ইচ্ছা ছিল। এইবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। বিশেষতঃ ভদ্রলোক বিশেষ সৌজন্যের সঙ্গে, উত্তর-ভারতের উর্দুভাষী ভদ্রঘরের মুসলমানদের অননুকরণীয় বিনয় আর ভদ্রতার সঙ্গে, আমায় যখন অনুরোধ ক'রে জানালেন, ওঁরা যাঁদের-যাঁদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছেন, যাঁরা লণ্ডন থেকে উপস্থিত হবেন, ওখানে তাঁদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যও ব্যবস্থা থাক্‌বে। মালিক আমায় ব'ল্‌লেন, ভারতীয় ভাবে পোলাও কোর্মা, আর ঈদুল্‌ফিতরের বিশেষ মিষ্টান্ন সেমুইয়ের পায়স খাওয়াবেন। আর তা-ছাড়া, নানা লোকের সঙ্গে দেখাও হবে। সুতরাং, উপস্থিত হওয়াটা লোভনীয় ব'লেই মনে হ'ল। এক সঙ্গে রথ দেখা, কলা বেচা।

যথাসময়ে লণ্ডনের ষ্টেশনে—বোধ হয় ওয়াটার্‌লু ষ্টেশনে—উপস্থিত হ'লুম। সকালে দশটার দিকে ট্রেন, এগারোটার মধ্যে উওকিঙ্-এ পৌঁছানো যাবে। ষ্টেশনে গিয়ে দেখি, কালো রেশমের থোকা-ওয়ালা লাল তুর্কী টুপিতে প্লাটফর্ম একেবারে লাল আর কালো হ'য়ে গিয়েছে। লণ্ডন থেকে অনেক মুসলমান ছাত্র চ'লেছে। বেশীর ভাগ-ই হ'চ্ছে ভারতীয় মুসলমান। ষ্টেশনে আমার মতন হিন্দু আর কাউকে দেখ্‌লুম না। দু'চার জন নিগ্রোকেও দেখ্‌লুম, তারা ইউরোপীয়-পোশাক-পরা। কিন্তু এই-সব নিগ্রোর মধ্যে দুই মূর্তির পোশাক একেবারে অন্য ধরনের। একজন বৃদ্ধ, গায়ে সাদা রঙের একটি আলখাল্লা, পা পর্য্যন্ত লম্বা, প্রায় ভুঁয়ে এসে ঠেকেছে। সৌম্যদর্শন, রেখাযুক্ত প্রবীণ মুখমণ্ডলে একটা হাসি-হাসি ভাব লেগে র'য়েছে। বৃদ্ধের পোশাকের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হ'চ্ছে, তাঁর মাথার টপীটি। সাদা মোটা কাপড়ের ছোটো একটি

টুপী, কতকটা গাঁধী টুপীর মতো, কোনও অলংকরণ নেই, আছে কেবল কালো সূতোয় সেলাই-করা মোটা মোটা ইংরিজি অক্ষরে এই দুটি কথা—CHIEF OLUWA—অর্থাৎ "সর্দার ওলুবা"। বৃদ্ধ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে'; ইউরোপীয়-পোশাক-পরা আরো দু'তিনজন নিগ্রো আশে-পাশে; আর একটি দীর্ঘদেহ অতি সুদর্শন নিগ্রো যুবক, মিশ-কালো চেহারা, কিন্তু চোখে একটা উজ্জ্বল ভাব, সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা আভিজাত্যের গাম্ভীর্য্য—এমন কি তার নিগ্রো-সুলভ পুরু ঠোঁট আর চেপ্‌টা নাক সত্ত্বেও, তার চেহারায় চমৎকার একটা স্বাস্থ্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ঝলক আছে, যা'তে ক'রে তার দিকে ফিরে-ফিরে তাকাতে হয়। এর পোশাক-ও লক্ষণীয়। পরনে নীল রঙের আলখাল্লা, তার উপরে পাঁচ-সাতটা রঙ্‌ মেশানো একটি উত্তরীয়-মতন, মাথায় একটি নীল কাপড়ের টুপী; একটি ছোটো লাল কাপড়ের বিলিতি ছাতি খুলে, শ্বেত-পরিচ্ছদ বৃদ্ধের মস্তকের উপর সেই ছাতিটি ধ'রে দাঁড়িয়ে'। বোঝা গেল, সপারিষদ এক নিগ্রো সর্দার যাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, ইনিও উওকিঙ্‌ চ'লেছেন। এরা ছাড়া, ইউরোপীয় চেহারার, লম্বা তুর্কী-টুপী-পরা আরো কতকগুলি লোকও যাচ্ছে।

তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় আমি স্থান ক'রে নিলুম। যথাকালে উওকিঙ্‌ ষ্টেশনে পৌঁছানো গেল। মসজিদ ষ্টেশন থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই। আমরা হেঁটেই চ'ল্‌লুম। পাড়া-গাঁ জায়গা; তবুও দু-চারখানা ট্যাক্সি ষ্টেশনে থাকে। নিগ্রো সর্দারটির দল একখানি ট্যাক্সি দখল ক'র্‌লে, অন্যগুলিতে কালচে্‌-লাল ফেজ-টুপী-পরা হোমরা-চোমরা জনকতক উঠ্‌ল।

চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। ছোটো গ্রামটির ভিতর দিয়ে হেঁটে চ'ল্‌লুম। ছেলে-মেয়েরা খেলা ছেড়ে থম্‌কে' দাঁড়িয়ে', এই এত কালা আদমীর ভিড় দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তবে গাঁয়ের লোকেরা

মসজিদের কল্যাণে এ রকম ভিড় মাঝে-মাঝে দেখ্‌তে বোধ হয় অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে।

মসজিদটি অতি ছোট্ট, ক্ষুদে' ব্যাপার, সুন্দর মগরবী আরব বাস্তু-রীতি অনুসারে তৈরী চমৎকার ক্ষুদ্র ইমারতটি। মিসরী ধরনের নক্‌শা-খোদাই কাঠের মিমবার। সারা মসজিদটিতে পঞ্চাশজন লোকের নমাজের জায়গা আছে কিনা সন্দেহ। মসজিদের সামনে একটু বাগান, আর বাগানে একটা ফোয়ারা। মসজিদের মধ্যে একটি বাড়ি। সেটিতে ইমাম সাহেব থাকেন, সেখানেই ইসলাম ধর্ম-প্রচারের আপিস। মসজিদের পাশে, তার হাতার মধ্যে, বেশ বড়ো-গোছ একটা lawn বা মাঠ আছে। পাড়া-গাঁ জায়গা ব'লে এত জমি পাওয়া সম্ভব হ'য়েছিল।

আমরা পৌঁছাবার একটু পরেই, ঈদের নমাজ পড়্‌বার ব্যবস্থা হ'ল। হাতার মধ্যেকার মাঠটিতে কতকগুলি গালিচা বিছানো হ'ল। সার দিয়ে সমাগত মুসলমানেরা দাঁড়ালেন। একটি বাঙালী মুসলমান ছোকরা—লণ্ডনে থেকে ব্যারিষ্টারী প'ড়্‌ছিল, তার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'য়েছিল—আমায় ব'লে দিলে, ঐ উনি হ'চ্ছেন মিসরের রাজ্যচ্যুত Khedive খদীবের ছোটো ভাই, এখন তুর্কী-দেশেই বসবাস ক'র্‌ছেন; ইনি অমুক, উনি অমুক; একটি ইংরেজ মেয়েকে দেখ্‌লুম, কতকগুলি কালো-কালো ছেলে-মেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে'—ইনি হ'চ্ছেন বাঙ্‌লাদেশের মুসলমান ব্যারিষ্টার অমুকের ইংরেজ বউ, আর ওগুলি তাঁদের ছেলে-পিলে। পরিচিত হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, বাঙালী মুসলমান ছাত্র অনেকগুলি বেরুল। আর আমার মতো হিন্দুও দু'চার জন এসেছে দেখ্‌লুম।

নমাজ পড়া শুরু হ'ল। হিন্দু আমরা, আর ইংরেজ জনকতক, আর ইংরিজি-পোশাক-পরা নিগ্রো ৩।৪ জন এক পাশে দাঁড়িয়ে' এই ধর্মানুষ্ঠান দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। আমাদের নিগ্রো সর্দার

আর তাঁর ছেলে, আর মিসরের রাজকুমার আর তাঁর দল, আর অন্য কতকগুলি মাতব্বর লোক, ইমাম-সাহেবের পিছনেই সামনের লাইনে কাতার দিয়ে দাঁড়ালেন। কতকগুলি ইংরেজ মেয়ে, এরা ভারতীয় আর অন্য মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহিত, এরা দাঁড়াল’ সব পিছনের সারে। এদের ধরন-ধারনে আদৌ মনে হ’চ্ছিল না যে, এরা বেশ বিশ্বাসী মুসলমান—আপসের মধ্যে এরা মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হাস্‌ছিল।

যথারীতি নমাজ হ’ল। ইমাম-সাহেব একজন পাঞ্জাবী মুসলমান আধ-বুড়ো, চেহারায় লক্ষণীয় কিছু নেই; বিশুদ্ধ পাঞ্জাবী উচ্চারণে মামুলী আর মাঝে-মাঝে খুব ভুল ইংরিজিতে, ইসলাম ধর্ম-ই যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কথা প্রমাণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে কতকগুলি কথা বেশ জোর দিয়ে দিয়ে ব’ল্‌লেন।

ঈদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ চুক্‌ল, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তখন কোলাকুলির পালা আরম্ভ হ’ল। ইতিমধ্যে নিগ্রো সর্দারটি, তাঁর সঙ্গের আলখাল্লা-পরা যুবকটির সঙ্গে আর ইংরিজি-পোশাক-পরা নিগ্রোদের সঙ্গে এক কোণে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বস্‌বার জন্য এক চেয়ার এনে দেওয়া হ’ল। এদের খোঁজ নেবার ইচ্ছায়—এরা কে, কোথা থেকে এসেছে, কী বৃত্তান্ত জানবার জন্যে—আমি একটু এগিয়ে কাছে এলুম। একজন খুব দীর্ঘকায় (এই দলের নিগ্রোরা সবাই বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার) নিগ্রো ভদ্রলোক, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া কাঁচা-পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, ইংরিজি পোশাক প’রে দাঁড়িয়ে’, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক’র্‌লুম, “আপনারা কে? ‘কী বা নাম, কী বা ধাম, কী বা প্রয়োজন’?” তিনি ব’ল্‌লেন—“আমরা নাইগিরিয়ার লেগসের লোক। এই সর্দার হ’চ্ছেন লেগসের বারো জন White-cap Chiefs —অর্থাৎ সাদা-টুপী-ওয়ালা সর্দারের অন্যতম: এই সর্দারেরা হ’চ্ছেন আমাদের ও-অঞ্চলে ক্ষমতায় আর পদ-মর্য্যাদায় সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই যুবকটি হ'চ্ছে সর্দারের ছেলে। এঁরা মুসলমান। আমি সর্দারের সেক্রেটারী। আমি খ্রীষ্টান—আমার নাম Herbert A. Macaulay হার্বার্ট এ. মেকলে। সর্দারের একটি দরখাস্ত আছে কলোনিয়াল আপিসে, মামলা আছে, তাই আমরা এসেছি।” আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—“আপনাদের ভাষা ?” উত্তর হ'ল, “আমরা য়োরুবা ভাষা বলি। সর্দার ইংরিজি জানেন না, প্রাচীন লোক, তাই তাঁর সাহায্যের জন্যে আমার আসা।” আমি ব'ল্‌লুম, “দেখুন, আমি ভারতবাসী, খ্রীষ্টান নই, মুসলমান নই, হিন্দু ভারতবাসী। আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চাই, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই। আপনারা লণ্ডনে কতদিন থাক্‌বেন ? লণ্ডনে ফিরে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না ?” মেকলে য়োরুবা ভাষায় অনুবাদ ক'রে আমার কথা সর্দারকে ব'ল্‌লেন। সর্দার খুব খুশী-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে' একটু হেসে মেকলেকে কী ব'ল্‌লেন। তখন মেকলে আমায় ব'ল্‌লেন—“নিশ্চয়-ই. আমরা কম-সে-কম তিন-চার মাস থাক্‌বো। লণ্ডনে যদি আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন, আমরাও বিশেষ আনন্দিত হবো। ভারতবাসীদের সঙ্গে আমরাও ঘনিষ্ঠ পরিচয় চাই, আপনাদের কাছে আমাদের অনেক শেখ্‌বার আছে।” এই ব'লে ভদ্রলোক আমায় তাঁর কার্ড্‌ দিলেন, তা'তে লণ্ডনের ঠিকানা লিখে দিলেন। কবে দেখা ক'র্‌তে যাবো, চিঠি লিখে তাঁদের জানাবো, এই ব'লে ধন্যবাদ দিয়ে কার্ড্‌খানি নিলুম।

তারপরে মেকলে আর একটি সাহেব-সাজা নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে ইংরিজিতে আলাপ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন ; দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' এঁদের কথা শোনা গেল। বুঝ্‌লুম, অন্য নিগ্রোটি হ'চ্ছেন পশ্চিম আফ্রিকার Sierra Leone সিয়েরা-লেওনে দেশের অধিবাসী, একজন খ্রীষ্টান পাদ্রি। পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ-শাসিত নিগ্রোরা,—যারা Sierra Leone, Gold Coast এবং Nigeria এই তিন দেশে থাকে—

তাদের মধ্যে, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা হ'চ্ছে। ইংরিজি-শিক্ষিত আর বেশীর ভাগ খ্রীষ্টান নিগ্রোরাই এই আন্দোলনের নেতা। এঁদের মধ্যে বিলেত-ফেরত অনেক আছেন, নিগ্রো পাদ্রিও অনেক আছেন এখন। এঁদের মধ্যে, মেকলে আর Serrea Leone-র ভদ্রলোকটির কথায় বুঝ্‌লুম, আমাদের ভারতবর্ষের কংগ্রেসের মতন একটা মিলিত রাষ্ট্র-সভা গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা হ'চ্ছে। এঁরা বলাবলি ক'র্‌ছেন—"ইণ্ডিয়ানরা যে ভাবে তাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চালাচ্ছে, আমাদেরও সেই ভাবে কাজ ক'র্‌লে হয়। উপস্থিত এই তিন জায়গাতেই আমাদের আফ্রিকানদের মধ্যে সভা-সমিতি হ'তে থাক্‌, তারপরে আমরা আমাদের সম্মিলিত 'ব্রিটিশ-ওয়েস্‌ট্‌ আফ্রিকা কংগ্রেস' চালাবো—Freetown, Accra, Lagos—যেখানে হয় কংগ্রেস করা যাবে।"

যে-সব ভারতীয় মুসলমান, অফিসার আর সেপাই, বিগত মহা-যুদ্ধে ফ্রান্স আর বেলজিয়াম থেকে আহত বা অসুস্থ হ'য়ে ইংলাণ্ডে চিকিৎসার জন্যে এসে মারা যান, উওকিঙ্‌-এ মসজিদ আছে ব'লে ঐ গাঁয়ে তাঁদের গোর দেওয়া হ'য়েছে। আমরা ঐ গোরস্থান দেখে এলুম। লাইন-বন্দী কয়েক শত কবর। প্রত্যেকটির শীর্ষদেশে সাদা-রঙ-করা কাঠের একটা সাইন-বোর্ডের মতো, তা'তে উর্দূতে আর ইংরিজিতে মৃতের নাম, গ্রাম বা অন্য বাসভূমির উল্লেখ আছে। কত শত ভারত-সন্তান দেশমাতার ক্রোড় থেকে কত দূরে এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত!

উওকিঙ্‌ থেকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন ক'রে, দিন-কতক পরে হার্বার্ট মেকলে মহাশয়কে চিঠি লিখ্‌লুম। দক্ষিণ লণ্ডনে একটা বাসা নিয়ে এঁরা আছেন। আমার চিঠির উত্তরে ভদ্রলোক লিখ্‌লেন, আপনি আগামী রবিবার বিকালে আস্‌বেন। যথা-সময়ে বাসে ক'রে ওঁদের ঠিকানায় গেলুম। মনে আছে, দিনটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছিল। রাস্তা

আর বাড়ি খুঁজে বের ক'রে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে আওয়াজ ক'র্‌লুম (ওদেশের সদর-দরজায় কড়া থাকে না)। একজন ইংরেজ ঝী বেরিয়ে' এল। আফ্রিকান ভদ্রলোক মেকলের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাই শুনে, আমাকে নিয়ে ভিতরে বৈঠকখানায় বসালে। বাড়িটা মামুলী। মধ্যবিত্ত ইংরেজ বাড়িওয়ালা নীচের তলায় থাকে। এই আফ্রিকান সর্দার আর তাঁর সেক্রেটারী আর লোকজনের জন্যে উপরের কতকগুলি ঘর ভাড়া দেওয়া হ'য়েছে। উপরে খবর দিতেই, দীর্ঘদেহ হার্বার্ট মেকলে সাহেব নেমে এলেন। নিগ্রোদের হাসিটি চমৎকার। ভদ্রলোক খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমার হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিলেন, ব'ল্‌লেন যে, একজন ভারতীয় ভদ্রলোক তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছেন দেখে তিনি ভারী খুশী।

তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকের বিষয়কর্ম হ'চ্ছে ইঞ্জিনিয়ারী করা। যুবাবস্থায় বিলেতে এসে, কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প'ড়ে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ডিগ্রি নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন বিখ্যাত নিগ্রো Bishop Crowther বিশপ ক্রাউদার। আমি এই অসাধারণ নিগ্রো পাদ্রির কথা আগে প'ড়েছিলুম। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত পশ্চিম-অফ্রিকায় দাস-ব্যবসায় ছিল। পোতুর্গীস, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির লোকেরা পশ্চিম-আফ্রিকার সর্দারদের কাছে নিগ্রো দাস, মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, কিনে জাহাজে ক'রে আমেরিকায় তূলোর ক্ষেতে আখের ক্ষেতে কাজ কর্‌বার জন্য চালান দিত। জাহাজে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চ'ল্‌ত। ইংরেজেরা এই দাস-ব্যবসায় বন্ধ ক'র্‌তে চেষ্টা করে। বিশপ ক্রাউদার বাল্যাবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে তাঁর গ্রাম থেকে দাস-ব্যবসায়ীদের দ্বারা ধৃত হ'য়ে, ক্রীতদাস-রূপে দূরে নীত হন; অন্য অনেক দাসের সঙ্গে তাঁকেও জাহাজেও ক'রে নিয়ে যাবার

চেষ্টা হয়। পরে ইংরেজরা তাঁকে জাহাজ থেকে উদ্ধার ক'রে খালাস ক'রে দেন। কিন্তু কোথায় য়োরুবাদেশের অভ্যন্তরে কোন্ সুদূর অজ্ঞাতনামা নিগ্রো গ্রামে কে গিয়ে তার বাপ মায়ের কাছে একটা বাচ্চা নিগ্রো ছোকরাকে পৌঁছে দেয়? এক ইংরেজ দয়াপরবশ হ'য়ে তাঁর ভার নেন, নিজের খাস চাকরের মতো ক'রে তাঁকে রাখেন, আর তার পরে সঙ্গে ক'রে তাঁকে ইংলাণ্ডে নিয়ে আসেন, ইংলাণ্ডে তাঁর লেখাপড়ার শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেন। একটু বড়ো হয়ে, এই নিগ্রো ছেলেটি স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হয়, আর তার উপকারকের পদবীটি গ্রহণ করে। পরে বিলেতে লেখা-পড়া শিখে, ধর্ম-প্রচারক হ'য়ে স্বদেশে তিনি ফিরে আসেন, আর পাদ্রি ক্রাউদার নামে, স্বজাতীয় নিগ্রোদের খ্রীষ্টান কর্‌বার জন্য উঠে প'ড়ে লাগেন। ইনি দূর দূর পল্লী-অঞ্চলে প্রচার-কার্য্যে ঘুরে' বেড়াতেন। এই রকম ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে, তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন, আর সেখানে তাঁর মাকে খুঁজে পান। মা এতদিনে বুড়ো হ'য়েছেন। কিন্তু ছেলেকে এই অবস্থায়ও চিন্‌তে পারেন; মাতা-পুত্রে আবার মিলন হয়। মা ছেলের আশ্রয়েই থাকেন। পাদ্রি ক্রাউদারের পাণ্ডিত্য, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা আর কর্মশক্তি দেখে, চার্চ অভ ইংলাণ্ডের কর্তারা ঔদার্য্য দেখিয়ে' তাঁকে বিশপ বা উচ্চ অঙ্গের ধর্মগুরুর পদে উন্নীত করেন। একজন নিছক নিগ্রোকে এইভাবে এই প্রথম বিশপ পদ দেওয়া হ'ল। বিশপ ক্রাউদার ইংলাণ্ডে গিয়ে বিশপ-পদে অভিষিক্ত হন, খুব ঘটা ক'রে, ওয়েস্টমিন্‌স্টার আবিতে। তাঁর সমস্ত জীবন ধ'রে, আদর্শ খ্রীষ্টানের মতো কাজ ক'রে, ক্রাউদার স্বদেশে দেহরক্ষা করেন, মেকলে তাঁর দৌহিত্র। সুতরাং খুব গোঁড়া ঘরের খ্রীষ্টান। কিন্তু দেখ্‌লুম, তাঁর খ্রীষ্টানি গোঁড়ামি মোটেই নেই। কালা আদমী ব'লে সাদা আদমির কাছে ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে এখন ইউরোপের বাহ্য সভ্যতার প্রতি এঁর যেন একটা বিতৃষ্ণা

এসে গিয়েছে। অন্য বহু উচ্চ-শিক্ষিত নিগ্রোর মতন, এখন এঁর মনে ঘরের টান এসেছে। স্বজাতির আভ্যন্তর গুণাগুণ পর্য্যালোচনা ক'রে, এখন একটু অন্তর্মুখিতা এসেছে ; নিগ্রো হ'লেও, নিজ জাতির সম্বন্ধে মর্য্যাদাবোধ এসেছে।

সর্দার ওলুব্রার লণ্ডনে আস্‌বার কারণ হ'চ্ছে এই। ইংরেজেদের ওই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা হবার আগে, য়োরুবা জাতের বারো জন সর্দার মিলে একটা confederacy বা সঙ্ঘ করেন। এঁদের হাতেই য়োরুবা রাজ্যের পরিচালনার সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা ছিল। এঁদের "সাদা-টুপী" সর্দার বা নাম হয়। পরে ক্রমে ছলে বলে কৌশলে দেশটা ইংরেজদের দখলে এল', য়োরুবা দেশের সাগর-কূলে Lagos লেগস্‌ শহরের পত্তন হ'ল। সর্দারেরা স্বাধীন রাজা থেকে সামন্তে, পরে সামন্ত থেকে জমীদারে অবনীত হ'লেন —আস্তে-আস্তে। এখন, লেগস্‌-এর আশে-পাশে সর্দার ওলুব্রার বিস্তর জমি আছে। লেগস্‌ শহরের বৃদ্ধি হ'চ্ছে, বন্দরও ফালাও ক'রে বাড়ানো হ'চ্ছে। তাতে ক'রে জমির দর হু-হু ক'রে বেড়ে উঠ্‌ছে। বন্দরের জন্য যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আবশ্যক, তার মালিক হ'চ্ছেন সর্দার ওলুব্রা। নাইগিরিয়ার ইংরেজ সরকার এই জমি এঁর কাছ থেকে পয়সা দিয়ে না কিনে, বিনা বিচারে বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছেন। কারণ দর্শিয়েছেন—যতদিন সর্দার স্বাধীন রাজা ছিলেন, ততদিন-ই কেবল এই-সব জমিতে তাঁর স্বত্ব ছিল, এখন আর তিনি স্বাধীন রাজা যখন নন, তখন এই জমিতে তাঁর কোনও অধিকার নেই। জমি হ'চ্ছে সারা দেশবাসীর—সুতরাং দেশবাসীর উপকারের জন্যে বন্দর ক'র্‌তে যে জমি দরকার হবে, তা ইংরেজ সরকার বিনা পয়সায় নেবে বই কি। সর্দারের আপত্তি—এ-সব জমি ব্যক্তি-গত, বংশ-গত সম্পত্তি ; এতদিন ইংরেজদের আমলে তিনি এর মালিক ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছেন, এখন তাঁকে ফাঁকি দেবার জন্যেই

এই-সব কথা বলা হ'চ্ছে। 'ভিতরের কথাটা হ'চ্ছে, সর্দার ওলুব্রা অর্থনৈতিক বিষয়ে ইংরেজদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে; মেকলে আর অন্য বহু শিক্ষিত নাইগিরিয়ানদের মতন, তিনি ঘোরতর জাতীয়তাবাদী। এইজন্য স্থানীয় আদালতে বিচার না পেয়ে, তিনি সুবিচারের আশায় ইংলাণ্ডে এসেছেন। করিতকর্মা লোক, আগে ইংলাণ্ড দেখা আছে, এইজন্য মেকলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য সফল হ'ক—আমি এই শুভ কামনা জানালুম। ইতিমধ্যে সর্দার নীচে বৈঠকখানায় এলেন। এখনও তাঁর পরনে সাদা পোশাক, তবে গায়ে রঙীন একটা আলোয়ানের মতন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলেও এল'। এই যুবকটিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, এর গায়ে জামা ছিল না; ডান কাঁধ আর ডান হাত খোলা রেখে, একখানা মস্ত চাদর গায়ে জড়ানো ছিল। কালো চেহারা, দৃঢ় ঢেউ-খেলানো পেশী, মাথায় রঙীন কাপড়ের একটা সরু ফেটা বাঁধা। গায়ের চাদরটা কোনও ইউরোপীর কাপড়ের নয়—নীল রঙ, আর মাঝে-মাঝে লাল কালো বেগুনে হ'ল্‌দে পাঁশুটে প্রভৃতি নানা রঙের রেখা বা দাগ। পায়ে চাপলি জুতো। যেন একজন গ্রীক রোমান যুগের মানুষ। ইংলাণ্ডে ঘরের ভিতরে খালি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে' আস্‌তে এঁর সংকোচ বা লজ্জা নেই। সর্দারের ছেলে বৈঠকখানার একপাশ থেকে একটা অদ্ভুত আকারের ছোটো চৌকী বা সিংহাসন টেনে এনে আমার সামনে রাখ্‌লে, সর্দার তা'তে ব'স্‌লেন। এই সিংহাসনটিতে পিঠে হেলান দেবার কিছু নেই, হাত রাখ্‌বার হাতলও নেই। মনে হ'ল, যেন একখানা ভারী গুঁড়ি কাঠ কেটে এই আসন তৈরি হ'য়েছে—এত ভারী বোধ হ'ল। বুঝ্‌লুম—এই শ্রেণীর সর্দারেরা যে-সে চেয়ারে বসেন না। ইউরোপে এসেও দেশের ঠাট বজায় রেখেছেন, সঙ্গে ক'রে নিজের পদের উচিত আসন এনেছেন। যা হ'ক, তাঁর রাজাসনে

সর্দার ব'স্‌লেন, তাঁর ছেলে তাঁর পাশে দেহরক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে' রইল। চোখের সামনে, স্বদেশীয় পোশাকে ভূষিত আফ্রিকার অভিজাত-বংশের বার্ধক্য আর তারুণ্যের অতি মনোহর চিত্র প্রসারিত রইল।

মিস্টার মেকলে য়োরুবা ভাষায় সর্দারের কাছে আমার পরিচয় করিয়ে' দিলেন—ভারতবর্ষীয় ছাত্র, আমাদের বিষয়ে খুব খোঁজ-খবর রাখেন, আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। সর্দার সৌজন্য ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন। য়োরুবা ভাষা চীনার মতো একাক্ষর; চীনার মতনই, সুর-অনুসারে শব্দের অর্থ বদ্‌লায়; চীনা ভাষার মতো সুরে এরা কথা বলে; কিন্তু ভাষাটা আমার কানে তেমন শ্রুতিমধুর ঠেক্‌ল না। কণ্ঠ্য আর ওষ্ঠ্য ধ্বনি-ই বেশী মনে হ'ল। ভারতবর্ষ কোথায়, কেমন দেশ, কত লোক, ইংরেজরা কেমন ব্যবহার করে—এ-সব কথা সর্দার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। তখন হ'চ্ছে খিলাফতের যুগ—ভারতের হিন্দু নেতারা খিলাফৎ নিয়ে খুব-ই উৎসাহ প্রকাশ ক'র্‌ছেন। হিন্দু-মুসলমান একতা যেন হয়ে গেল আর কি! সর্দার এ-সব খবর কিছু-কিছু রাখেন। তিনি এতে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌লেন।

সর্দারের ছেলে যে চাদর গায়ে জড়িয়ে' ছিলেন, সেখানি আফ্রিকার বোনা আর নিগ্রো বস্ত্র-শিল্পের আর রঙ্গ-রেজীর নমুনা শুনে, মেকলে সাহেবের আর সর্দারের অনুমতি নিয়ে হাতে ক'রে দেখ্‌লুম। আফ্রিকায় ছোটো-ছোটো তাঁত ব্যবহার করা হয়, এখনও আমাদের দেশে ত্রিপুরায় মণিপুরে আর অন্যত্র যে রকম তাঁত চলে। এতে কাপড় খুব চওড়া হয় না; তিন চারখানা পাশাপাশি রেখে সেলাই ক'রে নিলে তবে প্রমাণ-সই চওড়া কাপড় হয়। কাপড়ের গছ একটু মোটা ধরনের—আমাদের দেশের মোটা সূতার চল্‌তি তাঁতের-কাপড়ের বা সাড়ির গছ যেমন হয়। তবে এই কাপড়ের নীল লাল হ'ল্‌দে কালো চকা-বকা রঙ-টি

চমৎকার। কালো পাথরে কোঁদা বা কালো ব্রোঞ্জে ঢালা মূর্তির মতন এই নিগ্রো যুবকের গায়ে এই খাদির ধাঁচে মোটা মজবুত আর নীল প্রভৃতি পাঁচ-মিশালী রঙের গাত্র-বস্ত্র বড়োই মানান-সই হ'য়েছিল।

আরও দু'তিন জন নিগ্রো ভদ্রলোক এলেন বাইরে থেকে। এঁরা ইউরোপীয়-পোশাক-পরা। এঁদের সঙ্গে পরিচয় করালেন মেকলে সাহেব। এক এক ক'রে সকলের সঙ্গে কর-মর্দন হ'ল। একটি ইংরেজ মহিলাকে সঙ্গে ক'রে একজন নিগ্রো এলেন—এঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, নিগ্রো পুরুষটি আমাদের-ই স্কুল-অভ-ওরিয়েণ্টাল-স্টাডীজ্‌-এ য়োরুবা ভাষা পড়ান, ইংরেজ মেয়েটি তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোক ইংলাণ্ডে দীর্ঘকাল ধ'রে আছেন। এঁরা আপসে য়োরুবা ভাষাতেই আলাপ ক'র্‌ছিলেন। আমার বোঝ্‌বার জন্য কখনও-কখনও ইংরেজিও ব'ল্‌ছিলেন। কথাবার্তার বেশীর ভাগ-ই ছিল নাইগিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে—সর্দারের আসন্ন মকদ্দমা নিয়ে, লেগস্‌-নগরের স্থানীয় সব ব্যাপার নিয়ে। আমাকে এঁরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু-কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। আমি মোটামুটি দু'চার কথা ব'ল্‌লুম। মেকলে সাহেবকে ব'ল্‌লুম, আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বই আর কাগজ-পত্র পাঠিয়ে' দেবো।

একটি বারো-তেরো বছর বয়সের ইংরেজ মেয়ে এল'—মনে হ'ল, মেয়েটি যেন এই নিগ্রোদেরই আশ্রিত। আমার ধারণা হ'ল, হয়-তো এর বোন-টোন কেউ এই নিগ্রোদেরই কাউকে বিয়ে ক'রেছে, ভগিনীপতির আশ্রয়ে থাকে। একপাল নিগ্রো, তাদের মধ্যে অদ্ভুত পোশাক প'রে সর্দার আর তাঁর ছেলে, আর সকলেই তার অবোধ্য য়োরুবা ভাষায় কথা কইছে—এই অবস্থার মধ্যে প'ড়ে বেচারী যেন একটু ভেব্‌ড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে কখন ঘণ্টা দুই-আড়াই অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে, তা টের পাইনি—এদের সঙ্গে কথাবার্তা এমন জ'মে উঠ্‌ছিল। সাতটা বাজ্‌ল—এদের সায়মাশের সময় হ'ল—ঝী এসে

খবর দিলে, খাবার দেওয়া হ'য়েছে। মেকলে সাহেব আমায় ব'ল্‌লেন —"আসুন আপনি, আমাদের সঙ্গে আহার ক'র্‌লে আমরা বিশেষ খুশী হবো।" আমি একটু মৃদু আপত্তি ক'র্‌লুম; কিন্তু তার পরে মনে হ'ল, আমি এদের সঙ্গে না খেলে এরা হয়-তো ভাব্‌বে যে, এদের অসভ্য কাফ্রি মনে ক'রে সাধারণ শ্বেতকায় মানুষের মতন আমি এদের সঙ্গে খেতে রাজী হ'চ্ছি না। তাই আমি এদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে গা তুল্‌লুম। খাওয়া হ'ল, ইংরিজি কায়দায়—প্রচুর ঠাণ্ডা মটনের রোস্ট ছিল মুখ্য পদ।

এইভাবে আমার নিগ্রো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে আর তাদের সঙ্গে মিলে আহারে বেশ পরিতৃপ্ত হ'য়ে, সেদিনের মতো আমি বিদায় নিলুম।

তারপরে এদের বাড়িতে আর একদিন যাই। মেকলে সাহেবও আমার সঙ্গে দেখা ক'রে শিষ্টতা বজায় রাখ্‌তে আমাদের ছাত্রাবাসে একদিন আসেন। আমার ঘরে এঁকে বসিয়ে' এঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি। এর পূর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয়ে লালা লাজপৎ রায়ের লেখা একখানি বই, আর অন্য কিছু চটি বই, আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আমার কাছে যা ছিল, তা মেকলে সাহেবকে দিয়েছিলুম।

শ্রীযুক্ত মেকলে তাঁর জা'তের সংস্কৃতি সম্বন্ধে দু'চারটে কথা আমায় যা ব'লেছিলেন, তা সকলকে শোনাবার যোগ্য। তিনি ব'ল্‌লেন—"দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাদের বর্বর, অসভ্য বলে; আমরা হয়-তো তা-ই, কারণ আমাদের মধ্যে লেখা-পড়া, উঁচু-দরের শিল্প, সাহিত্য এ-সব কিছু-ই হয় নি (নিগ্রো শিল্প নিয়ে ইউরোপে তখন শিল্পী আর শিল্প-রসিক মহলে যে গভীর আন্দোলন চ'লেছে, ইনি তার খবর রাখেন না); কিন্তু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান অনুসারে আমরা আমাদের জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে

নিয়েছি। আমাদের জা'তের লোকেরা যেখানেই ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে বা আরবদের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই তারা বিগ্‌ড়েছে আমাদের নিজস্ব জাতীয় গুণ থেকে তারা স্খলিত হ'য়েছে, সরলতা, সততা, কোমলতা, সব রকমের মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে চল্‌বার প্রবৃত্তি, সত্যবাদিতা—আমাদের এ-সব স্বধর্ম তারা ভুলে গিয়েছে। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে আমাদের দেশের লোক মাতাল, দুশ্চরিত্র, দাস-মনোভাবাপন্ন হ'চ্ছে; মুসলমান হ'য়ে গোঁড়ামিতে ভরা, উদ্ধত আর অপরের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হ'চ্ছে। শহর ছেড়ে দূরে bush বা পল্লী-অঞ্চলে যান; সেখানে আমাদের খাঁটি নিগ্রো মনোভাব বিদ্যমান আছে দেখ্‌বেন। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পথ চ'লে গিয়েছে। রাহী লোকেরা সেই পথ দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে নগরান্তরে যাওয়া-আসা করে। গ্রামগুলি এই পায়ে-চলা পথ ছেড়ে আরও ভিতরে—এক-দু মাইল দূরে। আমাদের জঙ্গলের পথে জলকষ্ট। ভোরের বেলায় গ্রামের কোনও স্ত্রীলোক এক কলসী জল, কতকগুলি না'রকেল, হয়-তো এক কাঁদি কলা মাথায় ক'রে পিঠে ক'রে নিয়ে গিয়ে, এক মাইল দু মাইল পথ হেঁটে জঙ্গলের পথের ধারে একটি গাছতলায় রেখে দিয়ে এল'। জলের কলসী না'রকেল মালা দিয়ে ঢাকা, মালার ভিতরে তিনটি নুড়ী বা ঢিল রাখ্‌লে। না'রকেলগুলির কাছে পাঁচটি নুড়ী। আর কলার কাঁদির কাছে দুটি নুড়ী। রাহী লোকে তা দেখে বুঝ্‌বে, এক মালা জলের দাম তিনটি কড়ি (আমাদের দেশে শহরের বাইরে পাড়াগাঁয়ে এখনও কড়ি চলে), একটি না'রকেলের দাম পাঁচটি কড়ি, একটা কলার দাম দুটি কড়ি। যাদের দরকার, তারা একমালা বা দু'মালা জল খেয়ে, একটা বা দুটো না'রকেল বা পাঁচটা কলা নিয়ে, হিসাব ক'রে কড়ি রেখে যায়। কত লোক যায় আসে, কেউ চুরি বা জুয়াচুরি করে না। জল, ফল চুরি হয় না, কড়ি চুরি হয় না। সন্ধ্যের

দিকে যার জিনিস সে ফিরে এল', হিসেব ক'রে দেখ্‌লে যে জল এতটা নেই, তার দরুন এত কড়ি র'য়েছে, না'রকেল আর কলা এতগুলি নেই, তার জায়গায় এত কড়ি; হিসেব বুঝে বাকী জিনিস আর বিক্রীর কড়ি নিয়ে, খুশী মনে সে ঘরে ফিরে গেল। এই ছিল আমাদের জীবন। অনেক জায়গায় এখনও এই রকমটা-ই আছে। আবার দেখুন, ইউরোপে বিবাহ-ব্যাপারে কোনও বাঁধাবাঁধি নেই। অপরিপক্ক বুদ্ধির যুবক যুবতী,—যেমন পরস্পর প্রেমে পড়া, অমনি খাওয়া-পরার সংস্থান থাক্‌লে আর কিছুর চিন্তা না ক'রেই বা বাছ-বিচার না ক'রেই এদেশে বিয়ে ক'রে বসে—কেউ ভেবেও দেখে না, ভবিষ্যতে যারা আস্‌বে সেই ছেলেপিলেদের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে কি না—এরা ভেবেও দেখে না, কেমন ঘরের মেয়ে আন্‌ছি বা কেমন ধরনের ছেলের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জুড়ে দিচ্ছি। আমরা অসভ্য, কিন্তু এখনও যেখানে-যেখানে আমাদের প্রাচীন সামাজিক জীবন ঠিক আছে, সেখানে বাপ-মা দেখে-শুনে তবে ছেলের বউ আনে, বা মেয়ের বর ঠিক করে। মেয়েকে ছেলের পছন্দ হ'ল, বাপ-মা সেকথা জান্‌লে। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বরপক্ষ থেকে ঘটক পাঠাবার আগে, বরের বাপ পাত্রী-পক্ষ অপরিচিত হ'লে ভিতরে-ভিতরে খবর নিয়ে থাকে, ওরা লোক কেমন, আর পাত্রীর বংশে এই চারটি মহাব্যাধি আগে কারো কখন হয়েছিল কিনা—কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, পাগলামি, আর কোনও কুৎসিত রোগ। মেয়ের পক্ষও তেমনি পাত্রের বংশের সম্বন্ধে এইভাবে খোঁজ নেয়। এ-সব থাকার খবর পাওয়া গেলে, বাপ-মা কখনও ছেলের বা মেয়ের বিয়ে দিত না, বা দেয় না। এখন আপনি বলুন, আমাদের এ-সব প্রথাকে বর্বরতা ব'ল্‌বেন কি?"

মিস্টার মেকলের কাছ থেকে ওদের দেশের চামড়ার আর কাঠের ঢাক বাজিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত যে-ভাবে খবর পাঠানো হয়, তার কথা শুন্‌লুম। পরে এ বিষয়ে আমি কিছু-কিছু প'ড়েছি। বড়ো গুঁড়ি

কাঠের মধ্যকার অংশ বাদ দিয়ে, ফাঁপা মতন ক'রে, এই-সব ঢাক তৈরী হয়। কাঠের হাতুড়ি নিয়ে এই ফাঁপা কাঠের ঢাকে ঘা দিলে, খুব দূর অবধি যায় এমন গম্‌গমে আওয়াজ হয়। এ-ছাড়া চামড়ার ঢাকও আছে। এই ঢাকের নানা রকম বোল আছে, সেই-সব বোলের সাহায্যে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মতন কথাবার্তা চালাতে পারা যায়। রাতে যখন সব নিস্তব্ধ থাকে, তখন-ই এই ঢাকের কাজ ভালো হয়; দিনেও এই ঢাক দিয়ে খবরাখবর নেওয়া চলে। একটা কথা দূরে চালাতে হবে। কোনও জায়গায় ঢাকের আওয়াজ করা হ'ল, বোল শুনে, তিন-চার মাইল দূরে অন্য সব গাঁয়ের লোকে বুঝ্‌লে, এই খবর দেওয়া হ'চ্ছে। তারা আবার সেই সংবাদ নিজেদের ঢাকে ঘা মেরে আরও দূরে চালিয়ে' দিলে। এইভাবে দু-তিন ঘণ্টার ভিতর দুই-একশ' মাইল জুড়ে চারিদিকে খবর গিয়ে প'ড়্‌ল। বিশেষ কোনও ঘটনা উপলক্ষেই এরূপ করা যায়। আবার দুই গ্রামের লোকেরা ঢাক বাজিয়ে'-বাজিয়ে' ৮।১০ মাইল ব্যবধানেও কথা ব'ল্‌তে পারে। এই ঢাকের বাদ্য পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে একটা বিশেষ সাংকেতিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজরা প্রথম-প্রথম জিনিসটা বুঝ্‌ত না, তারা আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত', তাদের গতিবিধি এত শীঘ্র দূর-দূর অঞ্চলের লোকেরা কী ক'রে টের পেত'। এখন এর মূল্য তারা বুঝেছে।

মিস্টার মেকলের সঙ্গে এই রকম নানা আলাপ হ'ত। তার পরে, তাঁর কাছে খবর পেলুম, মোকদ্দমায় সর্দার ওলুব্বার জিত হ'য়েছে —যে-সব জমি ফাঁকি দিয়ে বা ধাপ্পা দিয়ে লেগস্‌-এর ইংরেজ কর্তারা কেড়ে নিয়েছিল আর আরও নিতে অগ্রসর হ'চ্ছিল, তার জন্য তিনি ন্যায্য দাম পাবেন। বলা বাহুল্য, এঁর মোকদ্দমা তদবির করা, আর এঁকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, সব-ই হার্বার্ট মেকলের কৃতিত্ব। সম্রাটের এক লেভি বা দরবারে সর্দার ওলুব্বার নিমন্ত্রণ হয়। হার্বার্ট মেকলে

সাহেবও তাঁর দোভাষী আর সেক্রেটারি হিসেবে, ইংরেজের দেওয়া রূপোর রাজদণ্ড নিয়ে সর্দারের সঙ্গে হাজির ছিলেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ লেগস্ থেকে আগত এই নিগ্রো রাজার সঙ্গে যেমন করমর্দন ক'র্ছেন, ঠিক সেই সময়টিতে এক ফোটো নেওয়া হয়। এই ফোটো বিলেতের সব সচিত্র কাগজে বা'র করা হয়। পরে লেগসে এই ছবি প্রকাশিত হওয়ায়, সর্দারের প্রতিষ্ঠা বেড়ে যায়—খোদ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ওঁর করমর্দন ক'র্ছেন। সর্দারের মোকদ্দমার কাগজপত্র এঁর-ই তদারকে তৈরী হয়। সে-সব কাগজ-পত্র এক প্রস্থ আমাকেও এঁরা দেন। এঁদের সাফল্যে অবশ্য আমি খুব-ই খুশী হই।*

তারপরে আমি প্যারিসে চ'লে আসি। এঁরাও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আর এঁদের কোনও সংবাদ পাইনি।

* * *

আর একটি পরিচিত নিগ্রোর কথা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ ক'র্বো। ছোটো বা বড়ো ছুটি হ'লে, আমাদের ছাত্রাবাসের ইংরেজ ছেলেরা যখন বাড়ি যেত', তখন ২।৪।১০ দিনের জন্য তাদের ঘরে বাইরে থেকে ছাত্র বা অন্য শ্রেণীর লোক এসে থাক্ত। এই রকম কী একটা ছুটির সময়ে, সন্ধ্যে সাতটায় সায়মাসের জন্য ভোজনাগারে গিয়ে দেখি, আমার বস্বার জায়গায় পাশেই একটি নিগ্রো ছোকরা ব'সে। এর চেহারা পশ্চিম-আফ্রিকার সুদীর্ঘ নিগ্রোদের থেকে

*পরে ১৯৫৪ সালে আমি যখন পশ্চিম-আফ্রিকা ভ্রমণ-কালে লেগসে যাই, তখন সর্দার ওলুবা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করি। সর্দারের বয়স তখন প্রায় ৮৫ বৎসর হবে, ছেলে ষাটের কোঠায়, তেমনি মজবুত আছেন। আমায় চিন্তে পার্লেন, খুব খুশী হ'লেন। মেকলে সাহেব ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালে দেহরক্ষা করেন। ইনি এখন সমগ্র পশ্চিম-আফ্রিকায় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ব'লে সম্মানিত, আর পূর্ব নাইগিরিয়ার রাষ্ট্রনেতা Azi-Kiwe আজি-কিবে এঁর-ই অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন।

আলাদা। রঙটা একটু তামাটে কালো-কালো হ'লেও, চেহারায় য়োরুবাদের মতো সৌষ্ঠব নেই ; বিশেষ ক'রে এই ছোকরাটি একটু "তুবলা-পাতলা" চেহারার। একটু বেঁটে-খাটো ; তবে চোখ তু'টি উজ্জ্বল আর সদা-চঞ্চল। যথারীতি "গুড ঈভ্‌নিং" ক'রে বসা গেল। খেতে খেতে এই নবাগতের সঙ্গে আলাপ করা গেল। ছোকরা দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে আস্‌ছে, সে হ'চ্ছে জা'তে Zulu জুলু। জুলু-লাণ্ডে বাড়ি। আমেরিকায় সংযুক্ত-রাষ্ট্রে নিগ্রোদের নানা কলেজ আছে, সেই রকম কী একটা কলেজে চার বৎসর ধ'রে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ঘরে ফির্‌ছে, পথে ইংলাণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে। দেশে ফিরে গিয়ে শিক্ষকতা ক'র্‌বে।

ছোকরা বড়ো আমুদে'। তু' দিনেই অপরিচিত সকলের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিলে। আমাদের ছাত্রাবাসে বোধ হয় সপ্তাহখানেক ছিল। রাত্রে খেতে ব'স্‌ত আমার পাশেই। একটু ম্যাজিক করা শিখেছিল। টেবিলের উপরে প্রত্যেকের সামনে যথারীতি একখানা ক'রে প্লেট দেওয়া হ'ত। একদিন করেছে কী, ওর নিজের সামমে যে প্লেট ছিল, সেখানাকে নাচাচ্ছে, কী ক'রে নাচাচ্ছে প্রথমটা ধরা গেল না। ক'রেছে কী, প্লেটের নীচেই টেবিল-ক্লথের তলা দিয়ে একটা ধাতুর চাক্‌তি রেখেছে, চাক্‌তির মাঝে এক ছেঁদার মধ্যে একটা সূতো দিয়ে সেটাকে বেঁধে, টেবিলের নীচে তুই হাঁটু দিয়ে সেই সূতো নাড়িয়ে' চাক্‌তির সাহায্যে প্লেট নাচাচ্ছে। প্লেট ঘুর্‌ছে, চ'ল্‌ছে। দেখে সবাই তাজ্জব মানে। আর ও চেঁচায় "Spook ! Spook ! অর্থাৎ ভূত ভূত।"

জুলু ভাষায় আর দক্ষিণ-আফ্রিকার আরও কতকগুলি ভাষায় Click বা শীৎকার-ধ্বনি কতকগুলি আছে, সেগুলি সাধারণ ব্যঞ্জন-ধ্বনির মতো-ই শব্দ বানাতে ব্যবহৃত হয়। চুমু খাবার সময় যে ধ্বনি করা যায়, তাকে ওষ্ঠ্য শীৎকার বলে ; গাড়ির

ঘোড়া গোরুকে চালাবার সময়ে দাঁতের উপরে একটু পাশে জিভ চেপে যে-আওয়াজ করা যায়, তাকে দন্ত্যমূলীয় শীৎকার বলে ; সাদা জামায় হঠাৎ কালি প'ড়ে গেল—দন্ত্যশীৎকার ক'রে আমরা আমাদের বিরক্তি বা সহানুভূতি জানাই ; ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের টপকের ধ্বনি, ছেলেরা মূর্ধন্য শীৎকার ক'রে জানায়। এই শীৎকার-ধ্বনিগুলি আমাদের ভাষায় লেখা যায় না,—রোমান বর্ণমালায়, ভারতীয় বর্ণমালায়, আরবী বর্ণমালায়, কোনোটাতেই এই-সব শীৎকার-ধ্বনির অক্ষর নেই। কিন্তু "ক, খ, গ, প, ট, ম" প্রভৃতি বর্ণের মতো জুলু প্রভৃতি ভাষায় অর্থযুক্ত শব্দের মধ্যে, শব্দের অন্তর্গত ধ্বনি-রূপে এই সব শীৎকার-ধ্বনি প্রযুক্ত হয়। আমার এই জুলু বন্ধুটি খাবার টেবিলে ব'সে একদিন আমার প্রস্তাব-মতো নিজের মাতৃভাষায় নানা শব্দ আর বাক্য উচ্চারণ ক'রে, ভাষার অন্য সব সাধারণ ধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে শীৎকার-ধ্বনি কি-ভাবে কাজ করে, তা শুনিয়ে' সকলকার তাক লাগিয়ে' দিলে ; ধ্বনি আর উচ্চারণ-তত্ত্বরসিক আমি এই demonstration বা প্রদর্শনে বিশেষ উপকৃত হ'লুম।

ছোকরা নিজের আর নিজের জা'তের কথা সব আমায় ব'ল্‌লে। জুলুরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল, কিন্তু শেষটা ইংরেজের সঙ্গে—ইংরেজের আধুনিক কামান-বন্দুকের সাম্‌নে—ল'ড়ে আর পার্‌লে না। এখন এদের বিষ-দাঁত ভেঙে দেওয়া হ'য়েছে। সর্দারেরা এখন ঘরোয়া ছোটো-খাটো শান্তি রক্ষা করে মাত্র। জুলুদের বিখ্যাত impi ইম্‌পি বা সেনাদল নিয়ে লড়াইয়ে বেরুবার রাজা বা সর্দারদের আর শক্তি নেই। এই ছোকরার বাপ একজন ছোটো-খাটো সর্দার। বাপ স্বয়ং "স্বকৃত-ভঙ্গ" খ্রীষ্টান হ' [illegible] খ্রীষ্টান হবার আগে তার ছয়টি স্ত্রী ছিল—পাদরিদের হুকু [illegible] ত্র একটিকে, ছোকরার মাকে রেখে, আর সবগুলিকে তা [illegible] ছে। খ্রীষ্টান সর্দারের ছেলে, খ্রীষ্টানী লেখা-পড়া খানিকটা [illegible] রে, পাদরিরা ওর বাপকে

বলে, ঢের হ'য়েছে, এইবার ইস্কুল-মাষ্টার কি খ্রীষ্টান জুলুদের মধ্যে গেঁয়ো পাদ্রি, এই-রকম একটা কিছু হ'ক। কিন্তু এর উচ্চ শিক্ষার দিকে ঝোঁক ছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার নিগ্রোদের কোনও উচ্চ-শ্রেণীর ইস্কুল বা কলেজ নেই, আর কেপ-টাউনের বিশ্ববিদ্যালয়ে কালা আদমীদের ঢোকবার অধিকার নেই। অথচ এর লেখাপড়া কর্‌বার খুব ইচ্ছা। বাপেরও পয়সা আছে; তা'ও ঠিক ক'র্‌লে, আমেরিকায় গিয়ে কোনও নিগ্রো প্রতিষ্ঠানে থেকে পড়াশুনো ক'র্‌বে। কিন্তু শ্বেতকায় মিশনারি পাদ্রি আর সরকারি কর্মচারী— সকলের-ই তা'তে আপত্তি। পাদ্রিরা ওর বাপকে ব'লে ব'স্‌ল, তোমার ছেলেকে যদি না ঠেকাও, যদি ওকে আমেরিকা যেতে বারণ না করো, তোমার পক্ষে ভালো হবে না, তোমায় আমরা একঘরে' ক'র্‌বো—কোনও খ্রীষ্টান তোমার সঙ্গে মিশ্‌বে না। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ছোকরা কোনো রকমে পাস-পোর্ট জোগাড় ক'রে আমেরিকায় গিয়ে, আকাঙ্ক্ষা-মতন উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে ফির্‌ছে। এখন তার প্রধান কামনা, কী ক'রে তার জা'তের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার ক'র্‌বে—তাদের এই হীন অবস্থার উন্নতি ক'র্‌বে। আমাকে সহানুভূতিশীল ভারতবাসী দেখে, সে সাহস ক'রে আমায় এ-সব বলে; আর বোধ হয়, আমার কথার ভাবে ভঙ্গীতে আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে, বিশেষতঃ আমার মুখে ইংরেজ ঔপন্যাসিক Rider Haggard থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য লেখকদের বইয়ে বিবৃত জুলুদের আধুনিক ইতিহাসের কথা—রাজা Chaka চাকা, Cetiwayo ৎচেতিরায়ো প্রভৃতির নাম শু[redacted] জুলু-ভাষার দু'চারটে শব্দ (যেমন Inadlovu অর্থাৎ 'হা[redacted]e অর্থাৎ 'নমস্কার') শুনে, দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো জা[redacted]ান্ উন্নতিকামী যুবকদের জীবনে উপলব্ধ এই ধরণের ট্র[redacted]া সে আমাকে খুলে বলে ॥

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩

বিমান-যোগে প্যারিস

শনিবার ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৯।

এবার প্যারিস যাচ্ছি আমেরিকানদের বিমানে, Pan-American World Airways-এর Flying Clipper শ্রেণীর হাওয়াই জাহাজে। গতবার ১৯৪৮ সালে গিয়েছিলুম Air France-এর ফরাসী বিমানে। Pan-American-এর খুব প্রশংসা শুনেছিলুম। সকলেই বলেছিল যে, এদের বিরাট্ বড়ো-বড়ো বিমান, অতি আধুনিক সব বন্দোবস্ত, আরামের চূড়ান্ত, ঠিক সময় মতো গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু গোড়াতেই মনটা দ'মে গেল। আমাকে প্লেনে তুলে দেবার জন্যে স্ত্রী ছেলে-মেয়ে পুত্রবধূ সকলে দম্‌দমে এসেছিল, কিন্তু বিমানের খবর নেই। আত্মীয়েরা, "কখন আসে, কখন আসে" ক'রে হয়রান হ'য়ে, শেষে চ'লে গেলেন। প্লেন আমাদের এল' শেষে আড়াই ঘণ্টা পরে, আর তার এক ঘণ্টা পরে ছাড়্‌ল। এই আমেরিকান বিমান আস্‌ছে হঙ্‌কঙ্‌ আর বাংকক্ হ'য়ে।

বিমান পৌঁছুবার বহু পূর্বেই আমাদের ডাক্তারকে কলেরা ও বসন্তর টীকা নেওয়ার প্রমাণ-পত্র আর পুলিসকে বিদেশে যাবার জন্য ভারত-সরকারের অনুমতি-পত্র দেখানো হ'য়ে গিয়েছে। সরকারী কাজে যাচ্ছি ব'লে দিল্লীর পররাষ্ট্র-বিভাগ থেকে একখানা চিঠি ছিল, সেটা দেখানোতে বাক্স আর ব্যাগ চুঙ্গী-বিভাগ থেকে আর খোলেনি। এই চিঠির দৌলতে আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক একটা ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

আমরা হাওয়াই ষ্টেশনের ধারে যেখানে প্লেন নামে সেই সিমেণ্টে ঢাকা বিরাট্ ময়দানের পাশে অগ্রহায়ণ মাসের ঠাণ্ডায় কান খাড়া

ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি—কখন্ দূরের বিমানের আওয়াজ শোনা যায়, কখন আকাশে বিমানের আলো দৃষ্টিগোচর হয়। পর-পর দু-তিনখানা প্লেন এল', কিন্তু এগুলি পূর্বের যাত্রী; —বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের দিকে যাচ্ছে। অবশেষে বিরাট্ এক প্লেন নাম্‌ল, আমাদেরই প্লেন। প্লেনের পাখার গায়ে আমেরিকান নিশান আঁকা, আমেরিকান Stars and Stripes—চৌকো জমির বাঁ-দিকে উপরের কোণে নীল জমীর মধ্যে চল্লিশটি সাদা তারা, আর বাকী সাদা জমিটাতে লম্বালম্বি লাল ডোরা কাটা, আর মস্ত মস্ত অক্ষরে লেখা P A A। এই জাহাজের যাত্রীরা নেমে এল', হাওয়াই ষ্টেশনের একটা হলে এসে জমা হ'ল। মাত্র দু'-চার জন লোক ক'লকাতায় নাম্‌ল। তাদের একে-একে ভিতরে নিয়ে গেল—ছাড়পত্র দেখ্‌বার জন্যে, ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে, কত খুচরো বিদেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছে তার কৈফিয়ৎ তলব করবার জন্যে; আর তাদের মাল-পত্র বিমান থেকে নিয়ে এক জায়গায় জমা ক'রেছে, সেখানে বাক্স-ব্যাগ খুলে পরীক্ষা করবার জন্যে যে, সঙ্গে কোনও মাশুলযোগ্য জিনিস তারা আন্‌ছে কি না। এত পর্ব ক'রে তবে তারা বাইরে যেতে পার্‌বে। Pan-American Company-র মোটর-বাস বাইরে অপেক্ষা ক'র্‌ছে, তাদের শহরে নিয়ে গিয়ে হোটেলে পোঁছে দেবে।

এদিকে যে-সব যাত্রী নাম্‌বে না, আরও দূরে যাবে, তাদের জন্যে আর ক'লকাতা থেকে যারা উঠ্‌বো সেই আমাদের জন্যে, অতিথি-সৎকারের আয়োজন Pan-American Company-র তরফ থেকে-করা হ'য়েছে। দু'টো টেবিলে প্রচুর পরিমাণে চা, কফি, লেমন-স্কোয়াশ, অরেঞ্জ-স্কোয়াশ্, সামিষ ও নিরামিষ রকমারী স্যাণ্ড্‌উইচ, আর কেক্ মিঠাই সাজানো; খানসামারা যাত্রীদের এনে দিতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা বিমান এল', এটাও চীন দেশ

থেকে শ্যাম হ'য়ে আস্‌ছে, B O A C অর্থাৎ British Overseas Airways Corporation-এর বিমান। এ থেকে গুটিকতক লোক নাম্‌ল, এরাও Pan-American যাত্রীদের দলে ভিড়ে গিয়ে চা কফি ইত্যাদি পেয় ও খাদ্যের সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে লাগ্‌ল। আমেরিকান আর ইউরোপীয় জাতির মানুষের দুর্জয় ক্ষুধা—তাদের বুভুক্ষার তারিফ ক'র্‌তে হয়। সন্ধ্যের সময় সকলেই ভর-পেট ডিনার খেয়েছে, আর এই রাত্রি একটায় প্রায় সকলেই দু'-তিন কাপ ক'রে চা বা কফি আর তার অনুপান স্যাণ্ডউইচ কেক্ যথেষ্ট পরিমাণে চালাতে লাগ্‌ল।

আমাদের এই বিমান ক'লকাতা থেকে সোজা দিল্লী যাবে, দিল্লী থেকে করাচী, করাচী থেকে দামস্কস্, দামস্কস্ থেকে ইস্তাম্বুল, ইস্তাম্বুল থেকে ব্র্যাসেল্‌স্, আর সেখান থেকে লণ্ডন—তার পর আয়র্লাণ্ড হ'য়ে আমেরিকা—এই হ'চ্ছে এর বাঁধা পথ। সময় নির্দেশ ছিল যে, ১০ তারিখে ক'লকাতা থেকে রাত্রি দশটায় বেরিয়ে' মাঝের সব জায়গাগুলি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ১১ই তারিখে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ব্র্যাসেল্‌স্ পৌঁছবে। যারা প্যারিসে যাবে, তাদের রাত্রির মতো ব্র্যাসেলসে একটা ভালো হোটেলে রাখ্‌বে, তার পরের দিন ১২ই তারিখে সকালে প্রাতরাশ খাইয়ে প্যারিস-যাত্রী বেলজিয়ান বিমানে তুলে', সকাল সাড়ে-দশটার মধ্যে প্যারিসে পৌঁছে দেবে। ক'লকাতা থেকে পশ্চিমে যাবার জন্যে বেশী লোক ওঠেনি। বোধ হয় দিল্লী-যাত্রী দু'টি ইয়োরোপীয় ছিল, আর পূর্ব-বাঙলা থেকে করাচী-যাত্রী কতকগুলি পাকিস্তানী মুসলমান ভদ্রলোক। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমার M. A. ক্লাসের সহপাঠী, বাঙলার বিশিষ্ট মুসলমান জননেতা সর্দার তমিজউদ্দীন খাঁ সাহেব। ইনি এখন করাচীতে পাকিস্তান পার্লামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট বা সভা-নেতার কাজ ক'র্‌ছেন। এঁর সঙ্গে ছিলেন সম্ভবতঃ এঁরই এক সেক্রেটারি, এক জন পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোক, আপসে এঁরা

হিন্দুস্থানীতেই কথাবার্তা কইছিলেন। তমিজউদ্দীন সাহেব আর আমি, পুরানো কলেজের বন্ধু পেয়ে আমরা দু'জনেই খুশী হলুম, কলেজ ছাড়্‌বার পর আর তিনি বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী হবার পর মাঝে-মাঝে দেখা হ'য়েছে। তমিজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছি, এমন সময় B O A C বিমানের যাত্রীরা এল'। এদের মধ্যে কতকগুলি লোককে দেখে মনে হ'ল, এরা বোধ হয় রুষ গৃহহারা, শরণার্থী। সোভিয়েট সরকারের দ্বারা বিতাড়িত বহু সহস্র কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শ্বেতপন্থী রুষ এখন চীন-দেশের নানা শহরে ভেসে'-ভেসে' বেড়াচ্ছে, এদের মধ্যে যে যেখানে পারে বিভিন্ন দেশে একটু মাথা গুঁজে থাকবার জায়গা ক'রে নেবার জন্য লালায়িত, তা ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জেই হ'ক আর সিঙ্গাপুরেই হ'ক, মিসরেই হ'ক আর গ্রীসেই হ'ক, ইটালীতে হ'ক আর ফ্রান্সে হ'ক। এই লোকগুলির ময়লা কাপড়-চোপড় আর একটু ভয়-ভয় ভাব দেখে এই ধরণের রুষ ব'লে আমার মনে হ'ল। আমি এদের ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "কি বা নাম, কি বা ধাম, কি বা পরিচয়", আর "কোথায় বা গমন ?" এঁদের এক জন জর্‌মান ভাষায় ব'ল্‌লে যে, এরা ফরাসী জানে না, জাতে এরা জর্‌মান, পেশায় রোমান-কাথলিক মিশনারী, অল্প-অল্প ইংরিজি জানে। দু'-এক কথা জর্‌মান এদের সঙ্গে ব'ল্‌তে এরা ভারী খুশী হ'ল, আর আমায় ব'ল্‌লে যে, দেশে ফির্‌বার আগে এরা এদের তীর্থস্থান রোম হ'য়ে যাবে, এদের বিমানও রোম হ'য়ে তবে ইংলণ্ড পৌঁছুবে। বন্ধুবর তমিজউদ্দীন সাহেব এদের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় তাঁর সহপাঠীকে কথা কইতে দেখে খুব প্রীত হ'লেন।

অবশেষে আমাদের বিমান যাত্রা ক'র্‌লে। এই বিমানের যাত্রীদের মধ্যে লক্ষ্য ক'র্‌লুম একটি ফরাসী মহিলা আর তাঁর সঙ্গে তাঁর তিনটি ছেলে ; এরা ফরাসী আর ইংরিজি দুই-ই ব'ল্‌ছিল। একটি আমেরিকান স্বামি-স্ত্রী ছিল, সঙ্গে দু'টি বাচ্চা, একটি ছোটো,

সবে হাঁটতে শিখ্‌ছে, দু'দিন বিমানের যাত্রীদের সকলেরই কোলে-পিঠে ঘুরেছে। আর একটি আমেরিকান ভদ্রলোক নিজে আলাপ ক'র্‌লেন, ভারতবর্ষে খুব যাওয়া-আসা আছে, পাটের কারবার করেন, কোথাকার যেন চটকলের মালিক।

রাত্রে বিমানে চ'ড়ে কোনও রকম ক'রে চোখ-কান বুজে বাকী রাত্রিটুকু কাটাবার চেষ্টা করা গেল। বিমানটিতে জন পঁয়তাল্লিশ যাত্রীর বস্‌বার জায়গা আছে। চেয়ারগুলিকে তাদের হাতার কাছে একটা কল টিপে' একটু এলিয়ে নিতে পারা যায়। কতকটা আরাম-কেদারার মতন হয়, এইতেই পারো তো ঘুমাও। খালি যে-সব বিমান ইংলাণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে যাওয়া-আসা করে, সেইগুলিতে পা ছড়িয়ে শোবার মতো বিছানার ব্যবস্থা আছে।

মাঝ-রাত্রে দিল্লী পৌঁছুবার কথা। কিন্তু পৌঁছুলো ভোরের দিকে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা, ভীষণ শীত, তার মধ্যে নাম্‌তে হ'ল। হাওয়াই জাহাজের সফরের সাধারণ নিয়ম এই, যেখানে-যেখানে জাহাজ থাম্‌বে, সেখানে-সেখানে সব যাত্রীকেই নাম্‌তে হবে, জাহাজের ভিতরটা সাফ করে আর তেল ভরে, কল-কব্জা সব ভালো ক'রে দেখে নেয়। কেউ যে ঘুমোবেন তার যো নেই, সকলকেই নেমে আস্‌তে হবে। ভোর চারটের দিকে দিল্লী থেকে বেরিয়ে' আকাশে ওঠ্‌বার পরেই প্রত্যেক যাত্রীকে গরম-গরম কফি আব স্যাণ্ডুউইচ খেতে দিলে।

কোথায় ভোর চারটেয় করাচী পৌঁছুবো, পৌঁছুলুম আটটায়। করাচীতে তমিজউদ্দীন সাহেব আর তাঁর সঙ্গীরা নেমে গেলেন, অন্য যাত্রীরা উঠ্‌লো।

এইবারে আমাদের এই জাহাজের ভিতরের বিধি-ব্যবস্থা একটু বলা যাক্। বিমানের দেহটি একটি লম্বা নৌকোর মতো বা মাছের

মতো ; মাছের পাখ্‌নার মতো দু'পাশে বিরাট্‌ অ্যালুমিনিয়ামের চারখানা-চারখানা—আটখানা পতর, এইগুলির উপর ভর দিয়েই যেন বিমান হাওয়ার মধ্য দিয়ে ভেসে যায়। পতরগুলির সামনে চারখানা-চারখানা—আটখানা পাখা। বিমানের মাথায় তার যন্ত্রপাঁতি। সেইখানে চালক, যান্ত্রিক আর বেতার মিস্ত্রি—এরা বসে। যাত্রীদের কিছু মাল বাক্স-টাক্স উপরে জাহাজের খোলের ভিতরেই রাখে ; কিন্তু বেশীর ভাগ রাখে জাহাজের পেটের তলায় একটা লম্বা ঘরের মতন জায়গায়। জাহাজের খোলের ভিতরে, মাঝখানটায় একটা সরু পথ, আর তার দু'ধারে সারি ক'রে আঁটা যাত্রীদের বস্‌বার চেয়ার, দু'খানা-দু'খানা ক'রে পাশাপাশি, জন পঁয়তাল্লিশ লোকের জন্য জায়গা। জাহাজের লেজের দিকে বাঁ ধারে বাইরে যাবার দরজা, মাটি থেকে সিঁড়ি দিয়ে এই দরজায় উঠ্‌তে হয়। যাত্রীরা সকলে ভিতরে এলে, এই দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। জাহাজের সব পিছনে খাবার জিনিসের ভাঁড়ার, খাবার সাজাবার জন্য একটু জায়গা, ওভারকোট রাখ্‌বার জায়গা, আর সব পিছনে দু'ধারে মেয়ে ও পুরুষদের জন্য হাত-মুখ ধোবার আলাদা আলাদা শৌচাগার। জাহাজের তলায় থাকে চাকা, মাটিতে চল্‌বার জন্য। উঁচুতে উঠ্‌লে সেই চাকা গুটিয়ে নেওয়া যায়, আবার ডাঙায় নাম্‌বার সময় নামানো যায়, চালক ব'সে ব'সে কল টিপে ইচ্ছা-মতো এই চাকা নামায় বা ওঠায়। জাহাজের ভিতরে যারা জানালার ধারে বসে, তারা আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে নীচে মাটি, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, নদী-জলাশয়, শহর, রাস্তা, সমুদ্র কিছু-কিছু দেখ্‌তে পায় ; তাও আবার সব বস্‌বার জায়গা থেকে নয়, কারণ অ্যালুমিনিয়ামের বিরাট্‌ ডানাগুলো বেশীর ভাগ ঢেকে দেয়। একটু মেঘ হ'লে তো কিছু-ই দেখা যায় না। প্রত্যেক জোড়া-জোড়া চেয়ারের মাথার কাছে দুটি ক'রে ছোটো বিদ্যুতের আলো থাকে, সেই আলো বই হাতে ক'রে পড়্‌বার

সময় ঠিক বইয়ের উপরে পড়ে, ইচ্ছা-মতো সুইচ টিপে' এই আলো জ্বালানো বা নিবানো যায়। আলোর পাশেই একটি ক'রে ঘণ্টার সুইচ থাকে, যাত্রীদের কিছু দরকার হ'লে জাহাজের মেয়ে বা পুরুষ খান্‌সামা আওয়াজ শুনে কোন্ নম্বরের চেয়ার থেকে ঘণ্টা বাজানো হ'য়েছে, তা দেখে, যাত্রীর সেবার জন্য আসে। আর একটা ছোটো রন্ধ্রপথ যাত্রীদের মাথার উপর থাকে, দরকার হ'লে তা দিয়ে বাইয়ের হাওয়া ভিতরে অল্প-স্বল্প বহানো যায়। জাহাজে যদি কোনও বিপদ্-আপদ্ হয়, তার জন্য কতগুলি ব্যবস্থা আছে। যেমন, আগুন নিবাবার সরঞ্জাম, নাম্‌বার সিঁড়ি, বিপদ ঘ'ট্‌লে বেরুবার দরজা আর নাম্‌বার দোড়ি। সমুদ্রের মধ্যে দুর্ঘটনা হ'লে রবারের ভেলা—যাতে কুড়ি জন লোক আশ্রয় পেতে পারে, এই সব। তবে আকাশ-পথে কলকব্জা বিগ্‌ড়ে কিছু বিপদ্ হ'লে রক্ষা পাওয়া কঠিন। জাহাজে যাত্রীদের পরিচর্য্যার জন্য দু'জন লোক থাকে—এক জন পুরুষ, তাকে বলে Steward; আর-এক জন মেয়ে, তাকে বলে Air Hostess. এরা যাত্রীদের বালিস-কম্বল গুছিয়ে' দেয়, খাবার-দাবার দেয়, মাঝে-মাঝে জল আর মুখশুদ্ধি chewing gum, চকোলেট, লজেঞ্চুস্ প্রভৃতি দেয়। প্রত্যেক যাত্রীর সামনে, তার সামনেকার চেয়ারের পিছনে, একটা থ'লে থাকে। তাতে পুরু বাদামী রংয়ের কাগজের একটা ক'রে ঠোঙা থাকে, উঁচুতে উঠে গা গুলালে যারা বমি ক'রে ফেলে তারা এই ঠোঙা ব্যবহার করে, Air Hostess পরে সেই ঠোঙা নিয়ে যায়। জাহাজ চল্‌বার সময়ে ইঞ্জিনের খুব আওয়াজ হয়। অনেকে সে আওয়াজ সহ্য ক'র্‌তে পারে না, তাদের জন্য একটু ক'রে তূলো দিয়ে যায়, সেই তূলো দু'কানে গুঁজে' তারা আরাম পায়। অনেকেই কিন্তু এই তূলো ব্যবহার করে না, আমিও কখনও করিনি। তা'তে কিছু-ই অসুবিধা হয় না, পিছনে ইঞ্জিনের আওয়াজ সত্ত্বেও পাশের লোকের সঙ্গে সহজ-ভাবে কথা-বার্তা করা চলে। জাহাজ

ছাড়্‌বার পূর্বেই যাত্রীদের সামনে যন্ত্রপাঁতির কামরায় ঢোক্‌বার দরজার মাথায় আলোর অক্ষরে লেখা জ্ব'লে ওঠে—Fasten Seat Belts আর No Smoking. প্রত্যেক চেয়ারে পিতলের বগলসওয়ালা ক্যামবিশের কোমরবন্ধের মতো থাকে, সেইটে পেটের মাঝখানে আট্‌কে দিয়ে বসে। উদ্দেশ্য—কেউ না কোনও কারণে চেয়ার থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে যায়। এই রকম দুর্ঘটনা অবশ্য হয় না। জাহাজেব সব ইস্তাহার বিজ্ঞাপনী প্রভৃতি ইংরিজিতে। আমেরিকার দৌলতে এখন ইংরিজি ভাষার জয়জয়কার সর্বত্র। ফরাসীদের বিমানেও দেখেছি, সব কিছু ইংরিজি ও ফরাসী এই দুই ভাষায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফরাসীদের-ও এখন ইংরিজিকে মান্‌তে হ'চ্ছে।

যাত্রীদের সব বিষয়ে ওয়াকিফ-হাল ক'রে রাখবার জন্য অনেক ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেককে বিমানখানির গঠন আর তার চালাবার রীতির সম্বন্ধে ছবিওয়ালা বই দেওয়া হয়। মাঝে-মাঝে জাহাজের চালক ছাপা রিপোর্টের ফর্মে হাতে লিখে রিপোর্ট যাত্রীদের দেখ্‌বার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই রকম একটা রিপোর্টের নমুনা দিচ্ছি :—

Aboard the Clipper "Hotspur."

Date, Dec. 11, 1949. Time, Damascus 05.40, London 03.40. Our position is over Cyprus Island. We will arrive at Rome, Italy, in approximately 5 hours 50 minutes. We are flying at an altitude of 14500 feet. Our Air Speed is 265 miles per hour, with a Head Wind of 25 miles per hour, resulting in a ground speed of 240 miles per hour. Temperature outside the cabin is 22 degrees Fahrenheit—7 degrees Centigrade. Approximate temperature on the ground at Rome is 47 degrees Fahrenheit, 10 degrees Centi-

grade. Next point of interest is Athens, Greece. It will be in sight within 2 hours 30 minutes. Remarks: we will land in Rome to refuel. The time on the ground will be one hour and thirty minutes.

যাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য নানা রকমের আমেরিকান সচিত্র পত্র ও পত্রিকা ও ইংরিজি খবরের কাগজ থাকে। দরকার মনে ক'র্লে, Air Hostess-এর কাছ থেকে যাত্রীরা খেলার জিনিস চেয়ে নিতে পারে—Dominoes, Backgammon, Checkers, পাশা, তাস প্রভৃতি। চিঠি লেখ্বার কাগজও পাওয়া যায় বিনামূল্যে। প্রচুর পরিমাণে হাত-মুখ মুছ্বার নরম কাগজের রুমাল, ইলেট্রিক ক্ষুর, আইস-ব্যাগ, সেলাইয়ের সরঞ্জাম, ডাক্তারী সরঞ্জাম, এ-সব তৈয়ারী থাকে।

বিমানে চার বার ক'রে খেতে দেয়, আবার কখনও-কখনও খাবার সময় বিমান মাটিতে নাম্লে হাওয়াই জাহাজের বন্দরে রেস্তোরাঁতে খাবার ব্যবস্থা করে। সকালে সাড়ে আটটা-নয়টায় প্রাতরাশ দেয়, বারোটা-একটায় মধ্যাহ্ন-ভোজন, বিকাল পাঁচটায় বৈকালী চা, আর সন্ধ্যা সাতটা-আটটায় সায়মাশ। একটি ক'রে Plastic-এর চৌকা ট্রের উপরে পাতলা পিজবোর্ডের বা প্লাস্টিকের বাটিতে আর চৌকো থালায় খাবার জিনিস সাজানো থাকে। ট্রে-টি কোলের উপরে রেখে খেতে হয়। টিস্থ-পেপারে মোড়া ছুরি-কাঁটা, ছোট্ট-ছোট্ট পিজবোর্ডের কৌটায় নুন, মরিচ-গুঁড়ো, কাগজের বন্ধ প্যাকেটে চিনি, পাতলা পিজবোর্ডের গেলাসে গরম চা বা কফি, ফলের রস। সকালে প্রাতরাশ দেয় আমেরিকান কায়দায়—এতে থাকে বাতাবী লেবু বা কমলালেবু বা টমাটোর রস এক গ্লাস, দু'-চারটে ফল, টোস্ট, মাখন, কেক্ এক টুক্রো, ডিম বা সসেজ বা মাছ, আর চা বা কফি, আর ক্রীম। দুপুরে একটা মাংস, নানান রকমের সব্জী, রুটি, মাখন,

পনীর প্রভৃতি। রাত্রেও ঐ রকম। Pan-American Company-র জাহাজে দেখ্‌লুম, Air Hostess ভারতীয় যাত্রীদের জিজ্ঞাসা ক'রে গেল, তারা নিরামিষাশী কি না। নিরামিষ খাবো ব'ল্‌তে, আমাদের মাংসের বদলে নানা রকমের সবজীর পূর দেওয়া একটা বড়ো আলুর চপ আর কিছু কড়াইসুঁটি সিদ্ধ দিলে। গতবার ফরাসী বিমানে এই ধরণেরই খাবার দিয়েছিল, সেবার খারাপ লাগেনি। কিন্তু এবার এই বিমানের খাদ্য কেমন ভালো লাগ্‌ল না। বেশীর ভাগ জিনিস-ই টিন থেকে বার করা, আর বরফের বাক্সে রাখা। চা কফি মাংস প্রভৃতি যে-সব জিনিস গরম-গরম খায়, সেগুলি বিমানের মধ্যেই গরম ক'রে দেয়। কতকগুলি জিনিসে যেন কেমন গন্ধ লাগ্‌ল, মনে হ'ল যেন এগুলির খাদ্যপ্রাণ নেই। ডাঙায় নেমে যখন-ই খেয়েছি, এই যাত্রাকালে, সে খাবার বরাবর-ই ভালো লেগেছে।

বিমান-যাত্রার একমাত্র বড়ো কথা, দু'দিনে কুড়ি দিনের পথ আমরা যেতে পারি। এই সময়-বাঁচানো ছাড়া আর কোনও আনন্দ এতে নেই। বিমানের খোলের ভিতরে হাত-পা ছড়িয়ে' চ'লে বেড়াবার জো নেই। শৌচাদি অতি সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে কোনও রকমে সেরে নিতে হয়। অনেক ঘণ্টা ধ'রে যেন অষ্টাবক্র হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে হয়। বাইরের প্রায় কিছু-ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বড্ড একঘেয়ে লাগে। এর উপরে প্রাণের ভয় সর্বক্ষণ বিদ্যমান, সে-রকম ভয় স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণে নেই। লোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারে, কী সুখে লোকে বিমান-ভ্রমণ করে? সুখ নেই— আছে কাজের তাগিদ, "সাড়ে সতেরো মিনিট মাত্র র'য়েছে সময়,"— এর-ই মধ্যে আধুনিক ব্যস্তবাগীশ মানুষকে হিল্লী-দিল্লী-মক্কা, সাত সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে' কাজ চুকিয়ে আস্‌তে হবে। আমাদের সত্যযুগের সুপ্রশস্ত দিনগুলি আর ফিরে আস্‌বে না, যখন আমরা

ধীরে-সুস্থে নানা জিনিস দেখে-শুনে, বিশ্রাম ক'রে ভ্রমণের আনন্দ পেতুম। এই জন্য, এই বার-কয়েকের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে আবার জলপথে ষ্টীমারে ক'রে বেড়াবার বড্ড ইচ্ছে হয়—দু'দিনের আড়ষ্ট অষ্ট-বন্ধনের মধ্যে বেড়ানোর জায়গায় কুড়ি দিনের মুক্ত অবারিত ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সময়টুকু আর আসে কোথা থেকে ?

এইবার সহযাত্রীদের দু'-এক জনের কথা আর আমাদের যাত্রার সমাপ্তির কথা একটু ব'ল্‌বো। ক'লকাতা থেকে এক জন ভারতীয় যাত্রী পথের সাথী ছিলেন—একটি পাঞ্জাবী হিন্দু যুবক, আমেরিকার সঙ্গে রপ্তানি-আমদানীর ব্যবসায় আছে, তার বাপ তাকে বিমানে তুলে দিতে এসেছিলেন, পাঞ্জাব থেকে আগত শরণার্থী—মুসলমান-দের উপরে আর গান্ধী-বাদের উপরে ভীষণ আক্রোশ। ব্রুসেলস্‌-এ এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'ল। দিল্লীতে কতকগুলি করাচী-যাত্রী মুসলমান উঠ্‌ল, আর এক জন আধাবয়সী পাঞ্জাবী হিন্দু। পশ্চিম-পাঞ্জাবের শাহ্‌পুর জেলাতে এর বাড়ি ছিল, বহু বৎসর যাবৎ ভদ্রলোক Cuba ক্যুবা দ্বীপের অধিবাসী, ক্যুবার জাতীয়তা স্বীকার ক'রেছে, সে-দেশেরই একটি স্পেনীয় মেয়েকে বিয়ে ক'রে সেখানেই ঘর-সংসার পেতেছে, মাতৃভূমির সঙ্গে ছেলেবেলাকার টান ছাড়া আর কোনও টান নেই। ভদ্রলোকটির নাম হীরা সিং। লেখা-পড়া জানে ব'লে মনে হ'ল না, হিন্দুস্থানী (মুসলমানী হিন্দী বা উর্দূ) যা ব'ল্‌ছিল তা'তে পাঞ্জাবী টান যথেষ্ট ছিল, ইংরিজিও গেঁয়ো পাঞ্জাবী ধরণের। ও-দেশে আখের ক্ষেতের মালিক, চিনির কারখানায় আখ বিক্রী করে। ভারতবর্ষে আসার দু'টো উদ্দেশ্য ছিল—এক, ভারতে এখন চিনির ঘাট্‌তি ব'লে যদি ক্যুবা থেকে চিনি ভারতে চালান দেবার ব্যবস্থা করা যায় ; আর দ্বিতীয়, আত্মীয়

স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে যাওয়া, স্বদেশ একবার ঘুরে যাওয়া। ব্যবসার কোনও সুবিধা হ'ল না, বিদেশ থেকে ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগ এখন চিনি আস্‌তে দিতে নারাজ। আর স্বদেশ শাহপুরে যাওয়া হ'ল না, দেশ প'ড়ে গিয়েছে পাকিস্তানে, সেখানে গেলে প্রাণের আশঙ্কা; দিল্লীতে আর হোশিয়ারপুরে শরণার্থী গৃহহারা ভাই-বন্ধুদের মধ্যে, যারা পালিয়ে' আসতে পেরেছে, তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে ফির্‌ছে। মনটা বড়োই অপ্রসন্ন, দুঃখিত। একটি পাঞ্জাবী মুসলমান করাচীতে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে কিন্তু বেশ সহজ ভাবে দিলখোলা ভাবে মাতৃভাষা পাঞ্জাবীতে আলাপ ক'র্‌ছিল। হীরা সিং ব'ল্‌লে, তার মতন আরও কয়েক জন পাঞ্জাবী হিন্দু ক্যুবা তে বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হ'য়ে স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে আছে।

করাচীতে কতকগুলি যাত্রী উঠ্‌ল—দু'টি স্থানীয় মুসলমান মেয়ে, আর দু'টি ভদ্রলোক। এঁদের একজন একটি কম-বয়সী পাঞ্জাবী মুসলমান। আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী, অধ্যাপক, অধুনা পাকিস্তান-প্রবাসী শাহেদ সুহ্‌রাবর্দীর কথা এর কাছে শুন্‌লুম। মেয়ে দু'টি আপসে উর্দূতে কথা কইছিলেন, এঁদের এক জন শালওয়ার-পরা, আর এক জন সাড়ি-পরা। সাড়ি-পরা মেয়েটিকে বাঙলা দেশের ব'লে মনে হ'ল, আমার চেয়ারের কাছেই ভদ্রমহিলা ব'সেছিলেন, উর্দূ পত্রিকা প'ড়্‌ছিলেন। আলাপ করা গেল—অনুমান ঠিক, মেয়েটির বাড়ি চট্টগ্রামে, বাঙালী দেখে খুব খুশী, বাঙলাতেই কথা হ'ল—এঁরা দু'জনে যাচ্ছেন ইংলাণ্ডে নার্সিং শিখ্‌তে। সঙ্গে উর্দূ কেতাব ছিল, চেয়ে নিয়ে দেখ্‌লুম—একখানি বই হ'চ্ছে "পাকিস্তান দূসরে সাল মেঁ" অর্থাৎ 'দ্বিতীয় বৎসরে পাকিস্তান'—সব বিষয়ে যে পাকিস্তান উন্নতি ক'রে চ'লেছে তার সচিত্র বিবরণ। ভাষা সাহিত্যের যে অধ্যায়টি আছে, সেটি দেখ্‌লুম, তা'তে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে একটি প্যারাগ্রাফ আছে

—সংস্কৃত শব্দের বদলে পাকিস্তানী বাঙলায় যে আরবী-ফারসী অল্‌ফাজ ঢোকাবার চেষ্টা হ'চ্ছে সে বিষয়ে উল্লেখ আছে।

১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৯, রবিবার।

সকাল ন'টার পরে করাচী থেকে যাত্রা। সারা দিন বিমানের মধ্যে। খানিক বই প'ড়ে, খানিক চেয়ারে হেলান দিয়ে ঢুলে, বিরক্তিকর যাত্রা। সকালে প্রাতরাশ আর দুপুরে লাঞ্চ যথারীতি বিমানেই খাওয়া হ'ল। বিকাল পাঁচটার পরে দামস্কস্‌ নগরে পৌঁছুলুম। হাওয়াই বন্দরের রেস্তোরাঁয় আমাদের বৈকালী চায়ের ব্যবস্থা হ'ল—ভালো ব্যবস্থা। দেশটা আরব-ভাষী সিরীয় জাতির। মানুষগুলি একেবারে ইউরোপীয়দের মতন, মেয়েরাও যাদের হাওয়াই বন্দরে দেখ্‌লুম সব ইউরোপীয় পোশাক-পরা। আরবী ভাষার কর্কশ আইন আর বড়ী হা, স্বাদ্‌ আর দ্বাদ আর ধ্বা বর্ণের ধ্বনি কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। রেস্তোরাঁর লোকেরা ইংরিজি আর ফরাসী দুই-ই ব'ল্‌তে পারে। রেস্তোরাঁর মধ্যে টুকিটাকি জিনিসের দোকান, খেজুর আঞ্জীর প্রভৃতি ফলের পসরা, বোতলে ক'রে মধু বিক্রী ক'র্‌ছে। নানা দেশের মুদ্রা-সংগ্রহের বাতিক আমার আছে, তিন টাকা দিয়ে কতকগুলি সিরীয় মুদ্রা কিন্‌লুম। দেখ্‌লুম—ইংরিজি পাউণ্ড-নোটের চেয়ে ভারতীয় "রুবিয়া"-নোটের চাহিদা বেশী।

দামস্কস্‌ থেকে ইস্তাম্বুল যাবার কথা। দামস্কস্‌ ছেড়ে আমরা চ'ল্‌লুম। বিমানের চালকের পক্ষ থেকে Steward বা খানসামা আমাদের জানিয়ে দিলে, পেট্রোল ভর্‌তির জন্যে ইস্তাম্বুল না গিয়ে আমাদের বিমান রোমের দিকে চ'ল্‌ল। ইস্তাম্বুল-যাত্রী কেউ ছিল না বোধ হয়, আর ইস্তাম্বুল থেকে পশ্চিম-ইউরোপে যাবার লোক এই বিমানের জন্যে বোধ হয় কেউ ছিল না। যা হ'ক্‌, এই

ভাবে নির্দিষ্ট পথ বদ্‌লানোতে আমাদের অনেকের কাছে একটু আশ্চর্য্য লাগ্‌ল।

রাত বারোটায় রোমে পৌঁছুলুম। ঘণ্টা দেড়েক এয়ার-পোর্টে কাটিয়ে আবার বিমানে উঠ্‌তে হ'ল। যাত্রীরা কেউ-কেউ পয়সা দিয়ে রেস্তোরাঁয় কফি বা মদ কিনে খেলে। মণিহারী জিনিসের দোকান ছিল—নানা টুকিটাকি শিল্পময় বস্তুর সমাবেশ—খেলনা-জাতীয়, শস্তার গহনা-পত্র, ঝুটো মুক্তো, চীনেমাটির, ব্রঞ্জের, হাতীর দাঁতের জিনিস। দুই-এক জন শখ ক'রে, সেই অত রাত্রে খুলে-রাখা টাকা-বদ্‌লানোর আপিসে গিয়ে ডলার বা পাউণ্ড ভাঙিয়ে' ইটালিয়ান লিরা ক'রে নিয়ে, ঐ সব জিনিস কিন্‌লেন।

আমরা আল্‌পস্‌ পর্বতের উপর দিয়ে সুইট্‌জরলাণ্ড হ'য়ে গেলুম না—কর্সিকা আর দক্ষিণ-ফ্রান্সের পথ ধ'রে সোজা উত্তরের পথ দিয়ে ভোর সাড়ে-তিনটেয় ব্র্যাসেল্‌স্‌এ পৌঁছুলুম। কোথায় সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটায় ইস্তাম্বুল হ'য়ে পৌঁছুবার কথা! প্যারিস-যাত্রী আমাদের জন কতককে নামিয়ে দিয়ে ঘণ্টা দেড়েক পরে প্লেন চ'লে গেল, লণ্ডনের দিকে। চুঙ্গীতে আমাদের জিনিস-পত্র দেখে, বাক্স খ'লেতে খড়ির দাগ কেটে দিলে। আমাদের বাইরে যাবার হুকুম হ'ল। ঘণ্টা খানেক আমাদের এই-সব নিয়ম পালনে কেটে গেল। তার পরে হাওয়াই বন্দর থেকে আমাদের চার জনকে—দু'জন আমেরিকান আর আমি, আমাদের—SABENA (অর্থাৎ Socie'te' Anonyme Belgique pour la Navigation Aerienne অর্থাৎ বেলজীয় বায়ু-যাত্রা-সঙ্ঘ) প্যারিসে পৌঁছে দেবে। বাকী সময়টুকু কাটাবার জন্য আমাদের হাওয়াই বন্দর থেকে ব্র্যাসেল্‌স্‌ শহরে নিয়ে গেল ওদের বাসে ক'রে। ব্র্যাসেল্‌স্‌-এর এক প্রথম শ্রেণীর হোটেল, Hotel Atalanta-তে সেই ভোরে নিয়ে তুল্‌লে। চারিদিক অন্ধকার, মনে হয় নিষুতি রাত্রি। নির্দিষ্ট ঘরে উঠ্‌লুম। দেখ্‌লুম, ঘুম হবে

না, তখন ভোর প্রায় পাঁচটা। সাতটায় তৈরী হ'য়ে আবার এয়ার-পোর্টের দিকে ছুট্‌তে হবে। PAA কোম্পানির খরচে থাকা, দামী হোটেল, শোবার ঘরের লাগাও তার নিজস্ব স্নানের ঘর। চৌবাচ্চা গরম জলে ভ'রে নিয়ে ছটার মধ্যেই স্নান ক'রে নিলুম। সাতটায় নীচে গিয়ে যখন প্রাতরাশ চুকোলুম, তখন বেশ ঘোর অন্ধকার চারি দিকে। একটা ট্যাক্সি ডেকে শহরের মধ্যে SABENA-র ষ্টেশনে হাজির হ'লুম। তারা আটটায় আমাদের নিয়ে গেল হাওয়াই বন্দরে, শহরের বাইরে কয়েক মাইল দূরে। যথাকালে প্যারিস-গামী বিমানে আরোহণ, দেড়-ঘণ্টা উড়ো পথে গিয়ে সাড়ে-দশটায় প্যারিসের হাওয়াই বন্দর le Bourget-এ পৌঁছলুম।

এই ভাবে ক'লকাতা থেকে পাড়ি দিয়ে প্যারিসে উপস্থিত হওয়া গেল—মাত্র ৩৩ ঘণ্টার মধ্যে॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৬

আমেরিকা-যাত্রা

ইউরোপে বার ছয়েক ঘুরে আস্‌বার সুযোগ হ'য়েছে। ইংলাণ্ড, স্কটলাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস, জর্‌মানি, হঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনলাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, পোলাণ্ড, তুর্কী দেশ—এ সব একটু-আধটু দেখা হ'য়েছে বা ছোঁয়া হ'য়েছে। এবার যোগাযোগে আমেরিকাতে একটু ঘুরে আসা গেল, বহু দিনের পোষিত আশা আংশিক-ভাবে পূর্ণ হ'ল। আমেরিকা-দর্শন সম্ভবপর হ'য়েছিল, আমেরিকান সরকারের উচ্চ-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নোতুন নীতির কল্যাণে আর পেন্‌সিল-ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের (বিশেষ ক'রে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল-অভ-সাউথ-এশিয়া-স্টডীজ-এর অধ্যক্ষ ডাক্তার নরমান ব্রাউন-এর) আগ্রহে ও অনুগ্রহে। পেন্‌সিলভেনিয়া থেকে আমন্ত্রণ এলে, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে পূরা সহযোগিতা ক'রে আমায় ছুটি দেন—এও আমার অভিলাষ পূর্ণ কর্‌বার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ'মাসের মতো অধ্যাপনা কর্‌বার জন্যে আহূত হই। কী কী বিষয়ে ছাত্রদের পড়াতে হবে, আর কী রকমের নানা আলোচনায় আমাকে অংশ গ্রহণ ক'র্‌তে হবে, সে-সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যক্রম আমেরিকা যাত্রার বহু পূর্বেই পত্রযোগে ঠিক ক'রে নিতে হয়। এদের প্রোগ্রাম বা কার্য্যক্রম এরা বেশ ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রে থাকে। আর এদের পাঠক্রম সব বছরেই একটা বাঁধাধরা বা নির্দিষ্ট ব্যাপার থাকে না। বছর-বছর কিছু-কিছু অদল-বদল হয়; অথচ পরীক্ষা সেই এক-ই বি-এ উপাধির জন্য। নিবন্ধ লিখে ডক্টর উপাধি পেতে হ'লে অবশ্য পরীক্ষার্থীর রুচি আর শিক্ষা

অনুসারে বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হ'তে বাধ্য—কিন্তু আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক বছরের জন্য নিয়মিত ধরা-বাঁধা একটা Curriculum বা পাঠক্রম আছে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখ্‌লুম সে রকমটা নয়—অত কড়াকড়ি বাঁধাবাঁধি নেই, আর অধ্যাপকদের হাতে ক্ষমতাও প্রচুর ; তা ছাড়া, ছাত্রে অধ্যাপকে পরিচয়ের সময় আর সুযোগও ঢের বেশী।

Fall Term অর্থাৎ হেমন্ত আর শীত ঋতুর চতুর্মাস, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর আর জানুয়ারী, ১৯৫১-১৯৫২—আমার কার্য্যকাল নির্ধারিত হয়। আমেরিকায় Autumn শব্দের বদলে Fall শব্দটি ব্যবহার করে—শব্দটি আমার কাছে Autumn-এর চেয়ে মিষ্টি লাগে ; শব্দটি ব'ল্‌লেই, হেমন্ত ঋতুতে এ-সব দেশের প্রকৃতির মধ্যেকার সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে—গাছ থেকে পাতা ঝরা। হিন্দীতেও শরৎ আর হেমন্ত ঋতুর জন্য অনুরূপ একটি শব্দ প্রচলিত আছে—"পত্‌-ঝরী" বা পাতা-ঝরা। চার মাস নিয়মিত ক্লাস চ'ল্‌বে, তবে আমাকে হাজির হ'তে হবে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই, আর পূরো সেপ্টেম্বর ধ'রে ব'সে থাক্‌তে হবে ছেলেদের ভর্‌তি হওয়ার অপেক্ষায়। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আবশ্যক-মতো কথা কওয়া, কে কোন্‌ বিষয় নেবে তাদের পরামর্শ দেওয়া, এ-সব হ'চ্ছে বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃস্থানীয় অধ্যাপকদের কাজ ; আর তা ছাড়া, এ সময়ের মধ্যে অধ্যাপকেরা মিলে রুটীন বা দিনচর্য্যা ঠিক ক'রে নেবেন।

এইজন্য, যাতে আমি অগস্ট মাসের শেষাশেষি বা সেপ্টেম্বরের গোড়াগুড়ি পেন্‌সিলভেনিয়া রাজ্যের রাজধানী ফিলাডেল্‌ফিয়াতে পৌঁছুতে পারি, সেইভাবে আমার যাত্রার ব্যবস্থা হয়। ক'লকাতা থেকে ফিলাডেল্‌ফিয়া সারা পথ বিমানযোগে যাত্রা। বলা বাহুল্য, এই যাত্রার খরচ, টিকিটের আর সঙ্গে ক'রে কিছু বইপত্র নিয়ে

যাবার সব ব্যবস্থা, আমেরিকার তরফ থেকেই করা হয়। ১৮ই অগস্ট, শনিবার সকাল নটার দিকে ক'লকাতার দমদম বিমানঘাঁটি থেকে যাত্রা করি। ঐ দিন-ই বেলা দু'টোর কাছাকাছি বোম্বাইয়ে পৌঁছুনো গেল। সেখানে স্বাস্থ্য দেখানো, ছাড়পত্র, চুঙ্গী, বৈকালিক চা-পান প্রভৃতি চুকিয়ে' পাঁচটার পরে সেই প্লেনেই ইউরোপ যাত্রা। রাত্রি বারোটায় মিসরের রাজধানী কাইরো। দেড় ঘণ্টা সেখানে থেকে, পরে বেরিয়ে একটানা এক লম্বা দৌড়ে লণ্ডন পৌঁছানো। আমাদের Air India International-এর বিমান, এইভাবে মাত্র ২৬ ঘণ্টার ভিতরেই আমাদের ক'লকাতা থেকে লণ্ডনে এনে হাজির ক'র্‌লে।

লণ্ডনে ছিলুম ১৯এ থেকে ২৭এ অগস্ট, আটটি রাত্রি মাত্র। ২৭এ লণ্ডন থেকে আমার আমেরিকা যাত্রা হ'ল। BOAC অর্থাৎ British Overseas Airways Corporation (আজ-কালকার কর্মব্যস্ততার যুগে এই রকম সাঁটে বলার পদ্ধতি আপনা-আপনিই সব ক্ষেত্রে এসে গিয়েছে) আমাদের AII (অর্থাৎ Air India International)-এর সঙ্গে একজোটে কাজ করে, তাদের বিমানে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা ভারতবর্ষ থেকেই করা হ'য়েছিল।

লণ্ডনে ২৭এ অগস্ট, সোমবার, যাত্রার পূর্বে লণ্ডনের বিশিষ্ট ভারতীয় অধিবাসী, ব্যবসায়-সূত্রে যিনি বহু বৎসর ধ'রে ইংলাণ্ডে বসবাস ক'র্‌ছেন আর স্থানীয় ভারতবাসীদের সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক সব বিষয়ে যিনি অক্লান্তকর্মা, চট্টগ্রাম থেকে আগত সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ধূর্জটিমোহন চৌধুরী, Irving Gallery নামে শিল্পী, কবি আর লেখকদের একটি ক্লাবের স্বত্বাধিকারী, তিনি আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে চা-পানে আপ্যায়িত ক'র্‌লেন। ধূর্জটিবাবুর এক ভাই ছিলেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পালি ক্লাসে আমার ছাত্র। ১৯৩৫ সালে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে প্রথম আমার

আলাপ-পরিচয় হয়, তখনকার দিনে লণ্ডন-প্রবাসী আমার ছাত্রটির (তাঁর এই ভাইয়ের) মধ্যস্থতায়। তারপর থেকেই নানা জনহিতকর আর সাংস্কৃতিক ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও মিলনের ব্যাপারে, তাঁর উৎসাহ আর পরিশ্রমের, তাঁর সুবুদ্ধির আর কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে আস্‌ছি। সন্ধ্যার দিকে চা খেয়ে, আগত আর দুইটি বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ ক'রে বাসায় এসে মালপত্র নিয়ে BOAC-এ AirTerminal-এ, অর্থাৎ লণ্ডন শহরের মধ্যে অবস্থিত বিমান স্টেশনে সন্ধ্যা সাতটায় এসে হাজির হলুম। যথারীতি মালপত্র ওজন করিয়ে, টিকিট চেক করিয়ে, আমরা হাওয়াই বন্দরের জন্য যাত্রা ক'র্‌লুম। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান—পাসপোর্ট দেখানো, চুঙ্গীতে মালপত্র পাস করানো—আমরা রা'ত সাড়ে-ন'টায় আমাদের বিমানে এসে চ'ড়্‌লুম।

অন্য কতকগুলি ভারতীয় যাত্রী যাচ্ছেন, লণ্ডনের বিমান স্টেশনে আর হাওয়াই-বন্দরে এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ডাক্তার মেহ্‌তা ব'লে একজন পাঞ্জাবী ডাক্তার যাচ্ছেন, তিনি আমেরিকায় কতকগুলি হাঁসপাতালের কাজ দেখ্‌বেন। আর যাচ্ছেন চারজন ভারতীয় বাস্তুকার আর যন্ত্রবিৎ, এঁরা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কানাডায় কতকগুলি পূর্তকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌তে যাচ্ছেন,—নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় নির্মাণ-বিভাগের বা বাস্তু-বিভাগের ডাক্তার গোবর্ধন লাল ব'লে একটি সদালাপী হিন্দুস্থানী বাস্তুবিৎ ছিলেন এঁদের নেতা।

রাত্রি ৯-৩৫-এ বিমান ছাড়্‌ল। মাটি ছেড়ে উপরে উঠে খানিকটা উড়্‌বার পরেই, বিমানের পরিচালকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, সোজা নিউ-ইয়োর্ক আমাদের যাওয়া হবে না। Strong head-winds অর্থাৎ মাথার সামনে খুব প্রচণ্ড হাওয়া বইছে জাহাজের গতির বিপরীত পথ ধ'রে। এই জোর হাওয়ার সঙ্গে

ল'ড়ে, এই হাওয়া ঠেলে যাওয়া কষ্টকর আর বিপজ্জনক দুই-ই বটে। সেই হেতু আমাদের ঘুরে যেতে হবে, লণ্ডন থেকে সোজা নিউ-ইয়োর্ক যাওয়া চ'ল্‌বে না—উত্তর-পশ্চিম-মুখো হ'য়ে, আইস্‌লাণ্ডের রাজধানী Reykjavik রেয়্‌চ্যাভিক-এ প্রথম যেতে হবে, তার পর সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম পথে নিউ-ইয়োর্ক। খবরটা জাহাজের যাত্রীরা যে রকম সহজ-ভাবে নিলে তা'তে মনে হ'ল, এ রকমটা প্রায়-ই হ'য়ে থাকে।

এই বিমানে জন চল্লিশ যাত্রী আমরা যাচ্ছি। বিমানের মাঝখানে সরু পথ, দু'ধারে দু'জন ক'রে পাশাপাশি বস্‌বার চেয়ার। এক জোড়া চেয়ার, আর তার সামনের চেয়ারের মাঝেকার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। আমি ব'সেছিলাম প্লেনের মাথার দিকে অর্থাৎ চালকদের ঘরের কাছে, বাইরের দিককার চেয়ারে। আমার পাশে ছিলেন একটি আমেরিকান মহিলা। আমার মুখে ইংরিজি শুনে তিনি খুব খুশী—তাঁর আশঙ্কা ছিল, বিমান ভর্‌তি, তাঁর পাশে ইংরিজি জানে না এমন এক উজবুক বিদেশীর স্থান হয়-তো হ'য়েছে—আমাকে ইংরিজি-বলিয়ে', ভদ্র, এমন-কি কথায় আলোচনায়, এঁর বর্ণনা-মতন, একজন সুসভ্য জাতির মানুষ জেনে, ইনি বিশেষ নিশ্চিন্ত ভাব দেখালেন। ভারতীয়দের সম্বন্ধে এঁর কোনও ধারণা ছিল না, কখনও কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে মেশ্‌বার সুযোগ হয়নি।

আমরা তো লণ্ডনে এক প্রস্থ বৈকালিক চা খেয়েই এসেছিলুম—জান্‌তুম যে বিমানে খুব ভালো ক'রেই খাওয়ায়। রাত্রি দশটার দিকে যাত্রীদের চমৎকার আট-পদ ডিনার খাওয়ালে। প্রথমটা সকলকে যার যেমন রুচি ৩।৪ রকম মদ পরিবেশন ক'রে গেল। তারপরে যথারীতি প্রত্যেকের চেয়ারের হাতলে, কোলের উপরে টেবিলের মতো যেটা আছে সেটা এঁটে দিয়ে, তাকে এক-এক পদ

ক'রে খাবার দিয়ে যেতে লাগ্‌ল—ইচ্ছা-মতন hors d'oeuvre "অর্-ভ্যভ্র্" বা খিদে চাঙ্গা ক'রে তোল্‌বার জন্য নানা রকম টুকিটাকি খাবার, যথা, সার্ডিন মাছের টুক্‌রো, সিদ্ধ মুরগী-ডিমের চাক্‌তি, মাছের ডিম রুটির টুক্‌রোর উপরে, কচি-কচি ছোটো জা'তের মূলো প্রভৃতি। তারপরে বাটী ক'রে গরম-গরম সূপ, তারপরে মাছ, মাংসের রোস্ট, নানা সব্জী, আর এক রকম মাংস, কেক-জাতীয় মিষ্টান্ন, পনীর, ফল, কফি। আনুষঙ্গিক রুটি, মাখন, আর শ্যাম্পেন মদ তো আছে-ই। ইউরোপে আজকাল আহারটা সাধারণতঃ বেশ সাদা-মাটা হ'য়ে থাকে—তিন পদেই সেরে দেয়—সূপ, মাংস, মিষ্টি, আর উপরন্তু কফি—ব্যস্‌। কিন্তু হাওয়াই জাহাজ কোম্পানিগুলিতে প্রতিযোগিতা থাকার জন্য, খাওয়ানোতে এরা বেশ ঘটা করে; ইউরোপীয় যাত্রীরা-ও অমনি-ই বেশ খোশ-খাইয়ে' হ'য়ে থাকে, তাই এটাও যাত্রীদের আকর্ষণ কর্‌বার একটা জিনিস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

খাওয়া চুকিয়ে অন্তরাত্মা যখন সকলেরই তৃপ্ত, তখন প্রায় সকলেই একটু ঘুমাবার চেষ্টা ক'র্‌লেন। বিমানের যাত্রীদের বস্‌বার জায়গায় আলো নিবিয়ে' দেওয়া হ'ল। এই বিমানে শুয়ে নিদ্রা দেবার ব্যবস্থা কতকগুলি যাত্রীর জন্য আছে, তার জন্য অবশ্য একটু বেশী দামের টিকিট কিন্‌তে হয়। আমার তো সারা রাত ঘুম হ'ল-ই না।—প্রথমটায়, কখন আইস্‌লাণ্ডে নাম্‌বো সেই উৎসাহে; আর তারপরে বস্‌বার জায়গায় হেলান দিয়েও আমার ঘুম হয় না। সেইজন্য পরে আমি লাউঞ্জে গিয়ে একটা জায়গা দখল ক'রে, সেইখানেই ভোরের দিকে ঘণ্টা ২।৩ একটু ঢুলে নিই। সে সময়ে নীচে ঐ লাউঞ্জে নেমে গিয়ে মদ খাবার ভীড় একরকম ছিল-ই না।

রাত একটার দিকে আমরা Reykjavik রেয়্‌চ্যাভিক-এ অবতরণ ক'র্‌লুম। মনে একটা বেশ অদ্ভুত ভাব হ'ল, আনন্দও

হ’ল। যে আইস্‌লাণ্ডের কথা বাচ্ছা বয়স থেকে ভূগোলে প’ড়ে আস্‌ছি, পরে কলেজে পড়্‌বার সময় যে আইস্‌লাণ্ডের প্রাচীন যুগের সাহিত্য এড্ডা আর সাগা (Edda, Saga)-র সঙ্গে ইংরিজি অনুবাদের মাধ্যমে পরিচয় ক’রেছি, আইসলাণ্ডের স্কান্দিনেভিয়া-দেশীয় Viking ভাইকিং বা সাগরবিহারী যোদ্ধাদের আর আয়র্লাণ্ড থেকে আগত খ্রীষ্টান সাধুদের কথা প’ড়ে, দ্বীপটির সম্বন্ধে একটা রোমাণ্টিক কল্পনা ক’রে- এসেছি, আজ স্বশরীরে সেই দ্বীপে এসে উপস্থিত হ’চ্ছি, তার ভূমির উপরে দাঁড়াচ্ছি।

Reykjavik রেয়্‌ক্যাভিক-এর বিমানক্ষেত্রে বিমান নাম্‌ল, আইস্‌লাণ্ডের সরকারী লোক এল’। তারপরে আমাদের নাম্‌তে দিলে। বাইরে খুব-ই ঠাণ্ডা হবে অনুমান ক’রে আমরা ওভারকোট প’রেই নাম্‌লুম—দেখ্‌লুম, যদিও মাসটা ছিল অগস্ট, এই ওভার-কোটের বিশেষ দরকার ছিল। সিঁড়ি বেয়ে নীচে ভুঁয়ে নাম্‌ছি, জোর ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে ব’য়ে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝির্‌ঝিরে বালির ঝাপ্‌টার মতো কী চোখে-মুখে লাগ্‌ল—দেখ্‌লুম, বালি নয়, শুখ্‌নো গুঁড়ো বরফ, এই বরফের ছোটো-খাটো ঝড় বইছে। একটু জোর হ’লে, এই গুঁড়ো-বরফের ঝড়কে blizzard বলে ইংরিজিতে। বিমানঘাটার জমির উপরে এই গুঁড়ো বরফ ছড়ানো আছে, কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে, আর নানা কোণে এসে জমা হ’চ্ছে। মনে হ’ল, এই রকম উড়ে-আসা জমা বরফের গুঁড়ো দরজা-জানালা ভরিয়ে’ দিয়ে বন্ধ ক’রে দেবে। বিমানের সিঁড়ি থেকে, যাত্রীদের ব’সে বিশ্রাম কর্‌বার স্থান পর্য্যন্ত খানিকটা পথ ধ’রে আমাদের যেতে হ’ল। কিরকিরে’ বরফের গুঁড়ো থেকে চোখ-মুখ হাত দিয়ে বাঁচিয়ে’ আমরা পায়ের তলার বরফের গুঁড়ো জুতো দিয়ে মচ্‌মচ ক’রে মাড়িয়ে’ চ’ল্‌লুম। আমাদের মধ্যে কতকগুলি যাত্রী জাহাজের ভিতরেই র’য়ে গেলেন,

ঠাণ্ডায় বেরোতে চাইলেন না, যে যার চেয়ারে (বা বিছানায়) প'ড়ে কম্বল জড়িয়ে' শুয়ে রইলেন। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটি আইসলাণ্ডের মেয়ে এয়ার-হোস্টেস অর্থাৎ বিমানের যাত্রীদের পরিচালিকা শ্রেণীর মেয়ে। মেয়েটি ব্লণ্ড অর্থাৎ নীলচক্ষু, হিরণ্যকেশী, দীর্ঘনাসা, কিন্তু তন্বী, আর দীর্ঘকায় উত্তর-ইউরোপের Nordic-জাতীয় মানুষের তুলনায় নিতান্ত খর্বাকারের—যেন আমাদের দেশের মেয়েদের মতো।

নীচে নেমেই একটা তীক্ষ্ণ আঁশ্‌টে গন্ধ এসে আমাদের সকলকার নাসিকাকে আক্রমণ ক'র্‌লে—যেন ইলিশ মাছের তেলের গন্ধ—নিশ্চয়-ই কোথাও বরফে মাছ জমানো হ'চ্ছে বা মাছের তেল নিষ্কাশন করা হ'চ্ছে। মেয়েটিকে দুই-একটি যাত্রী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"এই মেছো-দুর্গন্ধটা কিসের?" এই দুর্গন্ধ—this nasty fishy smell কথাটা শুনে, মেয়েটি বোধ হয় একটু চ'টে গেল। শুদ্ধ কিন্তু বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় বিদেশীর মুখের ইংরিজিতে সে ব'ল্‌লে—"আপনারা এই গন্ধকে বিশ্রী ব'ল্‌ছেন, কিন্তু আমাদের কাছে এই গন্ধ অত্যন্ত প্রিয়— আমাদের দৈনিক আহারে যে মাছ আমরা খেয়ে থাকি, এ সেই মাছের গন্ধ, আর এই সব মাছের তেল হ'চ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পদ্, এর বিনিময়ে আমরা বাইরের দেশ থেকে আমাদের দরকারী জিনিস সমস্ত আনাই।" বাঙালীর ছেলের কাছে মাছ বা মাছের তেলের গন্ধ ত্যাজ্য বা ঘৃণ্য হ'তে পারে না। আমি তো গোড়া থেকেই, কড হেরিং সার্ডিন হ্যালিবাট তিমি প্রভৃতির দেশে এইরূপ সুবাস যে পাওয়া যেতে পারে, তা ধ'রে নিয়েই আস্‌ছি; আর তার দেশের প্রধান ভৌতিক সম্পদ্, "সাগরের শস্য" এই মাছের সম্বন্ধে এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন বিদেশীর তুচ্ছতার সঙ্গে উল্লেখ মেয়েটির যে ভালো লাগ্‌বে না, তা বুঝ্‌তে পারা যায়।

যাক্—আমরা সেই ছোটো-খাটো বরফের ঝড়ের মধ্য দিয়ে গুঁড়ো বরফে টুপি আর ওভারকোটের কাঁধ-পিঠ ভরিয়ে', হাওয়াই জাহাজের আড্ডার যাত্রীদের অপেক্ষা করার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ ক'র্‌লুম। নীচু একতলা ইমারত, কাঠের তৈরী, মেঝে কাঠের পাটাতনের। অনেকগুলি ঘর। অন্য বিমানক্ষেত্রে যেমন, তেমনি—একটা লম্বা হল-ঘরের একদিকে কাঠের কাউণ্টার, আর তার ওপারে বিভিন্ন বিমান-কোম্পানির আপিস। পোষ্ট-আপিস, তার-ঘর, সব আছে। কিউরিও বা স্থানীয় টুকিটাকি মণিহারী জিনিসের দোকানও একটা আছে। আর আছে একটি বেশ বড়ো ঘর, ১০০।১৫০ লোক সেখানে টেবিলে ব'সে খেতে পারে—যাত্রীদের পান-ভোজনের স্থান। পাশেই রান্না-ঘর, সমস্ত অ্যালুমিনিয়ম আর ইস্পাতের, বিজলীর শক্তিতে পরিচালিত রান্নার সরঞ্জাম—স্টোভ, রাঁধ্‌বার টেবিল, উনুন আর তৈজস-পত্র; সমস্ত মাজা-ঘষা, নোতুন রূপের মতো ঝক্‌ঝক ক'র্‌ছে। শুন্‌লুম, এই হাওয়াই আড্ডা তার সমস্ত সরঞ্জাম সমেত বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকানরা তৈরী ক'রে দিয়েছে। আইস্‌লাণ্ডের মতন ছোট্ট একটি দ্বীপে লোকসংখ্যা দশ লক্ষের চেয়েও কম, এখনকার ক'লকাতার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে না। গরীব দেশ, মাছ-ধরা আর ভেড়া-পোষা এদের প্রধান বৃত্তি, এরা এত সাজানো বিমানক্ষেত্রের বিলাসিতা ক'র্‌লে কী ক'রে? আইস্‌লাণ্ডের মেয়ে গাইডটি আমাদের এখন সেই ভোজনাগারে নিয়ে এসে বসালে। সকলকে কফি খাওয়াবার ব্যবস্থা হ'ল। এ ব্যবস্থা BOAC-এর পয়সায়, আমাদের টিকিটের মধ্যেই ধরা আছে। পরিবেশন কর্‌বার জন্য কতকগুলি আইস্‌লাণ্ডিক মেয়ে এল। চেহারায় নর্ডিক, দু'-একজন বেশ ঢাঙা, প্রায় সকলেরই সোনালী চুল, নীল চোখ। ইংরিজি ব'ল্‌তে পারে প্রায় সকলেই। আমাদের বড়ো-বড়ো বাটী ক'রে গরম-গরম কফি আর রকমারী ফরাসী কেক দিয়ে গেল।

গল্প ক'র্‌তে-ক'র্‌তে খাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, বিদ্যুতের শক্তিতে সমস্ত বাড়িটার ভিতর বেশ সুখোষ্ণ ক'রে রেখেছে। ভিতরে এসেই ওভারকোট খুলে ব'স্‌তে হ'ল।

জনকতক আমেরিকান যাত্রী কিউরিও-র দোকান থেকে ছবিওয়ালা পোস্ট-কার্ড কিনে ডাক-ঘরে গিয়ে আইস্‌লাণ্ডের টিকিট লাগিয়ে' বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দের নামে ছেড়ে দিলেন—প্রিয়জন সুদূর আইস্‌লাণ্ডের এই স্মারক-চিহ্ন পেয়ে খুশী হবে। কিউরিও-র দোকানে গিয়ে দেখ্‌লুম, নেবার মতো লোভনীয় কিছু পেলুম না। আইস্‌লাণ্ডের পশম হয় খুব সুন্দর; চমৎকার-ভাবে ট্যান-করা লোমশুদ্ধ অত্যন্ত কোমলস্পর্শ কতকগুলি ভেড়ার চামড়া বিক্রি হ'চ্ছে, আর রকমারী হাতে-বোনা উনী সোয়েটার, মাফলার, ব্লাউজ, টুপী, দস্তানা, মোজা। স্থানীয় শিল্পদ্রব্যের মধ্যে সিন্ধুঘোটকের দাঁতে আর তিমির হাড়ে তৈরী ছোটো-ছোটো শ্বেত-ভালুক মূর্তি। সাধারণতঃ ছবিওয়ালা পোস্ট-কার্ডের পসরা এ-সব জায়গায় খুব থাকে; স্থানীয় দৃশ্য আর দেশের মেয়ে-পুরুষদের ছবি, তাদের বিশিষ্ট পোশাক প'রে—তারও লক্ষণীয় বা গ্রহণযোগ্য কিছু পেলুম না। এদের দেশে বই বা ছবি ছাপা তেমন ভালো নয়, দু'চারখানা আইস্‌লাণ্ডের দৃশ্যের ছবি যা এরা বাইরে থেকে ছাপিয়ে' এনে বিক্রী করে। এই সব কিউরিও-র দোকানে দেশের সংস্কৃতির পরিচায়ক বই দুই-একখানা ক্বচিৎ পাওয়া যায়, এখানে তার কিছু-ই দেখ্‌লুম না; সঙ্গে ক'রে আইস্‌লাণ্ডিক ভাষার নমুনার যে দুই-একটি ছোটো বই আন্‌বো, তাও দেখ্‌লুম না। প্রসঙ্গ-ক্রমে ব'লে রাখি যে, সুইডেন, নরওয়ে আর ডেনমার্ক, এ তিন দেশের ভাষা, আর স্কটলাণ্ডের উত্তরে ফ্যারো্যা দ্বীপপুঞ্জ আর আইস্‌লাণ্ডের ভাষা, এক মূল প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষা থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে আইস্‌লাণ্ডের ভাষা-ই প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটি সব-চেয়ে বেশী বজায়

রেখেছে। ছাত্রাবস্থায় ইংরিজিতে এম-এ পরীক্ষা দেবার সময়ে, ইংরিজি আর জর্‌মানের নিকট-জ্ঞাতি এই প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় লিখিত Edda এড্‌ডা-গ্রন্থ পাঠ ক'রে বেশ আনন্দ পেয়েছিলুম, সেই সূত্রে আইস্‌লাণ্ডিক ভাষার সঙ্গে একটু মুখ-চেনা পরিচয় আছে। এদেশের টাকা-পয়সা পূর্বের থেকে আমার সংগ্রহ করা ছিল, এদের মুদ্রায় লক্ষণীয় কিছু ছবি বা নক্‌শা নেই, যেমন হলাণ্ড, আমেরিকা, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতির টাকায় পাওয়া যায়—দেশের নামটি লেখা—Island—Is land, Is অর্থাৎ Ice বা বরফের দেশ।

আইস্‌লাণ্ড বোধ হয় বছরে ছ'মাস বরফে ঢাকা থাকে। এখানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, যার নাম হচ্ছে geyser। সেগুলি এদেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর একটি বৈশিষ্ট্য। রাজধানী রেয়্‌চ্যাভিক হ'চ্ছে বিমান-ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে। আমাদের কিন্তু এখানে এক ঘণ্টা মাত্র অবস্থান। ক'লকাতায় দমদম হাওয়াই আড্ডায় এক ঘণ্টার জন্য নেমে, রাত দেড়টায় ক'লকাতা ঘুরে আসার মতন, রেয়্‌চ্যাভিক দর্শন অসম্ভব ব্যাপার।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে বিমান-ক্ষেত্রে কাটিয়ে', আমরা আবার আমাদের অপেক্ষমাণ বিমানে এসে উঠ্‌লুম। হাওয়া আর বরফের গুঁড়োর ঝড় তেমনি-ই চ'ল্‌ছে, বিমান-ক্ষেত্র আগের চেয়ে বেশী ভ'রে গিয়েছে। যন্ত্র-পাঁতির সাহায্যে এ-সব আবার সাফ ক'র্‌তে হবে। আমরা যথারীতি আবার যাত্রা ক'র্‌লুম। অপ্রশস্ত স্থানে চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে শুয়ে ঘুম হবে না জেনে, আবার নীচে লাউঞ্জে এসে, একটা খালি সেটি বা দেয়ালে-আঁটা কৌচে একটু পা ছড়িয়ে' আধ-শোয়া হ'য়ে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে' দিলুম।

গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে ভোর হয় বোধ হয় রাত তিনটে সাড়ে তিনটেতে, কিন্তু কাজকর্ম না থাক্‌লে ইউরোপের আর আমেরিকার লোকেরা সাতটা আটটার আগে বিছানা থেকে ওঠে না। হঠাৎ

একটা চট্‌কা ভাঙ্‌তে, পাশের কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দেখি, বাইরে ফরসা হ'য়েছে, আর আকাশের রঙ 'সাদাটে'। কিন্তু চারিদিক যেন রকমারি মেঘে ভরা। আমরা ১৪।১৫ হাজার ফুট উপরে উড়ে চ'ল্‌ছি, কিন্তু চারিদিকে মেঘাকার। উদীয়মান সূর্য্যের রশ্মি সে মেঘমালা ভেদ ক'রে আস্‌তে পার্‌ছে না, কিন্তু নানা রঙের সমারেশ হ'চ্ছে এই সূর্য্যকিরণ আর মেঘের সংঘাতে। কিন্তু এই বর্ণ-সমাবেশের মুখ্য ভূমিকা হ'চ্ছে পাংশু বর্ণ—একটা হাল্‌কা ছাই রঙের, তাকেই আশ্রয় ক'রে অন্য রকমারি হালকা রঙের খেলা। নানা রকমের ফিকে লাল আর অন্য রঙ—গোলাপী, নারাঙ্গী, বাদামী, বেগুনে, নীল। এত বর্ণবৈচিত্র্য কেন, এই প্রশ্ন ক্রমাগত মনে জাগ্‌তে লাগ্‌ল। কেউ তো এখানে আগে এই রঙের খেলা দেখ্‌তে আস্‌ত না, বা দেখ্‌তে পেত' না, অথচ প্রকৃতিদেবী এত উদার উন্মুক্ত হাতে, অকৃপণ-ভাবে এই বর্ণসম্ভার কেন ছড়িয়ে' দিচ্ছেন? আমরা মেঘারণ্যের মধ্য দিয়ে উড়ে চ'লেছি। বিমানের যন্ত্রাবলীর চাপা গর্জন অহরহঃ কর্ণপটহে ধ্বনিত হ'চ্ছে, মাঝে-মাঝে ঢোঁক গিলে কানের অস্বস্তিকে দূর ক'র্‌ছি (বিমান-যাত্রায় এটি সহজেই অভ্যস্ত হ'য়ে যায়)। আবার এ চিন্তাও মাঝে-মাঝে মনে আস্‌ছে যে, যদি হঠাৎ যন্ত্রপাঁতির এক চুল এদিক-ওদিক হ'য়ে বিমানকে অকর্ম্মণ্য ক'রে ফেলে, তাহ'লে আগুনে পুড়ে' মরা আর পরে সলিল-সমাধি—কিন্তু তার জন্য মনে তেমন উদ্বেগ নেই। একটা Fatalism অর্থাৎ ভবিতব্যকে মেনে নেওয়ার ভাব সকলেরই মনে কাজ ক'র্‌ছে।

এইভাবে বেলা হ'ল, অন্য যাত্রীদের নিদ্রাভঙ্গ হ'তে লাগ্‌ল। আমি খুব ভোরেই প্রাতঃকৃত্য আর ক্ষৌরকার্য্য চুকিয়ে' নিয়েছি, সারা দিনের মতো নিশ্চিন্ত। ৪০ জন যাত্রীর জন্য দু'টি গোসল-কামরা—একটি মেয়েদের, অন্যটি পুরুষদের। প্রত্যেকটিতে তিনজন

মাত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনটি বেসিনে হাত-মুখ ধুতে পারে। শৌচাগার একটি ক'রে। একটু দেরীতে উঠ্‌লে, বেশ ভীড় অনুভব করা যায়।

ক্রমে আমরা অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকা মহাদেশের উপরে এসে প'ড়্‌লুম। কানাডা'র নিউ-ফাউণ্ড-লাণ্ড আর নোভা-স্কোশিয়া অঞ্চলের উপর দিয়ে আমাদের পথ। এখানে কানাডার Gander গ্যাণ্ডার ব'লে এক হাওয়াই ঘাঁটি আছে, ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াতে এখানে বিমান প্রায়-ই থামে। আমাদের বিমান কিন্তু সরাসরি নিউ-ইয়োর্কের দিকেই চ'ল্‌ল। নীচে কানাডার ভূমি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে, সব মেঘে ঢাকা। ক্রমে আমরা কানাডা ছাড়িয়ে' আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের উপরে এসে প'ড়্‌লুম। তখন সুদূর নীচে কিছুটা মাটি নজরে এল, সবুজ রঙের মাঠ, আর পাহাড়, আর আমাদের দক্ষিণমুখো বিমানের বাঁ-দিকে সমুদ্র। পরে একটা জায়গায় লম্বা বালির বেলাভূমি, ধারে সমুদ্রের হরিতাভ জলের রেখার মুখে সাদা ফেনায় ভেঙে-পড়া লম্বা ঢেউয়ের গতি বেশ স্পষ্ট হ'ল।

আইস্‌লাণ্ড ঘুরে আসার দরুন আমাদের ঘণ্টা কয়েক দেরী হ'ল। শীগ্‌গির-শীগ্‌গির নাম্‌বার জন্য আমরা একটু অধৈর্য্য হ'চ্ছিলুম। মনে হ'চ্ছিল, খুব লম্বা পাড়ি আমরা দিচ্ছি। অবশেষে আমরা নিউ-ইয়োর্কের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এলুম, সেখানটায় বাড়ি-ঘরের সঙ্গে-সঙ্গে সবুজের খেলাও খুব। লণ্ডন থেকে আমার ঘড়ি বদ্‌লাই নি। দেখি বেলা ২-৩৫ হ'য়েছে। লণ্ডন থেকে আগের রাত্রে ৯-৩৫-এ আমরা মাটি ছেড়ে উপরে উঠেছিলুম—১৭ ঘণ্টা ঠিক লাগ্‌ল। নিউ-ইয়োর্কের সময় কিন্তু সকাল সাড়ে ন'টা।

নিউ-ইয়োর্কে দুটো বিমান-ক্ষেত্র আছে—একটার নাম Idlewild Airport আইড্‌ল্‌ওয়াইল্‌ড্‌ হাওয়াই বন্দর, আর একটি La

Guardia লা-গুআর্দিয়া হাওয়াই বন্দর। প্রথমটি আন্তর্জাতিক বিমানের অবতরণ-কেন্দ্র, আর দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে খাস আমেরিকার মধ্যে যে-সব বিমান চলাচল করে তাদের আড্ডা। আমি যাবো ফিলাডেল্‌ফিয়াতে, নিউ-ইয়োর্ক থেকে ৭০ মাইল আন্দাজ দূর। এটুকুও বিমানে যাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। আমাকে নেমে, প্রথম বিদেশে প্রবেশের সময় প্রথমে যা-কিছু ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়, সেগুলি সেরে নিতে হবে। পাসপোর্ট দেখানো, মালপত্র কাস্টমস্‌-এর হাত থেকে খালাস করানো, আর বিদেশীর উপরে ধার্য্য আট ডলারের poll-tax বা মাথট দেওয়া, এই-সব ক'রে, তবে জাহাজ-ঘাটা থেকে বা'র হবার অনুমতি মিল্‌বে।

এইভাবে নিউ-ইয়োর্কে পৌঁছানো গেল॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৯

আমেরিকায় প্রবাসের কথা

আমার বাসার ঠিক সামনেই ফুট্‌পাথের উপরে একটা বেশ বড়ো ঘন-পত্র plane প্লেন গাছ। তে-তলায় রাস্তার উপরেই আমার ঘর, ঘরে রাস্তার ধারে কাঁচের শার্সীওয়ালা তিনটি জানালা, তার দুটিকে গাছটির ডাল আর পাতায় রাস্তা থেকে যেন আড়াল ক'রে রেখেছে। এই বাড়িটিতে প্রথম ঘর দেখ্‌তে এসে ঘরের সামনে এই গাছটি আমার বড়ো ভালো লেগেছিল—ক'লকাতা শহরে আজীবন বাস, আমরা গাছের কাঙাল। আমার ঘরের আবরু অনেকটা এই গাছেই রক্ষা পেয়েছে। ঘরে ব'সে আমি গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তায় লোকের চলাচল গাড়ির যাতায়াত দেখ্‌তে পাই—অবশ্য এটা গ্রীষ্মকালের কথা, যখন গাছ থাকে পাতায় ঢাকা। জানালার পরদা সব সময়ে টেনে দিতে হয় না। আর একটি জানালার পাশে আমার পড়াশুনা কর্‌বার জায়গা, সেখানটায় গাছের আবরণ নেই, দরকার-মতো সেই জানালার পরদা টেনে দিয়ে ব'সে-ব'সে কাজ করি। বাড়ির সামনে ছোটো রাস্তা, তিন খানা গাড়ি কোনও রকমে পাশাপাশি যেতে পারে। ফুট্‌-পাথ, রাস্তা, ও ধারের ফুট্‌-পাথ, তারপরে খানিক ঘাসে-ভরা অসমতল জমি, এটি হ'চ্ছে একটি গির্জার হাতা। গির্জাটি পাঁশুটে' রঙের পাথরে তৈরী, কোনও প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনা-স্থান। গির্জার প্রধান ফটক বড়ো রাস্তা "চেস্টনাট ষ্ট্রীট"-এর উপরে; এই "চেস্টনাট ষ্ট্রীট-"এর আড়াআড়ি আমাদের বাড়ির সামনেকার রাস্তাটা।

পল্লীটি বিশ্ববিদ্যালয়-অঞ্চলের মধ্যে। এখানে অনেকগুলি বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকে। আমার বাসার দো-তলায় আর তিন-তলায় খান দশেক ঘর আছে—তার প্রায় সবগুলিতেই ছাত্রেরা

থাকে। আমার হয়-তো উচিত ছিল, অধ্যাপক-হিসাবে আরও একটু দামী ঘর ভাড়া নেওয়া, কিন্তু বহুদিন পূর্বে ছাত্র-অবস্থায় লণ্ডনে আর প্যারিসে এই ধরণেরই ঘরে বাস ক'র্‌তুম, তা'তে আমার কোনও অসুবিধা ছিল না। ঘরটি আসবাব-পত্রে বেশ সাজানো-গুছানো। শীতকালে আমেরিকার সব বাড়ির মতো, গরম হাওয়ার নল দিয়ে ঘর গরম রাখবার ব্যবস্থা আছে। তবে স্নানের ঘর আলাদা। ভাড়া নিত' দিন প্রায় এক ডলার ক'রে—সপ্তাহে সাড়ে-ছয় ডলার, আমাদের প্রায় ত্রিশ টাকা, মাসে এই ঘরের জন্যে প্রায় এক শ' কুড়ি টাকা লাগ্‌ত। একটু ভালো ঘর নিলে এর দুগুণ প্রায় প'ড়ে যেত'—তার দরকার মনে করি নি।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তিন বেলাই বাইরে। তা'তে কম ক'রে দিন আরও তিন ডলার—মাসে নব্বুই ডলার—অর্থাৎ প্রায় চার শ' তিরিশ টাকা। এই থাকা আর খাওয়াতেই একজনের পক্ষে প্রায় সাড়ে-পাঁচ শ' টাকা মাসে খরচ। এই জন্যে ভারতীয় ছাত্রেরা অনেকে ঘরে নিজেরা রান্না ক'রে খেয়ে, খরচের অনেক সাশ্রয় করে, কিন্তু তা'তেও বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট ডলারের নীচে হয় না।

গ্রীষ্মকালে এখানে বেশ গরম। বিজলীর পাখার অভাব বেশ অনুভব ক'র্‌তুম। শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা। লণ্ডনের চেয়ে ঢের বেশী গরম গ্রীষ্মের সময়ে, ঢের বেশী ঠাণ্ডা শীতকালে। শীত পড়ার আগে একটু হাওয়ার জন্যে জানালার কাঁচ উঠিয়ে দিয়ে ঘরে থাক্‌তে হ'ত, নইলে ভীষণ গুমোট। রাস্তায় লোকেরা গায়ের কোট খুলে হাতের উপর রেখে পথ হাঁটে। শীতকালে লণ্ডনে ২।৩ দিনের বেশী বরফ পাইনি—শীতের সময়ে এখানে তো বরফ-পড়া লেগেই আছে। নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে তো সপ্তাহে ৩।৪ দিন ক'রে বরফ প'ড়ে রাস্তা ঢেকে যায়। বরফ যখন পড়ে, দেখ্‌তে বেশ, ঝুরো গুঁড়ো বরফ, ওভারকোটের উপরে টুপির উপরে প'ড়্‌লে

ঝেড়ে নিলেই হ'ল, শুখনো বরফের গুঁড়োয় জামা কাপড় ভেজে না, চ'লতে গেলে জুতোর তলায় গুঁড়ো বরফ মুচ্‌-মুচ্‌ ক'রে ওঠে। আবার পড়া বরফ জ'মে উঠ্‌লে যেমন শক্ত হয়, তেমনি পিছল থাকে, আমাদের পা টিপে-টিপে চ'ল্‌তে হয়। সাবধানে পথ চ'ল্‌লেও আমাদের মতো আনাড়ীদের মাঝে-মাঝে পা পিছ্‌লে' বেশ আছাড় খেতে হয়। চারি দিক্‌ পাঁশুটে' মেঘে ঢাকা, শীতকাল, গাছের পাতা পূর্বেই হেমন্ত কালে সব ঝ'রে প'ড়ে গিয়েছে। হেমন্ত কাল Autumn-কে আমেরিকায় Fall বলে; নামটি বেশ মিষ্টি লাগে আমার, পাতা-ঝরার ঋতু, হিন্দীতেও একে বলে "পত-ঝরী"। সেই রকম শীতকালে, ঘরে ব'সে-ব'সে জানালা দিয়ে পেঁজা তূলোর মতো তুষার-বর্ষণ দেখ্‌তে বেশ লাগে। বাইরে হাড়-কাঁপানো শীত, ঘরে কিন্তু আমি গরম হাওয়ার নলে ঘর গরম রাখার প্রক্রিয়ার ফলে আরামেই আছি, অষ্টপ্রহর গায়ে গরম কাপড় রাখার দরকার হয়-ই না। একটা উনী গেঞ্জি আর সাধারণ ঘুমাবার পোষাক প'রে সেই দুর্দান্ত শীতে ঘরের ভিতরে ব'সে বেশ স্বচ্ছন্দে কাটানো যায়। বরফ প'ড়ে যখন চারদিক বেশ ঢেকে গেল, তখন পাড়ার ছোটো-খাটো গলিগুলো থেকে বেরোল' ছেলে-মেয়ের দল। আমাদের পাড়াটায় শ্বেতকায় লোকেদের সঙ্গে ভদ্র নিগ্রো পরিবারও অনেকগুলি আছে, এদের মধ্যে কখনও বিরোধ দেখিনি—নিগ্রো আর শ্বেতকায় ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে হৈ চৈ হট্টগোল ক'রে খেলা-ধূলো করে। গুঁড়ো বরফ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে' নিয়ে হাতে ক'রে টিপে-টিপে তার গোলা পাকিয়ে' পরস্পরকে ছুঁড়ে মারা এদের এক বড়ো আমোদের খেলা।

আমাদের বাড়ির মালিকানী—স্বত্বাধিকারিণী নয়, ইজারাদার—একটি বিধবা মহিলা। বেঁটে মোটা-সোটা আধ-বুড়ী মানুষটি, বেশ

ভদ্র, আর সব বিষয়ে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তার আছে। তার বাড়িতে কয় বছর ধ'রে কতকগুলি ভারতীয় ছাত্র আর ডাক্তার ভাড়াটে' ছিল, তাদের ভদ্র ব্যবহারে বেশ খুশি। ওর ধারণা হ'য়েছে যে, ভারতীয়েরা উঁচু দরের মানুষ। বাড়িয়ালি তার আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নীচের তলায় থাকত। তখন আমরা মাত্র দু'জন ভারতীয় ছিলুম, রেড্ডি ব'লে একটি তেলুগু ছেলে, আর আমি। রেড্ডির বাড়ি হায়দরাবাদ রাজ্যে, সে খাসা হিন্দী ব'লতে পারত। অন্য ঘরগুলিতে কতকগুলি আমেরিকান ছাত্র থাকত, কোনও ঘরে দু'জন, কোনও ঘরে তিন জন। এরা বেশ সজ্জন; সিঁড়িতে বা কোথাও দেখা হ'লেই হেসে "গুড্ মর্নিং" বা "গুড ঈভ্নিং" বলে। একটু অসুবিধা—পাশের ঘরের তিনটি আমেরিকান ছেলে, ঘরে থাক্লেই সারাক্ষণ রেডিয়ো বাজাবেই। কিছু দিন পরে সয়ে' গিয়েছিল। ছাত্র ছাড়া, তে-তলায় একটি ঘরে একটি দম্পতী থাকত, অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী, এরা দু'জনেই বাইরে চাকরি ক'রত—প্রায়-ই এদের দেখা পাওয়া যেত' না। আর এই বাড়ির একটি পূরো ঘর নিয়ে থাকত একজন দিন-মজুর—এক অতি ষণ্ডা-গুণ্ডা-গোছ চেহারার মানুষ, নিজের ঘরে খালি গায়েই থাকত। এক-ই তলার সামনা-সামনি ঘরে থাকায়, তার সঙ্গে সহজেই আমার আলাপ জ'মে ওঠে। লোকটির চেহারা যেমন চোয়াড়ে' চোয়াড়ে', ব্যবহারে কিন্তু একেবারে উল্টো, অতি ভদ্র আর অমায়িক। নিজেই নিজের পরিচয় দিলে—কোনও রেলওয়ে-স্টেশনে রাত একটার পরে তার কাজ—মস্ত ভারী এক বিদ্যুতের cleaner অর্থাৎ মেঝে পরিষ্কার কর্বার যন্ত্র নিয়ে সে গোটা স্টেশন-বাড়িটা পরিষ্কার করে। বলে, এই কাজে তার ৩।৪ ঘণ্টা লেগে যায়; যন্ত্রটি বড্ড ভারী, বেশ হাতের জোর লাগে সেটা চালাতে, সেই জন্যে তার মতন ষণ্ডা লোকের দরকার। মাইনে মন্দ পায় না। সপ্তাহে এক রাত সে ছুটি পায়। বিয়ে-থা করে নি। আরও পরিচয় দিলে,

তার বাপ ছিল ফরাসী, মা ইটালিয়ান, জন্ম আমেরিকাতেই। সাদা-সিধে ভালোমানুষ লোক। এই লোকটি যে কাজ করে, তার জন্য কেউ তাকে অশিক্ষিত শ্রমিক ব'লে অনুকম্পার চোখে দেখে না, সে নিজেও নিজেকে কোনও মতে ছোটো ভাবে না। যে-কোনও কাজে গতর খাটিয়ে' যে সমাজের সেবা করে, আমেরিকায় তার প্রতি নীচু দৃষ্টিতে দেখ্‌বার কথা কেউ চিন্তা-ই ক'র্‌'ত পারে না। আমি এর সঙ্গে যেচে কথা কইতুম, এও আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই দাঁড়িয়ে' দু'দণ্ড আলাপ ক'র্‌ত।

সকালে উঠে—শীতকালে প্রায় সাতটা হ'য়ে যায় উঠ্‌তে—প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে একটু ব্যায়াম করি। তার পরে খানিকটা সময় এমনি কেটে যায়। তার পরে পোশাক প'রে সারা দিনের মতো তৈরী হ'য়ে নিই। যে দিন পড়াবার কাজ থাকে না, বা বাইরে যাবার কোনও তাগিদ থাকে না, সেদিন দুপুর পর্য্যন্ত ঘরেই থাকি। বেলা সাড়ে-আটটার মধ্যে বাড়ির বা'র হ'য়ে যাই প্রাতরাশ খেতে। যেদিন সকালে বা'র হবো না ঠিক ক'রে থাকি, প্রাতরাশের জন্য তার আগের রাতে কিছু স্যাণ্ড্‌উইচ, রুটি, সার্ডিন মাছ, কেক, ফল, বাদাম প্রভৃতি এনে রেখে দিই, সকালে ঘরে ব'সে তা খেয়ে প্রাতরাশ সেরে নিই। চা কফি প্রভৃতির অভ্যাস আমার নেই। সপ্তাহে মাত্র একদিন ক'রে আমার ক্লাস, সোমবারে, সকাল নটা থেকে এগারোটা, আর বিকাল তিনটে থেকে পাঁচটা। এ-ছাড়া, নিয়ম ক'রে পড়ানোর অন্য কোনও কাজ নেই, হপ্তায় এই যা চার ঘণ্টা। তবে সপ্তাহে আর ঘণ্টা তিন-চারেক, দেড় ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টা ধ'রে আমাকে উপস্থিত থাকৃতে হয় দুটো সেমিনার অর্থাৎ আলোচনা-সভায়; একটা—ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক আর্থনীতিক জীবন নিয়ে প্রসঙ্গ ক'র্‌ছেন অর্থনীতির এক অধ্যাপক, তাঁর

আলোচনা-সভা ; আর একটি আলোচনা-সভা প্রাচ্য-বিদ্যা-বিভাগের অধ্যাপক আর গবেষক ছাত্রদের নিয়ে, তা'তে প্রাচীন বাবিলন, মিসর, য়িহুদী-দেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের সাহিত্য নিয়ে, সেই-সেই প্রাচীন ভাষার সাহিত্যের অধ্যাপকেরা প্রসঙ্গ করেন। এই দুই আলোচনা-সভায় উপস্থিত থেকে আমাকেও আলোচনায় যোগ দিতে হয়—আর বিশেষ ক'রে প্রাচ্য-বিদ্যা-বিভাগের সভায় দু'দিন ধ'রে আমাকেও প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ক'র্‌তে হয়। আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল—প্রাচীনতম ভারতীয় অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে, ব্যবহারিক জ্ঞান আর নীতি বিষয়ক সূক্তির বিচার। সারা সপ্তাহে এই আট ঘণ্টা হ'চ্ছে আমার ধরা-বাঁধা নিয়মিত কাজ, বাকি সব সময় পূরাপূরি আমার নিজের। এখানকার অধ্যাপনা-কাজের এই একটি মস্ত সুবিধা।

সোমবার যে দিন সকালে ন'টার মধ্যে তৈরী হ'য়ে ক্লাসে হাজির হবার তাড়া থাকে, সেদিন একটু চট্‌পট্‌ সওয়া-আটটার মধ্যে বা'র হই। বাসা থেকে ইউনিভার্সিটি প্রায় আট মিনিটের পথ। ইউনিভার্সিটি কেবল একখানা বাড়ি নিয়ে নয়, অনেকগুলি বাড়িতে ছড়িয়ে' এর বিভিন্ন বিভাগ। যেখানে আমার ক্লাস হ'ত, সেই স্কুল-অভ-সাউথ-এশিয়া-স্ট্যাডিজ, সেটা বাসার কাছেই। তার থেকে আরও তিন মিনিট লাগ্‌ত ইউনিভার্সিটির ছাত্র আর শিক্ষকদের জন্যে Cafetaria ক্যাফেটেরিয়া বা ভোজনাগারে যেতে। এখানে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন-ভোজন আর সায়মাশের চমৎকার ব্যবস্থা। সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে এই ভোজনালয় চলে, বাইরের রেস্তোরাঁর চেয়ে এখানে সব জিনিসের দাম শস্তা। বাইরে এক বোতল দুধ চৌদ্দ সেণ্ট নেয়, এখানে তা দশ সেণ্টে পাওয়া যায়। পনেরো সেণ্টের জিনিসটা এখানে দশ সেণ্টে মেলে। কিন্তু সব দিন এই শস্তার সুবিধা নিতে পারি না, কারণ কোনও দিন দেরী হ'য়ে যায়—

কোনও দিন দুপুরের-খাওয়া বা রাত্রের-খাওয়া ইউনিভার্সিটি-অঞ্চলের বাইরে অন্যত্র সেরে নিতে হয়। রেস্তোরাঁগুলিতে, কি ইউনিভার্সিটি ক্যাফেটেরিয়ায়, কি বাইরের রেস্তোরাঁয়—খাদ্যদ্রব্য প্রচুর, খাঁটি, আর নানা প্রকারের। পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে আমেরিকায় খাবার জিনিসের যেমন প্রাচুর্য্য আর বৈচিত্র্য, তেমনি এরা খায়ও খুব বেশি ক'রে। দুধ—গরম দুধ খাওয়ার রেওয়াজ নেই, বরফের কলে ঠাণ্ডা-করা দুধ-ই এরা খায়, ফলের রস, তাজা ফল, আইস-ক্রীম—এ-সব প্রচুর পরিমাণে অন্ততঃ দিনে দু'বার আহারের সময়ে খাবে। রেস্তোরাঁর মধ্যে শস্তার Horn and Hardart হর্ন এণ্ড হার্ডার্টের রেস্তোরাঁ আছে শহরের নানা স্থানে—শুখ্‌নো খাবার জিনিস কাঁচের খুপরির ভিতর সাজানো থাকে, কোনও খুপরিতে রুটী, কোথাও কেক, কোথাও বা স্যাণ্ড্‌উইচ ইত্যাদি। নির্দিষ্ট দামের জন্য পাঁচ সেণ্ট বা দশ সেণ্ট-এর মুদ্রা একটি slot বা ছেঁদার মধ্যে ফেলে দিয়ে খুপরির হাতল ঘোরালেই, দরজা খুলে যাবে—জিনিসটি বা'র ক'রে নাও। গরম চা, কফি, ঠাণ্ডা শরবৎ প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন খুপরির ভিতর থেকে নল বেরিয়ে' আছে, পেয়ালা নিয়ে এসে তার তলায় রাখো, দামের জন্য নির্দিষ্ট মুদ্রা ছেঁদার মধ্যে ফেলে দাও, ধোঁয়া উড়্‌ছে এমন গরম পানীয় নল দিয়ে প'ড়ে পেয়ালাটিকে ভর্‌তি ক'রে আপনিই বন্ধ হ'য়ে যাবে। এখানকার self-service অর্থাৎ "নিজেই নিজের খাবার নিয়ে এসো" পদ্ধতি সর্বত্র ক্যাফেটেরিয়া আর শস্তা রেস্তোরাঁয় প্রচলিত্‌। বড়ো-বড়ো খোলা বাক্‌সের ভিতরে ছুরি কাঁটা ছোটো-বড়ো চাম্‌চে র'য়েছে ; পাশে চৌকো প্লাই-উড বা বা শক্ত পিজবোর্ডের চৌকো বড়ো-বড়ো ট্রে বা পরাত ; একখানা ট্রে তুলে নিয়ে, তা'তে ছুরি কাঁটা চাম্‌চে রেখে, চলো লম্বা টেবিলের ধারে, যেখানে সার দিয়ে পাশা-পাশি তরো-বেতরো রকমারি খাবারের পসার র'য়েছে। কোমর-সমান উঁচু টেবিলের লাগোয়া

লোহার-রেলিং-পাতা আর এক টানা টেবিলের উপর ট্রে রেখে, সেটা চালিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে, ব'য়ে নিয়ে যেতে হয় না। খাবারের পসারের লম্বা টেবিলের ও-ধারে পরিবেশকদের ভীড়—এরা মেয়ে পুরুষ, নিগ্রো শ্বেতকায়, সব রকমের মানুষ। কিছু খাবার আবার প্লেটে সাজানোও থাকে। যা ইচ্ছে, প্লেট-সমেত তুলে নাও, ট্রের উপরে রাখো। ভাত (প্রায়-ই মাখন দেওয়া), ভূট্টা সিদ্ধ, ম্যাকারোনি, রকমারি মাংস, সব্জী প্রভৃতি বড়ো-বড়ো চৌকো ধাতুপাত্রে র'য়েছে, ফরমাশ-মতো পরিবেশকেরা হাতা দিয়ে তুলে প্লেটে ক'রে তোমার হাতে ধ'রে দিচ্ছে। আবশ্যক-মতন সূপ, রুটি, মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি ৩।৪।৫ রকমের খাবার, এইভাবে নিয়ে ট্রে ভর্তি ক'রে এনে, পাশেই মেয়ে-কেরানীর টেবিল, সেই টেবিলের ঘুলঘুলির সামনে এলে ;—সে ভিতর থেকে এক নজরেই দেখে নিলে কী কী নিয়েছ, হিসেব জুড়ে ব'ল্‌লে পঞ্চাশ সেণ্ট, কি আশি সেণ্ট, কি এক ডলার পনেরো—তুমি নগদ দাম দিয়ে দিলে, তার পরে ট্রে নিয়ে এসে, বিস্তর টেবিল সাজানো আছে, সেখানে সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে' ট্রে থেকে প্লেটগুলি আর ছুরি কাঁটা চামচ টেবিলে রেখে, খেতে ব'সে গেলে। বরফ-ঠাণ্ডা জলের কল আছে, তার পাশে সাজানো কাঁচের গেলাসের গাদা, জল নিয়ে এলে আবশ্যক-মতন। এই ভাবের ক্যাফেটেরিয়ায় বা "নিজের সেবা নিজে করো" পদ্ধতির রেস্তোরাঁয় বেশ শস্তায় ভালো খাওয়া হয়, আর এর প্রচলনও আমেরিকায় খুব। এতে পরিবেশনকারীকে বখ্‌শিশ দেওয়ার পাট নেই। সাধারণ রেস্তোরাঁও আছে, মেয়ে বা পুরুষ পরিবেশক খাদ্য এনে দেয়, এদের বখ্‌শিশ দিতে হয় বিলের টাকার শতকরা দশ কি বারো—এক ডলার বিলে দশ সেণ্ট, —কি পনেরো সেণ্ট, অথবা বিশ সেণ্ট, একটা ভালো রেস্তোরাঁ হ'লে। সময় আর সুবিধা পেলেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটে-

রিয়াতেই খাই, বা "নিজের সেবা" রেস্তোরাঁয়; কখনো-কখনো ভালো রেস্তোরাঁতেও যাই, রাত্রের ডিনার খাবার জন্যে। সকালে দু'টো ডিম, দু' টুক্‌রো রুটি-মাখন, সঙ্গে কমলালেবুর মারমালেড বা জ্যাম, এক বাটি কফি, এক গেলাস ফলের রস (তা আপেল আনারস পীচ টমেটো আঙুর, অনেক রকমের পাওয়া যায়), হ'ল বা একটু পরিজ বা গজী-সিদ্ধ বা কর্ন-ফ্লেক অর্থাৎ ভুট্টার চিঁড়ে, দুধ চিনি—এই নিয়ে-ই সাধারণতঃ প্রাতরাশ হয়। এতে ক্যাফেটেরিয়াতে পড়ে ৫০।৫৫ সেণ্ট, ইউনিভার্সিটির বাইরে হ'লে ৭০।৭৫। দুপুরের লাঞ্চে সূপ, একটা মাছ বা মাংস, রকমারী সব্‌জী, রুটি মাখন, দুধ মিষ্টি বা ফল বা আইস-ক্রীম, এতে ৮০ সেণ্ট থেকে এক ডলার, বা কখনও এক ডলার দশ সেণ্ট পড়ে। রাত্রের খাওয়াও দুপুরের মতন। ইচ্ছে হ'ল তো বিকালে কোনোদিন একবাটি কফি, অথবা শরবৎ, আর একটু কেক খাওয়া যায়, এতে পনেরো থেকে পঁচিশ সেণ্ট লাগে। শহরে চীনারা খুব শস্তা অথচ মুখরোচক চীনা খাবারের দোকান ক'রেছে, সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই। ফিলাডেল্‌ফিয়াতে ভারতীয় রেস্তোরাঁ নেই, আছে গ্রীক আর ইটালিয়ান। গ্রীক খাবার তুর্কী অর্থাৎ ঈরানী পর্য্যায়ের—ভেড়ার মাংসের নানা মুখরোচক জিনিস এরা করে, বেগুন, পালং শাক, ভাতের পোলাও বা ঘী-ভাত, পায়স, এদের প্রিয় খাদ্য। এ-সব জায়গায় খেতে গেলে দেড় ডলার, দু' ডলার লেগে যায়। আড়াই ডলারের অর্থাৎ আমাদের প্রায় বারো টাকার বেশী খরচ ক'রে ভোজন-বিষয়ে বিলাসিতা কর্‌বার সুযোগ কখনও হয় নি। পেয়ারা, পীচ, আঙুর প্রভৃতি ফল, নানা-জাতীয় বাদাম, কেক, স্যাণ্ডুইচ, টিনের মাছ, চকলেট, fudge 'ফাজ' বা খোয়া ক্ষীর জাতীয় মেঠাই—এ-সব ঘরে মজুত রাখি, শীতকালে যেদিন খুব ঠাণ্ডা ব'লে বাড়ির বা'র হলুম না, সে দিন ঘরে ব'সে এই-সব খেয়েই

চালিয়ে দিই। তবে দিনে অন্ততঃ একবার এ হাড়-কাঁপানো শীতের দেশে রেস্তোরাঁয় গিয়ে গরম-গরম সূপ মাংস প্রভৃতি খেয়ে আসা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রশস্ত মনে হ'ত।

আমার সকালের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় ছিল, "ভারতবর্ষে আর্য্য-ভাষার ইতিহাস।" এই ক্লাসে মাত্র দু'টি ছাত্র—একটি আমেরিকান যুবক, বিশ্বাসী খ্রীষ্টান, তার উদ্দেশ্য—মিশনারি হওয়া। সে আমেরিকান আদিবাসীদের ভাষাগুলির বিশেষ অধ্যয়ন ক'র্‌ছিল, সাধারণ-ভাবে ভাষাতত্ত্ব আয়ত্ত করবার জন্য আমার ক্লাসে এই পাঠটাও নিতে আসে। ভারতীয় ভাষার সম্বন্ধে তার কৌতূহল গৌণ। দ্বিতীয় ছাত্রটি একটি জাপানী যুবক, বৌদ্ধ, জাপানে থেকেই সংস্কৃত বেশ কিছুটা আয়ত্ত ক'রেছে, ভারতীয় ভাষা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে বেশ খানিকটা পরিচয়ও এর হ'য়েছে, এই যুবকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ ক'র্‌ত। বিকালের ক্লাসের বিষয় ছিল, "ভারত, পাকিস্তান ও লঙ্কাদ্বীপে ভাষা আর সমাজ।" এতে ছিল পাঁচটি ছাত্র, তিনটি পুরুষ, দু'টি মেয়ে, মেয়েদের মধ্যে একজন ছিল এক নিগ্রো মেয়ে। ছাত্রদের মধ্যে একজন ভারতীয় দর্শন প'ড়্‌তে চায়, আর দু'জন সাধারণ-ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে চায়। আর ছাত্রীদের মধ্যে অন্যটি আমেরিকান ফৌজের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়েছে, হিন্দী মারাঠীর সঙ্গে পরিচিত; উদ্দেশ্য, ভারতের ধর্ম ও সমাজের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা ক'র্‌বে। নিগ্রো মেয়েটি এমনি সাধারণ-ভাবে ভারতের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ক'র্‌বে ব'লে আমার ক্লাসে আসে। এদের সকলেরই প্রায় এক উদ্দেশ্য—ভারত-সম্বন্ধে এইভাবে একটু 'বিশেষজ্ঞ' হ'য়ে, সংযুক্ত-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-বিভাগে, বা ভারতে এরা যে-সমস্ত প্রচার-বিভাগ খুল্‌ছে, তা'তে গিয়ে চাক্‌রি ক'র্‌বে।

আমার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমি খুব-ই আনন্দে আছি। "অর্থকরী বিদ্যা" এই আদর্শ তো সব জায়গায় আছে। কিন্তু আমার এই ছাত্রেরা বেশ বুদ্ধিমান্, সব জিনিস বোঝ্‌বার শক্তি এদের বেশ আছে, রস-জ্ঞানও আছে, মানব-চরিত্রের জ্ঞানও আছে। এদের পড়িয়ে', এদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে, এদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, বাস্তবিক-ই আনন্দ আছে। ঘণ্টা দেড়েক বা সওয়া-ঘণ্টা কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে আমার বক্তব্য আমি ব'লে যাই। তার পরে চলে প্রশ্নোত্তর, আধ-ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে। একটা বেশ হৃদ্যতা এদের সঙ্গে গ'ড়ে উঠেছে। এইটে মনে ক'রে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করি, এরা আমাকে যে কেবল শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে তা নয়—একটু ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক-ও এদের সঙ্গে আমার হ'য়েছে। কেউ একখানি ছবি উপহার দিলে, কেউ একখানি বই, এ থেকে এদের ভালোবাসার ভাব বোঝা যায়। প্রতিদানে আমিও দুই-একখানা বই দিয়েছি—গীতার অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের কোনও বই।

পড়ানোর কাজ, আর সেমিনার বা আলোচনা-সভায় যোগদান—এতে যে ঘণ্টা আষ্টেক সময় ধরা-বাঁধা রইল, তার বাইরে আমি আমার সমস্ত সময় যা খুশি তা ক'র্‌তে পারি। আমি আমার সময় এই চারটি কাজের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছি—যতদিন ফিলাডেল্‌ফিয়ায় আছি। অবশ্য যখন নিউ-ইয়োর্ক, নিউ-হ্যাভেন, বস্টন আর ওয়াশিংটন, আর ওর-ই মাঝে দশ দিনের জন্যে UNESCO-র আহ্বানে আমেরিকা থেকে প্যারিস ঘুরে আসি—তখনকার কথা আলাদা। আমার এই চারটি কাজ হ'চ্ছে—লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়া, কতকগুলি মিউজিয়মে গিয়ে সংগ্রহ দেখা আর সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা, পথে-ঘাটে স্বেচ্ছায় যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ানো, আর সন্ধ্যেবেলা হ'লে কোনও-

কোনও দিন বন্ধুদের বাড়িতে কিংবা বাসায় গিয়ে সময় কাটানো,—ভারতীয় বন্ধু, আর বিশেষ আমন্ত্রণে আমেরিকান সহকর্মী বন্ধু।

ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে সকলের আগে নাম ক'র্‌তে হয় ডাক্তার উইলিয়ম কেনেথ ভট্ট (Bhatta—এদেশে উচ্চারণ করে "ব্যাটা" বা "বাটা") আর তাঁর আমেরিকান স্ত্রী। ডাক্তার ভট্টর আসল নাম কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য—শান্তিপুরে আদি বাড়ি। বোমা-যুগের বিপ্লবী, দেশে এঁর উপর ফাঁসীর হুকুম হ'য়েছিল। ৪০ বছরের উপর আমেরিকায় আছেন, দেশে ফির্‌লে ইংরেজের হাতে মৃত্যু অবধারিত জেনে আর দেশে ফির্‌তে পারেন নি। এখানে প্রথম হন ইঞ্জিনিয়ার, তার পরে ডাক্তারী পাস ক'রে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, বেশ পসারও হ'য়েছে, টাকাও ক'রেছেন। উইলিয়ম কেনেথ নাম নিলেও তিনি হিন্দু-ই আছেন, নিজের বাড়িতে রোজ খাবার আগে ইংরিজিতে হিঁদুভাবের উপাসনা ক'রে, বা কখনও-কখনও বাঙ্‌লা ধর্ম-সংগীত গেয়ে, আর ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ব'লে ভোজ্য-বস্তু নিবেদন ক'রে খেতে আরম্ভ করেন,—এটা তাঁর গৃহে বহুবার দেখেছি। ডাক্তার ভট্ট আমাকে ঠিক তাঁর ছোটো ভাইয়ের মতন-ই গ্রহণ ক'রেছিলেন। এখানকার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যায় প্রায় ৩৫-৩৮ জন হবে, বাঙালী খুব কম, ২।৪ জনও হবে কি না হবে—বেশীর ভাগ গুজরাটী, মারাঠী, পারসী, সিন্ধী, তেলুগু, কানাড়ী, তামিল, বিহারী, উত্তর-প্রদেশী। এই-সব ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের ডাঃ ভট্ট আর ভট্ট-গৃহিণী নিজেদের ছেলে-মেয়ের মতো দেখেন; প্রাণ দিয়ে ছেলে-মেয়েদের এঁরা যেমন ভালোবাসেন, এরাও তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়ে এঁদের প্রীতির প্রতিদান দিয়ে থাকে। এদের বাড়িতে প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভারতীয় ছাত্রদের জট্‌লা হয়, ৫।৬।৭ জন ছেলেকে প্রায় রোজ-ই এঁরা লুচী দা'ল ভাত তরকারী মাংস মিষ্টি

খাওয়ান। শহর থেকে ২০ মাইল দূরে এঁদের একটি বাড়ি আছে, সপ্তাহে ৪।৬।৮ জন ছেলেমেয়েকে সারাদিনের জন্য সেখানে নিয়ে যান। এটি আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। ডাক্তার ভট্টের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলুম। অদ্ভুত মানুষ তিনি—তাঁর জীবন-বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি তাঁর নিজের মুখে শুনে লিখে এনেছি—তাঁর জীবন-কথা উপন্যাসের মতন লাগে—পরে তা প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

ক'লকাতার সুপরিচিত ডাক্তার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সিদ্ধার্থ একটি আমেরিকান মেয়েকে বিবাহ ক'রে এখানে আছেন। এঁদের একটি শিশু কন্যা। সিদ্ধার্থ ও তাঁর স্ত্রী—চমৎকার মেয়েটি, এক ডাক্তারের কন্যা—এখানে আমার বাসার কাছেই একটি বাড়িতে ফ্ল্যাট নিয়ে যে সংসার পেতেছেন, সেটি এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের আর একটি মিলনের কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এঁদের কাছে ভারতীয় আর আমেরিকান অতিথির অবারিত দ্বার। কতদিন এমন হ'য়েছে, বিকালে একটু গল্প ক'র্‌তে গিয়েছি, সন্ধ্যা হ'ল, এই তরুণ দম্পতীর আগ্রহে আমাকে রাত্রের খাওয়া সেখানেই খেয়ে আস্‌তে হ'ল—খালি আমাকে নয়, অভ্যাগত আরও ২।৪ জনকে—সিদ্ধার্থের স্ত্রী তাড়াতাড়ি ভাত, মাছের ঝোল, নিরামিষ তরকারী প্রভৃতি তৈরী ক'রে অতিথি-সৎকার ক'র্‌লেন। সিদ্ধার্থ একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা শেখান, উপরন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার জন্যে গবেষণার কাজেও নিযুক্ত আছেন।

একটি গুজরাটী ইঞ্জিনিয়ার আছেন, যুবক, এখানে কোন্ কারখানায় চাক্‌রি করেন, নাম নর্মদাশঙ্কর দবে (অর্থাৎ দ্বিবেদ বা দ্বিবেদী, হিন্দিতে "দুবে"), সপরিবারে বাস করেন। এঁর স্ত্রী শ্রীমতী মঙ্গলা বহেন, তিনটি ছেলে মেয়ে—এদের নাম অনিল—বারো বছরের, বিভা—আট বছরের, ভরত—ছয় বছরের। নর্মদাশঙ্কর

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাস-করা। বাঙ্‌লা দেশে কখনও আসেন নি, অথচ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার অসীম অনুরাগী, রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে মেতে আছেন। আমার কাছে এ বড়ো অদ্ভুত লাগ্‌ল। রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সংগীত বোঝ্‌বার জন্যে ঘরে ব'সে চমৎকার বাঙ্‌লা শিখেছেন। বিস্তর রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড এনেছেন, স্ত্রীকেও বাঙ্‌লা গান ঠিক বাঙালীর উচ্চারণ ধ'রে যতটা পারা যায় গাইতে শিখিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রী গলা মিলিয়ে' রেকর্ডের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীত গান, দেখাদেখি বাচ্ছা ছেলে-মেয়েরাও বাপ-মায়ের সঙ্গে যোগ দেয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হ'য়েছিল জেনে, এঁরা তো দু' হাত বাড়িয়ে' আমাকে এঁদের পরিবারেরই একজনের মতো ক'রে নিয়েছেন। আমি প্রায়-ই এঁদের বাড়িতে যাই, রেকর্ডে রবীন্দ্র-সংগীত শুনি, এঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প আর আলোচনা করি, এঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত আমেরিকান মেয়ে আর পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মিলে-মিশে মঙ্গলা-বহেনের রান্না এদেশে দুর্লভ ভারতীয় রান্না খেয়ে রসনা পরিতৃপ্ত ও উদর পরিপূর্ণ ক'রে আসি। এঁরা গুজরাটী ব্রাহ্মণ—নিরামিষাশী ; মাখন কিনে এনে ঘরে ঘী তৈরী করেন, ভারতে এখন যা এমন দুর্লভ। শুদ্ধ গব্য-ঘৃতে তৈরী লুচি, দা'ল, নানা প্রকারের "শাক" বা নিরামিষ তরকারী, মোহনভোগ, বেসনের বরফী, লাড্ডু, পেঁড়া আর আচার প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভারতীয় খাদ্য আমেরিকায় ব'সে এঁদের কল্যাণে খাওয়া যাচ্ছে। আর তার উপরে আছে রবীন্দ্র-সংগীত শোনা, রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী ভক্তের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রসঙ্গ করা।

আমেরিকান সহকর্মীদের বাড়িতে আমি নিমন্ত্রিত হ'য়ে কয়েক সন্ধ্যা কাটিয়ে' এসেছি, এঁদের ভদ্রঘরের সামাজিক পারিপার্শ্বিক

তা'তে কিছুটা অনুধাবন ক'র্‌তে পেরেছি। প্রায় সকলেই শহরের বাইরে বাগান গাছপালার মধ্যে সুন্দর ছোটো বাড়িতে থাকেন। সকলের-ই মোটর আছে। ঝী-চাকর তেমন নে-ই, বড়ো জোর একটি ঠিকে ঝী আর রাঁধুনী। খুব শান্তি আর সংস্কৃতি-পূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে এঁরা থাকেন। এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে একটা বেশ ভালো রীতি আছে;—সকলে সপ্তাহে একদিন ক'রে, আমাদের প্রাচ্য-বিদ্যা-বিভাগের আলোচনা শেষ হ'লে, দুপুর সাড়ে-বারোটায়, ইউনিভার্সিটির কাছে একটি ভদ্র রেস্তোরাঁয় গিয়ে একত্র আহার করি—যে যার রুচি-মতো খাবার ছাপানো খাদ্য-তালিকা দেখে বেছে নিই, নিজের নিজের খরচ নিজেই দিই। এই রেস্তোয়াঁয় দেখ্‌লুম, এখানকার চাকর-বাকর বেশ একটু মাখামাখি-ভাবে অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌ত—যেন সমপর্য্যায়ের বন্ধু। আমেরিকায় সব মানুষ সমান, এ বোধ যেন এদের মজ্জাগত হ'য়ে গিয়েছে। কেবল কৃষ্ণাঙ্গদের সম্বন্ধে এ-বোধ এখনও প্রায় সর্ব্বত্র-ই অজ্ঞাত।

লাইব্রেরি, মিউজিয়ম, বড়ো-বড়ো দু'চার জন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ; এ-সব তো আছেই। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, শহরের মাঝখানে প্রবহমান জনস্রোতের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো, বইয়ের দোকানে গিয়ে বই হাঁট্‌কানো (কেউ মানা করে না), আর বিরাট্‌-বিরাট্‌ যে সমস্ত Departmental Stores আছে ত্রিশতলা বাড়ি জুড়ে—আধুনিক জগতে আমেরিকার এই এক অদ্ভুত সৃষ্টি,—সেগুলিতেও ঘোরা। এই পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে আমেরিকার বিরাট্‌ হৃদয়ের একটা স্পন্দন পাই—আর ভালো-মন্দ নিয়ে এই হৃদয়কে, মোটের উপর এর অন্তর্নিহিত মানবিকতার জন্যই, ভালোবাসতেও পার্‌ছি ব'লে মনে হয়॥

বঙ্গাব্দ ১৩৬০

মেক্সিকো-যাত্রা

বহুদিন পূর্বে, ইস্কুলের ছাত্র তখন আমি, মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা আর ঐ দেশের প্রাচীন জাতি সুসভ্য Aztec আস্তেকদের কথা, কি ক'রে Hernan Cortes হের্নান্ কর্তেস্-এর অধীনে মুষ্টিমেয় হিস্পানীয় বা স্পানিশ সেনা বিরাট্ আস্তেক্ সাম্রাজ্য জয় ক'র্‌লে সে ইতিহাস, বিখ্যাত বিটিশ লেখক Andrew Lang আণ্ড্রু লাঙ্ কর্তৃক ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা সুন্দর একখানি সচিত্র পুস্তক প'ড়ে আমি প্রথম জান্‌তে পারি। তার পরে, বিখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক Prescott প্রেস্‌কট্-এর সুপরিচিত বই The Conquest of Mexico পাঠ কর্‌বার সুযোগ হয় কলেজে অধ্যয়ন-কালে। এই দু'খানি বই থেকেই মেক্সিকো দেশের প্রতি আমার মনে একটা আকর্ষণ এসে যায়। মেক্সিকো নানা দিক্ দিয়ে এক অদ্ভুত দেশ ব'লে মনে হয়। প্রথম, এদেশে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা, খ্রীষ্টীয় ষোলোর শতকের বহু পূর্বে, ও-দেশে হিস্পানীয় বিজেতাদের আগমনের সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্বে, এক অতি উচ্চ দরের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল। এই সভ্যতা তার নিজ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে জগতে ছিল অতুলনীয় আর একক। মানব-মনের আর মানব-কৃতিত্বের এক অপূর্ব বিকাশ দেখা যায় এই সভ্যতার মধ্যে। হিস্পানীয় বিজেতারা শক্তির গর্বে আর ধর্মের গোঁড়ামির অন্ধত্বের বশে এই সভ্যতাকে প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবেই বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল। স্থানীয় সুসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে সহস্র-সহস্র ব্যক্তিকে ওরা হত্যা করে, অবশিষ্ট সকলকে প্রায় ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে নামিয়ে দেয়। জোর ক'রে তাদের রোমান-কাথলিক ধর্ম নিতে বাধ্য করে, মন্দির-ইমারত পুঁথি-পত্র শিল্প-দ্রব্য যতদূর সম্ভব ধ্বংস ক'রে দিয়ে, তাদের সভ্যতাকে

নিশ্চিহ্ন কর্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু মেক্সিকোর লোকেদের একেবারে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেল্‌তে পারে নি। তারা এখনও তাদের অটুট প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে র'য়েছে। মেক্সিকোর প্রাচীন স্থাপত্য ও অন্য কীর্তির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান র'য়েছে, আর দেশের অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান ক'র্‌ছে। ঘটনা-পরম্পরায় প্রাচীন মেক্সিকোর মানুষ আবার যেন নব-কলেবর ধারণ ক'রে বেঁচে উঠ্‌ছে। বিদেশাগত হিস্পানীয়দের সঙ্গে মিশ্রণ হ'য়ে এক নোতুন মিশ্র Hispano-Amerindian হিস্পানীয়-আমেরিণ্ডিয়ান, আর্য্য-মোঙ্গোল 'মেক্সিকান' জাতির উদ্ভব ওদেশে হ'চ্ছে। এই নবীন জাতি ভাষায় স্পেনীয় হ'য়ে যাচ্ছে, ধর্মে আদিম রঙে রঙানো রোমান-কাথলিক, আর জাতীয়তা-বোধে পূরাপূরি মেক্সিকান—আমেরিকান বা আমেরিণ্ডিয়ান, অথবা হিস্পানীয় নয়। এই অভিনব মিশ্র-জাতির আবির্ভাব মেক্সিকোর আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার —এটি এখনও আমাদের চোখের সামনে ঘ'ট্‌ছে। এই নবীন মিশ্র-জাতির জীবনী-শক্তির প্রমাণ আমরা দেখ্‌ছি এদের শিল্পে ও সংগীতে, আর সাহিত্য-কলায়। এই-সব কারণে, বহুদিন ধ'রে প্রাণের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, একবার মেক্সিকো দেশ চাক্ষুষ ক'রে আস্‌বো।

আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের তুলনায় মেক্সিকো আমাকে এমন আবিষ্ট করে যে, যদি আমাকে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র আর মেক্সিকো, এই দুই দেশের মধ্যে একটিতে মাত্র যাবার সুযোগ কেউ দিত, তা-হ'লে আমি মেক্সিকো-ই ঠিক ক'র্‌তুম। কারণ আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক কিছু-ই, ও-দেশে না গেলেও, অল্প-বিস্তর আমরা জানি। সংযুক্ত-রাষ্ট্র ইউরোপের-ই একটা পদক্ষেপ মাত্র ; মেক্সিকোর মতন আদিম আমেরিণ্ডিয়ান জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার যে অভিনবত্ব, সংযুক্ত-রাষ্ট্রে সে বস্তু কোথায় ? ইংরিজি ভাষা আর সাহিত্যের মাধ্যমে, সিনেমার দৌলতে, আমেরিকার ঘরের খবর

জান্‌তে আমাদের বাকী নেই। কিন্তু মেক্সিকো তার স্বকীয় গুণে, তার নিজের ইতিকথার রমন্যাসের জন্য আমাদের কাছে যেন এ পৃথিবীর নয়, অন্য গ্রহেরই রাজ্য। সেইজন্য বরাবর-ই মেক্সিকো-সম্বন্ধে আমার দুরপনেয় আগ্রহ ছিল।

এবার আমেরিকায় পেন্‌সিল্‌ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হ'য়ে গিয়ে সেখানে প্রবাস কর্‌বার সময়ে, মেক্সিকো-দর্শনের আগ্রহকে কার্য্যে পরিণত কর্‌বার সুযোগ আমার ঘ'টেছিল। আমেরিকার নিউ-ইয়োর্ক্‌-এর Rockefeller Foundation নামক্‌ প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে, আমি পূরো একটি মাস মেক্সিকোতে গিয়ে কাটিয়ে' আস্‌তে সমর্থ হই। ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে, মেক্সিকোর অনুরূপ সভ্যতা-বিষয়ক ইতিহাসের সাদৃশ্য আর সাম্য আছে। ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি আর বিকাশ সার্থক-ভাবে আলোচনা ক'র্‌তে গেলে, এক পর্য্যায়ের মিশ্র-জাতি আর মিশ্র-সভ্যতার দেশ ব'লে মেক্সিকো দেখে আস্‌তে পার্‌লে, আমার নিজের অনেকগুলি ধারণা আরও একটু পরিস্ফুট হ'তে পারে। রকেফেলার-ফাউণ্ডেশন্‌-এর কর্তৃপক্ষের কারো-কারো সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার আলাপ হয়। তাঁরা এই-ভাবে তুলনামূলক সভ্যতার আলোচনাকে উৎসাহ-দানের উপযুক্ত বিষয় ব'লে মনে করেন। আর আমার ফিলাডেল্‌ফিয়া থেকে বিমান-পথে মেক্সিকো যাতায়াতের আর মেক্সিকোতে এক মাস ধ'রে অবস্থানের আর ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন—একটি থোক টাকা subvention বা বিশেষ গবেষণার জন্য অর্থানুকূল্য-রূপে আমায় দান করেন। এই subvention-এর জন্য কোনও শর্ত তাঁরা রাখেন নি। এঁদের এই বিদ্যোৎসাহ-হেতু আমি ফাউণ্ডেশন-এর কাছে ঋণী, আর কৃতজ্ঞ চিত্তে সে ঋণ স্বীকার ক'র্‌ছি।

আমার যাত্রার জন্য হাওয়াই জাহাজের যাতায়াতের টিকিট রকেফেলার-ফাউণ্ডেশন থেকে আমায় কিনে দেন—প্লেনে ফিলা-

ডেল্‌ফিয়া থেকে ওয়াশিংটন, সেখানে প্লেন বদলে', ওয়াশিংটন থেকে Houston হাউস্টন (Texas টেক্সাস রাজ্যে), হাউস্টনে আবার মেক্সিকোগামী প্লেন ধ'রে সোজা মেক্সিকো শহর; তারপরে এক মাস মেক্সিকো শহরে আর অন্যত্র কাটিয়ে', মেক্সিকো শহর থেকে প্লেনে Merida মেরিদা (Yucatan য়ুকাতান প্রদেশের প্রধান নগর)। মেরিদায় ২।৪ দিন থেকে মায়াজাতির প্রাচীন কীর্তি দেখে, আবার প্লেনে ক'রে সংযুক্ত-রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন।

প্রসঙ্গতঃ এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ ছিল, এ কথা কেউ-কেউ অনুমান ক'রে, বই লিখেছেন। এ বিষয়ে আমি কিছুটা অধ্যয়ন করেছি, স্বচক্ষে মেক্সিকোতে গিয়ে সেখানকার প্রাচীন আর আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অবস্থা দেখে এসেছি। মেক্সিকোর সভ্যতা, আমেরিকার অন্য সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতার মতন (কি উত্তর-আমেরিকায় আর কি দক্ষিণ-আমেরিকায়), একেবারে স্বতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত বস্তু, ভারতের সভ্যতার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই, ভারতের কোনও প্রভাব আমেরিকায় পৌঁছায়নি। আমেরিকার আদিম লোকদের ভাষায়, ভাবে, চিন্তা-প্রণালীতে, ধর্মে, অনুষ্ঠানে বাস্তব সভ্যতায়, ভারতের কোনও প্রভাব পাওয়া যায় নি। মেক্সিকান ও অন্য আমেরিকানরা লোহার ব্যবহার জান্‌ত না, পাথর দিয়ে পাথর কেটে সব বড়ো বড়ো ইমারত বানাত, তার বাস্তু-রীতি একেবারে স্বতন্ত্র। যে-যে স্থানে, যে-যে ব্যাপারে ভারতের প্রভাব আছে ব'লে কেউ কেউ মনে ক'রেছেন সে-সব জিনিস তাঁরা হয় ঠিক-মতো দেখেন নি, নয় তার অন্য সহজ কারণ-নির্দেশ ক'রে, আপাত-দৃষ্টিতে যে সাদৃশ্য অনুমিত হয়, তার যথার্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন নি। আমেরিকা—মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি—আর ভারত, দুই একবারে দুটি পৃথক্ জগৎ। এ-বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়—

পরে এ বিষয়ে বিশদ বিচার করা যেতে পারে। অন্যত্র এই বিচার কিছু-কিছু ক'রেছি। এই প্রবন্ধে কেবল আমার মেক্সিকো-যাত্রার প্রসঙ্গ-ই ক'র্‌বো।

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, বৃহস্পতিবার, আমার যাত্রার দিন স্থির হ'ল। তার আগে ২।৪ দিন ফিলাডেল্‌ফিয়াতে একটু বেশ ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। জিনিস-পত্র গুছানো, বই-টই সমস্ত দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। কারণ ঠিক এক মাস পরে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে ফিরে এসে, মাত্র ২।৪ দিন সেখানে থাক্‌তে পার্‌বো, তার পরেই দেশ-মুখো হ'য়ে আমায় পাড়ি দিতে হবে। আমাদের বাসায় রাম রেড্ডি ব'লে একটি তেলুগু ছেলে থাক্‌ত, চমৎকার ছোকরাটি। তার কাছে কিছু জিনিস-পত্র জমা দিলুম, ধোবার বাড়ি থেকে আমার ময়লা কাপড় কাচিয়ে' এনে সে-ই রেখে দেবে, এ-সব ঠিক ক'র্‌লুম। ডাক্তার ভট্ট, ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ডাক্তারি করেন, চল্লিশ বছর ধ'রে আমেরিকায় বাস ক'র্‌ছেন, ভারতীয় (বাঙালী) বিপ্লবী, আর তাঁর আমেরিকান্‌ স্ত্রী, এঁরা ফিলাডেল্‌ফিয়ার ভারতীয় ছাত্র আর ছাত্রীদের বাপ-মায়ের মতন, ভারতীয় মাত্রেরই অকৃত্রিম সুহৃদ্‌। আমাকে একেবারে ছোটো ভাইয়ের মতো ডাক্তার ভট্ট গ্রহণ ক'রেছিলেন,—এঁরা আমার বাক্স-পেঁটরা কিছু-কিছু রাখ্‌বার ভার নিলেন।

আগের দিন রাত্রে ফোনে ট্যক্সিওয়ালাদের জানিয়ে' দেয়া হয়, কথা-মতো ঠিক ভোর ছ'টায় ট্যাক্সি আমার বাসার দরজায় এসে হাজির। আমি পূর্ব রাত্রেই মাল-পত্র গুছিয়ে রাখি, ভোর পাঁচটায় উঠে তৈরী হ'য়ে থাকি। রেড্ডির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা ক'র্‌লুম। ফেব্রুয়ারির ১৪ই তারিখ, পূরো শীতকাল। দু'দিন আগে বেশ তুষার-পাত হ'য়েছে, রাস্তার অনেক জায়গা শক্ত জমাট বরফে

ঢাকা। ফিলাডেল্‌ফিয়ার বিমান-ঘাঁটি আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। ছ'মাস আমেরিকায় কাটানো গেল, এখানকার হাল-চাল একটু দেখে নেওয়া গেল। মোটের উপরে, আমেরিকা ভালোই লেগেছিল। ফিরে এসে মাত্র ২।৫দিন থাক্‌তে পারবো—এই বিদায়ের বেলায় মনে হ'চ্ছিল, দেশটার প্রতি একটু মায়া প'ড়ে গিয়েছে।

পৌনে-সাতটার দিকে বিমান-ঘাটায় পৌঁছুলুম। তখন ভোরের আলো-আঁধারী, সূর্য্যও ওঠেনি। ছু'জন একজন ক'রে অন্য যাত্রীরাও এসে জ'ম্‌ছে। নিগ্রো পোর্টার বা কুলী, নীল-কালো উর্দী-পরা, মাথায় ছাজাওয়ালা টুপী, যথারীতি ট্যাক্সি থেকে মাল তুলে নিলে, ঠেলাগাড়ি ক'রে যে হাওয়াই-জাহাজ কোম্পানির প্লেনে ক'রে যাবো তার আপিসের সামনে নিয়ে এল'। প্রায় গোটা আষ্টেক বিভিন্ন লাইন। আমাদের প্লেন আটটার পরে ছাড়্‌বে। যেখান থেকে প্লেনটি আস্‌ছে, সেখান থেকে এখনও এসে পৌঁছয় নি, কাজেই অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে। সামনে খবরের কাগজ, সচিত্র পত্রিকা আর নানা টুকিটাকি জিনিসের দোকান। পথের সম্বল খানকতক সচিত্র কাগজ কেনা গেল। এক পাশে ছোটো আপিস ক'রে বীমা কোম্পানির লোক—মেয়ে কেরানী—ব'সে আছে। আমেরিকায় আজকাল বিমান-ভ্রমণের রেওয়াজ খুব বেশী ক'রে প্রচলিত হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বীমার রেওয়াজও বেড়ে গিয়েছে। বিমান-যাত্রায় বিপদের সম্ভাবনা খুব-ই বেশী, অনেকে তাই বিমান-যাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে জীবন-বীমা ক'রে নেন, এতে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, ছু' মিনিটের মধ্যে বীমা হ'য়ে যায়—ফর্মে নাম-ঠিকানা, বিমান-যাত্রার তারিখ, নম্বর, কোম্পানির নাম, ছুর্ঘটনা হ'লে টাকা পাবে কে তার নাম-ঠিকানা লিখে, টাকা জমা দিলেই, জমা-দেওয়া এই প্রিমিয়মের অনুপাতে, কোনও বিপদ হ'লে, প্রাণ গেলে বা হাত-পা বা অন্য অঙ্গ গেলে, যার উদ্দেশ্যে বীমা করা হ'ল, বেঁচে থাক্‌লে

বা মারা গেলে অন্য কেউ, প্রাপ্য টাকা তখনি পেয়ে যাবে। বীমা ক'রেই, সঙ্গে-সঙ্গে যার সুবিধার জন্য বীমা করা হ'ল তার নামে একখানা ছাপা চিঠি—তা'তে বীমার সংখ্যা প্রভৃতি সব দিয়ে—পাঠিয়ে' দেওয়া হয়, যাতে বিপদ ঘ'ট্‌লে, টাকা-দাবীর প্রমাণ-পত্র তার হাতে গিয়ে পৌঁছয়। আমেরিকা gadget বা কলকব্জার দেশ, থাম-ডাক-বাক্সের মতো স্বয়ংক্রিয় বীমা-সাধক যন্ত্র আছে—তার একটা মুখে রূপার টাকা (ডলার, বা আধা ডলার, বা অন্য টাকা) হিসাব-মতো ফেলে দিলেই, তদনুযায়ী টাকার বীমা-পত্র, ষ্ট্যাম্প সমস্ত বেরিয়ে' আসে, খাম, কাগজ, আত্মীয়ের কাছে প্রেষ্য প্রমাণ-পত্র, ডাক-টিকিট সব—সেগুলি ভ'রে লিখে দিয়ে আবার সেই থাম-বাক্সের ভিতরে ফেলে দিলেই হ'ল। যথাস্থানে টাকাটি ফেলে দাও, যথা-নির্দিষ্ট কাগজগুলিতে সই ক'রে দাও—বাকী সব প্রায় আপনা-আপনিই হ'য়ে যাবে।

নিগ্রো কুলীটি যে আমার মাল নামালে, সে যথাস্থানে মাল এনে ওজন ক'র্‌লে, তার পরে বিমান-কোম্পানির কেরানী কখন আস্‌বে তার অপেক্ষায় রইল। আমি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। লোকটিকে দেখ্‌লুম, যুবক, খুব বুদ্ধিমানের মতো মুখ। তার সঙ্গে আর একটি ছোকরা নিগ্রো তার সহকারী-রূপে র'য়েছে। আমার এক ক্যাম্বিসের কাপড়ের ব্যাগের উপরে, চামড়ার মুখপাটায়, হাতের লেখায় ইংরিজিতে একদিকে আর নাগরীতে অন্যদিকে আমার নাম, পরিচয়, সব লেখা ছিল—নাগরীতে "সুনীতিকুমার চাটুর্জ্যা, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ভারত" আর ইংরিজিতে এর অনুবাদ। দেখ্‌লুম, নিগ্রো পোর্টার এই লেখা বেশ নজর ক'রে দেখ্‌ছে। আমি মজা কর্‌বার জন্যে নাগরী লেখা তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "তুমি এই লেখা প'ড়্‌তে পারো?" সে ব'ল্‌লে—"মশায়, আপনি ইণ্ডিয়া থেকে আস্‌ছেন, এ ইণ্ডিয়ান

লিপি, আমি তো প'ড়্‌তে পারি না। আমি ব'ল্‌লুম, "এ হ'চ্ছে নাগরী লিপি, এতে ভারতের ভারতীয় ভাষা হিন্দী লেখা হয়, আর সংস্কৃত ভাষাও লেখা হয়—সংস্কৃত ভাষার নাম শুনেছ?" তখন আমাকে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে এই নিগ্রো মুটিয়া বা ভারিয়া ব'ল্‌লে, "হাঁ, ভারতের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, ইউরোপের লাতীন আর গ্রীকের মতো।" আমি তাকে ব'ল্‌লুম, "বেশ, বেশ, তুমি তো খুব ওয়াকিফ্-হাল ছোকরা, নিশ্চয়ই কলেজে পড়ো?" কলেজে বা অন্য কোনও বিদ্যালয়ে পড়ে, আর মুটেগিরি ক'রে বা অন্য ভাবে গায়ে খেটে অর্থসংস্থান করে, এটি আমেরিকায় খুব-ই সাধারণ। তখন ছোকরা আমায় ব'ল্‌লে, "হাঁ স্যর, আপনি অধ্যাপক মানুষ, আপনি বুঝ্‌বেন, আমি কলেজের ছাত্র, ডাক্তারি পড়ি, আর অবসর-কালে আমার বন্ধু আর আমি এই কুলিগিরি করি।" তাদের নামের কার্ড দিলে আমায়। প্রতিদানে একদিকে নাগরীতে আর একদিকে ইংরিজিতে ছাপা, আমার নাম-ধাম-পরিচয়-সংবলিত কার্ডও আমি ওদের দিলুম। নিগ্রো যুবকটির নাম Charles Harold Rodgers, তার সহযোগীর নাম Ferdinand A. Johnson. এরা করে বেশীর ভাগ মুটিয়ার কাজ, কিন্তু দু'জনে যেন এক firm বা আপিস চালাচ্ছে, নাম দিয়েছে Travel Bureau—"ভ্রমণ-সহায়ক প্রতিষ্ঠান"; ব'ল্‌লে, মাঝে-মাঝে তারা বিমান-যাত্রার টিকিটও যাত্রীদের জন্য কিনে দেয়, তাতে একটু কমিশনও পায়। এই নিগ্রো যুবক রজার্স-এর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব আনন্দ পেলুম। যুবকটি নানা বিষয়ের খবর রাখে। অশ্বেতকায় জাতির মানুষদের জন্য ভারতের সহানুভূতির কথা জানে, ভারতকে শ্রদ্ধা করে সে-জন্য। সাংস্কৃতিক জীবনের কথা ব'ল্‌লে—Pattern of Life বা জীবন-পদ্ধতি সর্বত্র এক হ'য়ে যাচ্ছে। ইউরোপের নকলে ভারতের বাইরেকার জীবনে পরিবর্তন হ'চ্ছে কিনা, জানতে চাইলে। তার

নিজের আকাঙ্ক্ষা, একবার সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আস্‌বে, আর বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ দেখে আস্‌বে।

কেরানীরা ইতিমধ্যে এল', আমার সঙ্গেকার মাল-পত্র ওজন হ'ল, টিকিট ওরা দেখে দিলে, ব'ল্‌লে সওয়া আটটায় প্লেন আস্‌বে, অপেক্ষা করুন। আমি নিগ্রো যুবকটিকে ট্যাক্সি থেকে মাল নামাবার মজুরী ২৫ সেণ্ট-এর বদলে ৫০ সেণ্ট বা আধ-ডলার দিলুম। যুবকটি ব'ল্‌লে, "এক কোয়ার্টার বা ২৫ সেণ্ট-ই হ'চ্ছে দস্তুর, আপনি তার ডবল দিচ্ছেন কেন?" আমি ব'ল্‌লুম, "তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশী হ'য়েছি, তাই না-হয় একটু বেশী-ই দিলুম।" সে ব'ল্‌লে, "মশাই, আমিও তো আপনার সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে উপকৃত হ'লুম, এ তো পরস্পরের আদান-প্রদানে লাভের কাটাকাটি হ'য়ে গেল।" তবে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লে, "আমি পোর্টারের কাজ ক'র্‌ছি, বখশিশ পেলে 'না' বলা আমাদের রীতি-বিরুদ্ধ—ধন্যবাদের সঙ্গে আপনার বখশিশ নিচ্ছি।" নাগরী আর ইংরিজিতে ছাপা আমার কার্ড পেয়ে, খুব খুশী হ'য়ে তার পকেট-বুকের ভিতরে সেটাকে রাখ্‌লে।

নিগ্রো যুবকটির সঙ্গে হাওয়াই-জাহাজ কোম্পানির কাউণ্টারের বা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা কইছি, এমন সময়ে আমাদের সঙ্গে ঐ প্লেনেই এক-পথের যাত্রী আরও দু'তিনটি লোক এসে জুট্‌ল। দু'টো শ্বেতকায় ছোকরা-ও, বেকার ব'লে মনে হ'ল, কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' আমাদের কথা শুন্‌তে লাগ্‌ল। মুখ ময়লা, ময়লা কাপড়-পরা, মুখে নেভানো সিগারেটের টুক্‌রো মনে হ'ল যেন দাঁতে ক'রে চিবোচ্ছে—এরা অর্থ-হীন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ দৃষ্টিতে খানিক নিগ্রো যুবকটির দিকে খানিক আমার দিকে তাকিয়ে' চ'লে গেল। অন্য যাত্রীরা নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খালি একটি লোক দেখ্‌লুম, নিজের টিকিট দেখিয়ে', সঙ্গের মাল-পত্রের মধ্যে একটি মাঝারি আকারের চামড়ার ব্যাগ ওজন করিয়ে',

তা'তে টিকিট লাগিয়ে' নিয়ে, আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' আমাদের কথা শুন্‌তে লাগ্‌ল। শ্বেতকায়, বেঁটে-খাটো, মজবুত চেহারার মানুষটি, হিন্দীতে যাকে "হট্টাকট্টা" বলে, যেন আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় এই রকম একটু আগ্রহপূর্ণ-ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌ল। আমিও দু'বার তার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় ক'র্‌লুম, সে-ও সৌজন্য ক'রে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ল, আমিও হাস্‌লুম। তার পরে ব'ল্‌লে, "স্যর্, আপনি ইণ্ডিয়ার লোক ?" আমি ব'ল্‌লুম, "হাঁ, আমি ইণ্ডিয়ার লোক ; ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে কৌতূহল আপনারও আছে দেখ্‌ছি।" সে ব'ল্‌লে, "ব'ল্‌লে পরে আপনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, আমিও আসলে ইণ্ডিয়ার মানুষ।" শুধালুম, "How's that ? কী রকম ?" ব'ল্‌লে, "মশায়, আমি জা'তে Gipsy জিপ্‌সি। তিন পুরুষ মাত্র আমরা আমেরিকায় এসেছি—আমার ঠাকুরদাদা ইংলাণ্ড থেকে সপরিবারে এসে এদেশে উপনিবিষ্ট হন। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, জিপ্‌সিরা কতদিন আগে কেউ জানে না ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপে আসে ; আমাদের জা'ত ইউরোপের সব দেশেই ছড়িয়ে আছে, আর আমাদের জাতির কিছু-কিছু লোক ইউরোপের অন্য মানুষের সঙ্গে এদেশেও এসে গিয়েছে। এখন আমি আমেরিকান, কিন্তু মূলে আমি ভারতীয়।"

লোকটির মুখে এই কথা শুনে ভারি খুশি হ'লুম। ইউরোপের জিপ্‌সিদের সম্বন্ধে অন্যত্র আমি কিছু-কিছু লিখেছি। সম্ভবতঃ দু' হাজার বছর আগে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে তখনকার দিনের প্রাকৃত ভাষা ব'ল্‌ত এমন একটি ভারতীয় দল, দেশ ছেড়ে, কী কারণে জানা যায় নি, পশ্চিমের দিকে যাত্রা করে। এরা প্রথমে পারস্যে উপনিবিষ্ট হয়। এদের কিছু লোক কয়েক পুরুষ পরে পারস্য থেকে আরও পশ্চিমে, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, আর

পালেস্তীনে আসে। তার পরে ধীরে-ধীরে, কয়েক পুরুষ আরও ওসব-দেশে কাটিয়ে', সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে, গ্রীসে আসে। গ্রীসে এদের অনেকে এখনও র'য়ে গিয়েছে। গ্রীস থেকে মাসিডোনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেখোস্লোভাকিয়া, হঙ্গেরি, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, তার পরে জরমানি আর ফ্রান্স হ'য়ে ওদিকে ইটালি আর স্পেন, পরে ইংলাণ্ড। ইংলাণ্ডের লোকেরা ভুল ক'রে মনে ক'রত যে এরা Egypt বা মিসর থেকে এসেছে, সেইজন্য ইংলাণ্ডে ইংরিজি ভাষায় এদের বলাহয় Egyptian, সংক্ষেপে Gipsy বা Gipsy. এই দু' হাজার বছর ধ'রে, ইংলাণ্ডে এদের কোনও-কোনও দল ছাড়া, প্রায় সর্বত্রই নিজেদের পুরাতন ভারতীয় ভাষা এখনও এরা বজায় রেখেছে। এই ভাষা প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত, পাঞ্জাবী আর হিন্দীর ধরণের ভাষা। বিভিন্ন দেশের জিপ্‌সিদের ভাষার চর্চা হয়েছে, হ'চ্ছে। Paspati-র গ্রীসের জিপ্‌সিদের ব্যাকরণ, Miklosich-এর যুগোস্লাভিয়ার জিপ্‌সির ব্যাকরণ, Sampson-এর ওয়েলস্‌-এর জিপ্‌সিদের ভাষার তুলনাত্মক ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (সংস্কৃত আর প্রাকৃত আর অন্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে') প্রভৃতি অনেক বই বেরিয়ে গিয়েছে, আর এর অনেকগুলি আমার দেখা বই। ভাষার দিক্ থেকে এরা আমাদের জ্ঞাতি। গ্রীসে এদের Athingoi বলে, মধ্য-ইউরোপে Tsigan, জর্‌মানরা এদের Zigeuner, স্পেনে বলে Zincali, আর ফ্রান্সে Bohemian; আর এক ভ্রান্ত ধারণার বশে, ইংলাণ্ডে এদের বলে Gipsy. এদের ভাষার দু'চারটে কথার নমুনা—Cahin tiro kher (পোলাণ্ডের জিপ্‌সী) = "কহাঁ তেরা ঘর?" Gurra-la pani piava (স্পেনের জিপ্‌সী) = "ঘোড়া-লাই (= ঘোড়াকো) পানি পিয়াও।" ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা তাদের ভাষা প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবে হারিয়ে' এখন প্রায় পুরাপুরি ইংরিজি-ভাষী

হ’য়ে গিয়েছে—ওয়েলস্‌-এ কিন্তু জিপ্‌সিরা এ বিষয়ে বিশেষ-ভাবে রক্ষণশীল। তবে অনেক ভারতীয় শব্দ ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা তাদের মুখের ইংরিজির মধ্যে ব্যবহার ক’রে থাকে, তা’তে ক’রে সাধারণ ইংরেজের কাছে তাদের ভাষা বোধগম্য হয় না, আর জিপ্‌সিরা সাধারণ ইংরেজের কাছে একটু পৃথক্‌ একটু দুর্বোধ্য হ’য়েই থাক্‌তে চায়। যেমন, I saw the man না ব’লে, ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা ব’ল্‌বে—I dicked the manchy—এখানে dick = “দেখ্‌”, manchy = “মানুষ”। জিপ্‌সিরা ইউরোপের খ্রীষ্টান সমাজের বাইরে বাস ক’র্‌ত। এরা ছিল ভবঘুরে’—হাঘরে’ বা যাযাবর; বাড়ি-ঘর-দোয়ার ক’রে থিতু হ’য়ে কোথাও থাক্‌ত না। বড়ো-বড়ো বাসের মতো ঘোড়ার-গাড়ি (আজকাল মোটর-বাস হ’য়েছে এদের ঘোড়ার-গাড়ির বদলে), তাকে ব’ল্‌ত Caravan, তাইতে নিজেদের ঘর-সংসার নিয়ে, স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়। পেশা—পুরুষেরা কামার বা টিন্‌-মিস্ত্রির কাজ করে, আর মেয়েরা হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে, দৈবজ্ঞের কাজ করে। আবার জঙ্গলে জানোয়ার-টানোয়ার হরিণ খরগোস চুরি ক’রে মেরেও খেত, ভেড়া-গোরুও চুরি ক’র্‌ত। কোনও জায়গায় মেলা-টেলা, ঘোড়-দৌড়ের খেলা, বড়ো Sports প্রভৃতি ব’স্‌লে, জিপ্‌সিরা তাদের Caravan গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির হয়, তাঁবুতে fortune-teller বা ভবিষ্যৎ-বলার দোকান সাজিয়ে’ বসে,—ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়েরা দুর্বোধ্য প্রাচ্যজাতির লোক ব’লে জিপ্‌সিদের ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌বার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে; তাদের মেয়ে আর পুরুষেরা দলে দলে ভীড় করে এদের তাঁবুতে, চকাবকা রঙীন কাপড় পরা, কালো-চোখ, গলায় রকমারি কাচের মালা, কানে বড়ো-বড়ো দুল বা মাকড়ি, মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা জিপ্‌সি মেয়ের কাছে হাত দেখায়। ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরি প্রেমের ব্যাপারে এদের

পরামর্শ নেয়, খুশী হ'য়ে ছ'পেনি শিলিং ফ্লরিন ক্রাউন দক্ষিণা দেয়।

এই হ'ল জিপ্‌সি জীবনের পটভূমিকা। এরা এখন ইউরোপীয়দের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের হ'য়ে গিয়েছে। গায়ের রঙ এদের একটু ময়লা ধরণের ইউরোপীয়দের মতো। মাথার চুল, চোখের তারা কালো। এরা বড্ড সংগীতপ্রীয়। গান বাজনা নাচ না হ'লে এদের একদম চলে না। মধ্য-ইউরোপে, স্পেনে, সর্বত্রই ঐ-সব দেশের গ্রাম্য উৎসবে জিপ্‌সি বাজিয়ে' না হ'লে চলে না। আমি জান্‌তুম যে ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা অনেক সময়ে ইংরিজি পদবী নিচ্ছে—Boswell এই-সব পদবীর মধ্যে অন্যতম। আমি এই জিপ্‌সি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—"আপনারা এখানে কি ইংলাণ্ডের মতন পূর্বেকার পেশাই বজায় রেখেছেন? আপনার পদবী কি Boswell?" পদবীর কথা শুনে সে মহা খুশী—ব'ল্‌লে, "মশায়, আপনি তো আমাদের অনেক কিছু জানেন দেখ্‌ছি—আমার পদবী হ'চ্ছে Boswell—নাম আমার Thomas Boswell।" ব'লে একখানা খবরের কাগজ থেকে কাটা একটা ছোটো বিজ্ঞাপন দেখালে—পেশা, ভবিষ্য্যদ্বাণী করা। ব'ল্‌লে,—"আর সেকালের মতো গাড়ি ক'রে গাঁয়ে-গাঁয়ে শহরে-শহরে বেড়ানো পোষায় না। আমরা এখন এক-এক শহরে ব'সে, আপিস মতন ক'রে, সেখানে ব'সে-ব'সেই লোকের হাত দেখে দু' পয়সা উপার্জন করি। জানেন তো, মানুষের সনাতন দৌর্বল্য আছে-ই; তারা আসে—মানসিক শান্তি পাবার জন্যে, দু'টো আশার কথা শুনে। আমরা তাদের আশার বাণী-ই দিয়ে থাকি। তা'তে তারা খুশী হয়, দু' পয়সা খরচ-ও করে, আমাদেরও চ'লে যায়। খালি চ'লে যায় না মশায়, আপনি ভারতীয়, এক-রকম আমাদের স্বজাতি, আপনাকে ব'ল্‌তে বাধা নেই—বেশ ভালোই চ'লে যায়। কিন্তু মশায়, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আর থাক্‌বে

না, আর ২।৩ পুরুষ পরেই আমরা কালোরা (জিপ্‌সিরা নিজেদের ভাষায় নিজেদের বলে Kalo কালো, আর বলে Romani রোমানি —শেষোক্ত নামটি তারা এক সময়ে যে রোমক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তার-ই স্মৃতি বহন ক'রে আছে) আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাবো। এই দেখুন না, এখনই আমাদের অনেকে জমী-জেরাৎ ঘরবাড়ি ক'রে পাকা ঘরবাসী হ'য়ে যাচ্ছে—আর ভবঘুরে' থাক্‌ছে না। তবে যতদিন আমাদের এই হাত-দেখা ব্যবসা বাপ-পিতামহের পেশা হিসাবে আর লাভের পেশা হিসাবে আমরা চালাবো, ততদিন আমরা ঠিক থাক্‌বো।"

লোকটির সঙ্গে আলাপ ক'রে এই-সব কথা জান্‌লুম। সে আরও ব'ল্‌লে, আমেরিকার নানা শহরে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আর নিকট-আত্মীয়েরা ছড়িয়ে' আছে। সে নিজে নিউ-ইয়োর্কে থাকে, তার স্ত্রী দক্ষিণে নিউ-অর্‌লিয়ান্স-এ একটি হাত-দেখার আড্ডা খুলে আছে। ব'ল্‌লে, "লেখাপড়া-জানা আমেরিকানরা বাইরে তাদের এই পেশা নিয়ে ঠাট্টা করে, তাদের 'চোর জুয়াচোর, ঠক' অপবাদ দেয়, কিন্তু একটু ঠেকায় প'ড়্‌লে তারাও খুব আসে। লুকিয়ে-চুরিয়ে হাত দেখিয়ে যায়, স্ফটিকের গোলার সাহায্যে ভবিষ্যতের খবর নিয়ে যায়।" টমাস বস্‌ওয়েল মাঝে-মাঝে হাওয়াই জাহাজ ক'রে নানা শহরে ঘোরে, নিয়মিত-ভাবে নিউ-অর্‌লিয়ান্স-এ তার স্ত্রীর কাছেও যায়। এখন সে সেখানেই যাচ্ছে, আমায় ওয়াশিংটন শহরে প্লেন বদল ক'র্‌তে হবে—সে সোজা আরও দক্ষিণে এই প্লেনেই নিউ-অর্‌লিয়ান্সের দিকে যাবে।

আমাদের প্লেন এসে গেল। প্রায় ৪।৫ জন যাত্রী এখানে এই প্লেন থেকে নাম্‌ল, আমরাও প্রায় ৫।৬ জন যাত্রী ছিলুম, সকলে হাত-ব্যাগ নিয়ে প্লেনে উঠে ব'স্‌লুম। Flight 515—৫১৫

সংখ্যার বিমান-যাত্রা। আটটা পঁচিশে যাত্রা ক'রে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা প্রথম অবতরণ-স্থান ওয়াশিংটনে পেঁৗছুলুম। বস্‌ওয়েল খুব হৃদ্যতার সঙ্গে হাত ঝাঁকি দিয়ে আমায় বিদায় দিলে। ব'ল্‌লে, ভবিষ্যতে যদিও কোথাও আবার দেখা হয়, খুশী হবে। তার "স্বজাতির মানুষ" ব'লে, আমার সঙ্গে এই স্বল্প কিন্তু ঘনিষ্ঠ আলাপের নিদর্শন-রূপে, নাগরী আর ইংরিজিতে ছাপা আমার কার্ড একখানা চেয়ে নিলে।

ওয়াশিংটন হাওয়াই-জাহাজের আড্ডা থেকে, আমেরিকায় ভারতের রাজদূত শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন, আই-সি-এস, আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা কইলুম। বিনয়রঞ্জন এক-সঙ্গে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র আর মেক্সিকো, এই দুই দেশের ভারতীয় রাজদূত। তিনি আমার মেক্সিকো পেঁৗছুবার দু'-দিন পরে সস্ত্রীক মেক্সিকোতে উপস্থিত হবেন, মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধি-রূপে প্রথম সাক্ষাৎ ক'রে আস্‌বেন। আমার যাত্রার কথা তাঁকে জানিয়ে' দিলুম।

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আমাদের নোতুন প্লেন ছাড়্‌ল। Flight 501—৫০১-এর সংখ্যার যাত্রাপথ। Texas টেক্সাস রাজ্যের Houston হাউস্টন-শহরে আমাকে নাম্‌তে হবে, সেখানে থেকে অন্য প্লেনে সোজা মেক্সিকো যাওয়া। বিকাল-বেলা সেখানে পেঁৗছুলুম। পথে নীচে আমেরিকার বিরাট্ বিশাল তিনটি নদী দেখা গেল—Tennessee, Mississippi আর Red River. আমেরিকার এই অঞ্চলটা সমতল ক্ষেত্র। Houston হাউস্টন-এ নাম্‌লুম অল্পক্ষণের জন্য। আমরা Gulf of Mexico মেক্সিকো উপসাগরের উপর দিয়ে খানিক চ'লে সোজা মেক্সিকো শহরে গিয়ে নাম্‌বো। হাউস্টন-এ আমাদের মেক্সিকো-গামী অন্য নোতুন প্লেন তৈরী ছিল, বেশী দেরী হ'ল না প্লেন ব'দ্‌লে

এই প্লেনে উঠ্‌তে। পাসপোর্ট নিয়ে কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হ'ল না। হাউস্টন আমেরিকার নিগ্রো-অধ্যুষিত দক্ষিণ-অঞ্চলের মধ্যকার বড়ো শহর—এখানে বর্ণবৈষম্য খুবই বেশী। হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় বিস্তর নিগ্রো দেখ্‌লুম, কিন্তু তাদের মর্য্যাদা নেই, সর্বত্র শ্বেতকায়দের সম্মান আগে। মুখ-হাত ধোবার জায়গা শৌচাগার নিগ্রোদের জন্য পৃথক্‌, শ্বেতকায়দের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। যথাস্থানে এই ভাবের ধাতু বা কাষ্ঠ-ফলকের উপরে বিজ্ঞাপন লেখা—For Whites only—For Coloured Men, For Coloured Women—এ বিষয়ে ভীষণ কড়াকড়ি এই দক্ষিণের সংযুক্ত-রাষ্ট্রে। পরে এ বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা হয়।

হাউস্টন থেকে বোধ হয় ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে নির্বিবাদে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের প্লেন এল' মেক্সিকোতে। এখানে পাসপোর্ট আপিসে কোনও রকম অনাবশ্যক দেরী হ'ল না। মনে একটা বেশ আনন্দ হ'ল—কতদিনের আকাঙ্ক্ষিত মেক্সিকো দেশে আজ সশরীরে অবতীর্ণ হ'লুম! নোতুন-নোতুন অভিজ্ঞতার জন্য উৎসুক হৃদয়ে মেক্সিকোর মাটিতে পদার্পণ ক'র্‌লুম। এক মাসের জন্য মেক্সিকোতে ভ্রমণ আর বাস চ'ল্‌বে—সানন্দ হৃদয়ে মেক্সিকো মহানগরীর মধ্যে পূর্ব-নির্দিষ্ট হোটেল—নগরের প্রায় মধ্য-ভাগে অবস্থিত Hotel Plaza প্লাসা হোটেলে গিয়ে ওঠ্‌বার জন্যে ব্যবস্থা ক'র্‌তে লাগ্‌লুম॥

বঙ্গাব্দ ১৩৬০

ভিক্ষুক

বছর তিনেক পূর্বে দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। পূজার ছুটিতে দুইজন বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ রওনা হই। পথে কোকনাডা ("কাকনাড") হইয়া মাদ্রাজে পঁহুছাই। মাদ্রাজে একটি গুজরাটি শেঠের স্থাপিত ধর্ম-শালায় আমরা কয়দিন কাটাই। মাদ্রাজের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়া লই। তারপরে আমরা আরও দক্ষিণে দ্রবিড় বা তমিল দেশের বড়ো-বড়ো তীর্থ, যে কয়টি রেলের লাইনে পড়ে, সেই কয়টি দেখিতে বাহির হই। কতক পথ মোটর-বাসে করিয়া যাই, কিন্তু আমাদের ভ্রমণ বেশীর ভাগই রেলে হয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই সর্বত্র গিয়াছি—নানা কারণে কোনও অসুবিধা অনুভব করি নাই; তৃতীয় শ্রেণীতেও যাত্রীর অভাব ছিল; রাত্রে ঘুমাইয়া যাইবার ব্যাঘাতও ঘটে নাই। এইরূপে প্রায় মাস খানেক ধরিয়া কাঞ্চীপুর, পক্ষিতীর্থ, মহাবলিপুর, পণ্ডিচেরী (পুতুচ্চেরি), চিদম্বরম্, তাঞ্জোর (তঞ্জাবুর্), কুম্ভকোণম্, ত্রিচিনোপলি (তিরুশিরপ্পল্লী), মত্নরা (মধুরৈ) সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, ত্রিবন্দ্রম্ (তিরুব্-অনন্তপুরম্), কন্যাকুমারী, এরনকুলম্, ত্রিচূড় ও উটাকামণ্ড্—এই স্থানগুলি দেখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

বাঙ্গালাদেশ হইতে আমরা সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিমের-ই টান বেশি করিয়া অনুভব করিয়া থাকি। উত্তর-ভারত তাহার সমগ্র প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি লইয়া চিরকাল ধরিয়া আমাদের আকর্ষণ করিয়া থাকে। উত্তর-ভারতের যত তীর্থ, যত প্রাচীন নগরী, রাজপুত ও মুসলমান যুগের যত কীর্তি-কলাপ—এগুলির সঙ্গে আমরা যেন এক অচ্ছেদ্য যোগ অনুভব করি। গয়া, কাশী,

জৌনপুর, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লখ্‌নৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, আগরা, দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর, লাহোর; আবার হিমালয়ের পাদদেশে ও ক্রোড়মধ্যে হরিদ্বার, লছমন্‌ঝোলা, কেদার-বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, পশুপতিনাথ, অমরনাথ; পাঞ্জাব ও রাজপুতানা, নেপাল ও কাশ্মীর, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র—এগুলি তো উত্তর-পশ্চিম ভারতেরই অনুবৃত্তি। বাঙ্গালী যেন ঐ-সব দেশে যাইবার জন্য মুখাইয়া থাকে; শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, ধনী অথবা নির্ধন, সব শ্রেণীর বাঙ্গালীর কাছে, তীর্থ-দর্শন, স্বাস্থ্যলাভ এবং ভ্রমণ, এই তিন উপলক্ষ্য লইয়া পশ্চিমের আহ্বান সর্বদা আসিতেছে; বাঙ্গালীও যথাশক্তি তাহাতে সাড়া দিতেছে। কিন্তু দক্ষিণ-দেশ তাহার বিপুল ঐতিহাসিক সম্পদ্, তাহার বিরাট্ মন্দির-সমূহ, এবং দেশের লোকেদের মধ্যে বিদ্যমান দুর্লভ ভক্তি ও ভাব-শুদ্ধি লইয়া বিরাজমান—আমরা যেন সেদিকে নাড়ীর টান অনুভব করি না। আমরা সাগর-দর্শন ও দেব-দর্শন উভয় উদ্দেশ্য লইয়া পুরীধাম পর্য্যন্ত যাই বটে, কিন্তু তাহার দক্ষিণে বড়ো একটা যাইতে চাহি না। ক্বচিৎ কোনও রকমে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে গিয়া, একটা বড়ো তীর্থ দেখিয়া বা ছুঁইয়া আসিয়াছি বলিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কিন্তু খুঁটিনাটির সঙ্গে, অন্তরের আনন্দের সঙ্গে সবটা উপভোগ করিতে-করিতে দক্ষিণ-দেশ দর্শন যেন আমাদের ধাতে সহে না।

আমরা তিনজন কিন্তু দক্ষিণ-দেশে অনেক কিছু পাইবার জন্য গিয়াছিলাম; দক্ষিণের ইতিহাস ও কীর্তি-কাহিনী, সাহিত্য ও শিল্প—এগুলির সহিত আংশিক পরিচয় স্থাপন করিয়াই গিয়াছিলাম। দক্ষিণ-দেশ যেমনটি আছে তেমনটি-ই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম; সেইজন্য, আমাদের ভ্রমণ যতদূর সার্থক হওয়া সম্ভব আমাদের পক্ষে ততদূর সার্থক হইয়াছিল। আমরা আমাদের ভ্রমণটি সম্পূর্ণ-রূপে উপভোগ করিয়াছিলাম। দক্ষিণের

বিরাট্ প্রাণের সাড়া আমরা যেন পাইয়াছিলাম—কেবল দেশের বিরাট্ মন্দিরগুলির মধ্যে নহে, রাস্তার ভীড়ের মধ্যে, সভা-সমিতিতে ও গানের জলসায়, হোটেলে, ট্রেনে, স্টেশনে, দোকানে, হাটে, সর্বত্র আমরা প্রাচীন ও আধুনিক দ্রবিড় জীবনের স্পন্দন যেন কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের সমীক্ষা ও রসোপভোগ অনেকখানি অপূর্ণ থাকিত, যদি এই-ভাবে দ্রবিড়দেশ-দর্শন আমাদের না ঘটিত। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণটুকু সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আমাদের মনে হইল, ভারতের সনাতন আত্মার এক অতি মনোহর ও বিশিষ্ট প্রকাশ আমাদের চক্ষের সামনে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আমাদের মনে হইল, দক্ষিণ-ভারত না দেখিয়া আসিলে আমাদের এই বিরাট্ দেশের সঙ্গে পরিচয় নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকে। দ্রবিড় দেশে এই ভ্রমণের স্মৃতি চিরকাল আমাদের চিত্তে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এই স্মৃতি আমাদের মনকে অপূর্ব ভাবশুদ্ধির দ্বারা সরস ও উন্নত করিয়া রাখিবে—এবং মাঝে-মাঝে দক্ষিণ-দেশের জন্য মনকে মোহাবিষ্ট ও আকুল করিবে।

সমস্ত ভ্রমণ-কাহিনী এখন দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিতে বসিব না। কি-ভাবে আমরা চলিয়াছি ফিরিয়াছি, ভ্রমণের সুবিধা-অসুবিধা কী ছিল, কী কী দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কোথায় বা দক্ষিণের চিরন্তন প্রাণের পরিচয় পাইয়াছি—এ-সব কথা লইয়া ধারাবাহিক-রূপে বলা চলে। কিন্তু সে কাজে এখন হাত দিব না। আমি আজ কেবল দক্ষিণ-ভ্রমণকালে আমাদের চোখের সামনে দেশের জীবন-প্রবাহের মধ্যে উপলক্ষিত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিব। তাহা হইতে এক দিক্ দিয়া দক্ষিণের প্রাণের একটু পরিচয় মিলিবে।

ট্রেনে করিয়া চিদম্বরম্ হইতে তাঞ্জোর যাইতেছি। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, আসাম-বেঙ্গল লাইনের মতো ছোটো লাইন। তখন

বেলা প্রায় সাড়ে-এগারোটা হইবে। গাড়িতে ভীড় মন্দ নহে। সাধারণ লোকের ভীড়—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রেণীর লোক-ই বেশী। মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো স্টেশন আসিতেছে, গাড়ি ছুই-চারি মিনিট থামিতেছে, লোক নামিতেছে উঠিতেছে। আমরা তিনজনে ছুইটা জানালার ধারে বসিয়া আছি। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া অন্য যাত্রীরা আমাদের বাঙ্গালী চেহারার প্রতি তাকায়, কেহ-কেহ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে ছুই-একটা কথা কহিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে। হিন্দী-জানা লোক নিতান্তই বিরল। ছুপুরের গরমে আমাদের যাত্রা বড়-ই একঘেয়ে' ঠেকিতেছিল। আমরা আমাদের গন্তব্য স্থলের আশায় টাইম-টেব্‌ল মিলাইয়া কেবল স্টেশন গুণিতেছি—কখন তাঞ্জোর পহুঁছিব। এমন সময়ে, মাঝে কি একটা স্টেশন পড়িল। আমাদের কামরা হইতে লোক নামিল, কতকগুলি নূতন লোক কামরাতে উঠিল। যে যাহার স্থান করিয়া লইয়া বসিল—সেই লাল ও হলদে' রঙ্গের সাড়ি-পরা, মাথা-খোলা, গায়ে হলুদ-মাখা, নাকে নাকছাবি তমিল ব্রাহ্মণ-নারী; সেই লুঙ্গীর আকারে কাপড় পরা, ছু'হাতে সোনার বালা, মাথায় উড়ে'-খোঁপা, কানে হীরার কানফুল, কৃষ্ণবর্ণ, খালি-গায়ে জরীর-পাড় চাদর ঝুলানো তমিল চেট্টি বা বানিয়া; সেই হাঁটু-পর্য্যন্ত কাপড়, খালি গা, মাথায় লাল কাপড়ের পাগড়ি, হাতে চুরুট, তমিল পল্লীবাসী। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন দেখিলাম, একটি লোক, জায়গা খুঁজিয়া না লইয়া বা বসিবার চেষ্টা না করিয়া, কামরার দরজার সামনে যেখানে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই একটি বক্তৃতা জুড়িয়া দিল। লোকটির চেহারায় হঠাৎ দৃষ্টিতে লক্ষণীয় কিছু ছিল। বেঁটে-খাটো মানুষটি, পরণে সাদা ধুতি লুঙ্গীর ধরণে কাছা না দিয়া কোমরে জড়ানো, কাঁধে একখানা জরী-পাড় সাদা চাদর, মাথার অর্ধেক অংশ কামানো; দাড়ী-গোঁফ তিন-চার দিন

কামানো হয় নাই, কপালে বিভূতি বা সাদা ভস্ম, দুই কানে দুইটি হীরার কানফুল জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে, গলায় একগাছি সোনার হার, দুই হাতে সোনার নিরেট বালা দু'গাছি, খালি পা, গায়ের রঙ্ বেশ কালো। বড়ো-বড়ো সংস্কৃত শব্দে ভরা, খুব স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধরনের তমিলে, বেশ টানিয়া-টানিয়া তাহার বক্তব্য বলিয়া যাইতেছে, যেন সুর করিয়া কিছু পাঠ করিতেছে। দুই চারিটি সংস্কৃত কথা কানে লাগিল—"দানম্—পুণ্যকর্ম্মম্ (হসন্ত-যুক্ত ম-দিয়া শব্দটিকে তমিল করিয়া লওয়া হইয়াছে)—ঈশ্বরক্রুপৈ—দেব-পূজনম্—ধর্মার্থকামমোট্শম্" ইত্যাদি কথা যেন কানে লাগিল। ইহার বক্তৃতা শুনিয়া ভালো করিয়া ইহার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করিলাম। লোকটির হাতে একটি জর্মন্-সিল্ভারের তৈয়ারী ঘট রহিয়াছে; ঘটটির গায়ে প্রচুর সিন্দূর কুঙ্কুম ও চন্দন লেপা, ফুলের মালা জড়ানো, এবং ঘটের মাথায় একটি ঢাকনি আছে, সেটি ঘটের গায়ের সঙ্গে তালা দিয়া আঁটা। বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইল, লোকটি ভিক্ষা চাহিতেছে, দেবসেবার জন্য ভিক্ষা বা চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। লোকটির রঙ্ কালো, কাঁধে পইতা নাই, তাহাতে বুঝা গেল যে, সে ব্রাহ্মণ নহে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে সে ট্রেনের কামরায়-কামরায় ভিক্ষার জন্য ঘুরিতেছে, তাহা বুঝা গেল না। খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিবার পরে, আমাদের অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করিয়া, সে ধাতু-নির্মিত ঘটটি ট্রেনের যাত্রীদের সামনে ধরিতে-ধরিতে গাড়ির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। যতক্ষণ সে বক্তৃতা দিতেছিল, লক্ষ্য করিলাম, ততক্ষণ যাত্রীরা একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত-ভাবে চুপ করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বক্তৃতা-সমাপনান্তে, পাত্রটি লইয়া একে একে উপবিষ্ট যাত্রীদের সমক্ষে আগাইয়া দিতে লাগিল। যাহার সামনে আসিল, পুরুষ বা স্ত্রী নির্বিশেষে সে একটি কি দুইটি পয়সা

কিংবা একটি আনী বা দুয়ানী লইয়া, ঢাকনির মাথায় একটি ছিদ্র ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ঘটের ভিতরে ফেলিয়া দিতে লাগিল। আমরা এই ব্যাপার দেখিতেছিলাম, এবং তিনজনে বাঙ্গালী-সুলভ অশ্রদ্ধার ভাবে বলাবলি করিতেছিলাম—"এই মন্দিরের দেশে, যেখানে যত্র-তত্র বিরাট্-বিরাট্ মন্দিব, আর মন্দিরের সেবার জন্য তার উপযুক্ত জমিদারী আর অন্য বন্দোবস্তের ছড়াছড়ি, সেখানে দেবতার পূজার খরচের জন্য গরীব যাত্রীদের উপর এই ট্যাক্স বসানো কেন বাবা"—ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ট্রেনের কতকগুলি যাত্রীর দান লইয়া ঘট-হস্তে সে আমাদের সামনে উপস্থিত। পয়সা পড়িলে সে একটি আশীর্বচনের মতো তমিল বাক্য সুর করিয়া বলিতেছে, কেহ কিছু না দিলেও সেরূপ অন্য বাক্য বলিয়া প্রশান্ত মুখে অন্যত্র যাইতেছে। আমাদের সামনে আসিতেই আমরা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলাম, কিছু হইবে না—আমাদের মুখে যেন লেখা ছিল—"মাফ করো বাবা।" দ্বিরুক্তি না করিয়া পাত্র লইয়া অন্য যাত্রীদের সামনে গিয়া সে খাড়া হইল।

ট্রেনে আমাদের পিছনকার বেঞ্চে একটি তমিল সহযাত্রী ছিল। লোকটির সঙ্গে দুই-একটি কথা হইয়াছিল, হিন্দীতে। অতি সাধারণ মানুষ সে। আমরা কী করি সে দেখিতেছিল। আমাদের মধ্যে বোধ হয় অশ্রদ্ধার ভাবটা একটু বেশী করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া বলিল—"মহারাজ, ইয়ে আদমী ক্যা বোলা, আপ সম্‌জা নেই?" আমি বলিলাম—"নেহি। উ কৌন্ হৈ? পূজাকে ওয়াস্তে ভীখ মাঙ্গতা হৈ ন? ব্রাম্‌হণ তো নেহি?" লোকটি বলিল—"নেহি মহারাজ, নেহি। উও এক বড্ডা চেট্টি হৈ। তীন-চার জগহ্ মেঁ উস্‌কা তীন-চার গাদী (গদ্দী) হৈ। বহুৎ রূপেয়াকা মালিক হৈ। কঈ লাখ রূপেয়া খরচ কর্‌কে এক মন্দিল্ বনায়েগা। সব রূপেয়া আপ হী আপ দেগা। পর, ভিট্‌শা

(ভিক্ষা) কে ওয়াস্তে নিকলা হৈ। সব আদমীসে এক পয়সা, দো পয়সা লেগা, কলস ভরতী হো জায়গা। তব রূপেয়া পূরা কর্‌কে মন্দিল্ বনায়েগা। সব লোগকে দান ঔর মদদ্ সে মন্দিল্‌কা কাম পূরা করেগা। অপনা পুণ্য কাম মেঁ সব্‌কু সরীক বনায়েগা। এসা করনা বহুত অচ্ছা হৈ, ইসীসে সব কোঈ দেতা হৈ।”

ব্যাপারটা বুঝিলাম, চোখের সামনেকার পরদা যেন কেহ তুলিয়া দিল। বহুলক্ষ-টাকার মালিক শ্রেষ্ঠী, তিন-চারটি বড়ো-বড়ো গদীর মালিক,—তমিল দেশের চেট্টি বা শ্রেষ্ঠীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে তাঁহার ইষ্টদেবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তিন-চার লক্ষ টাকা খরচ করিবেন। কিন্তু এই পুণ্য কাজ তাঁহার একার নহে। সমস্ত সমাজের অনুকম্পা ও সহায়তা তিনি চাহেন। সকলেই তাঁহার এই পুণ্য-কর্মে অংশ-গ্রহণ করুক, ইহা-ই তাঁহার প্রার্থিত। তাই, তাঁহার যে ব্যয় হইবে, তাহা সম্পূর্ণ করিবেন—ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা। কলসটি পূর্ণ করিয়া যে টাকা পয়সা হইবে, তাহা যেন তাঁহার নিজের আহৃত অর্থের উপরে রাখিয়া তিনি তাহার পূরণ করিবেন। এই জন্য তিনি ধাতুময় ঘট লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, প্রস্তাবিত পুণ্য-কর্মের কথা সকলকে বলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছেন। লোকে নাম-মাত্র দান দিতে পাইয়াও কৃতার্থ হইতেছে।

এই ব্যাপারটির পিছনে যে কতখানি বিনয় ও দীনতা-বোধ আছে, দেশের ও দশের প্রতি কতটা সম্মাননা ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইল, এবং সর্বোপরি ইহাতে নিজ উপাস্যের প্রতি কতটা ভক্তি-ভাব আছে, তাহা ভাবিয়া আমার চোখে জল আসিল। আমরা উঠিয়া গিয়া আমাদের যৎকিঞ্চিৎ দুই-এক আনা দান সসম্ভ্রমে পাত্রের মধ্যে দিয়া আসিলাম, নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। হৃদয়ের অজ্ঞাতসারে এই কাজের সার্থকতার জন্য এক প্রার্থনা আমার গভীর

অন্তস্তল হইতে জাগিয়া উঠিল, এবং এক অব্যক্ত আকুলতা আসিয়া আমার প্রাণকে পূর্ণ করিল। মনে-মনে আমি শঙ্কর-নারায়ণকে প্রণাম করিলাম।

ইতিমধ্যে পরের স্টেশন আসিয়া গেল। ভিক্ষুক চেট্টি আমাদের গাড়ি হইতে নামিয়া গেলেন॥

এই দক্ষিণ-ভ্রমণে আমার সহযাত্রী ছিলেন পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার এবং আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার।

গাড়োয়ান

গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই বৎসর দিল্লী থেকে হরিদ্বারে গিয়েছিলুম। দিল্লী আর হরিদ্বার, এই দুই শহরের মাঝে আ'জ-কা'ল বাস্ চলে। বাসের ব্যবস্থা খুবই ভালো। সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিলেন। সকাল সাতটায় দিল্লী থেকে রওনা হ'য়ে, অতি আরামে বেলা পৌনে একটার মধ্যে হরিদ্বার পৌঁছানো গেল। হরিদ্বারে পৌঁছে, আমরা পূর্বের ব্যবস্থা মতো কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উঠি। সেখানে ছোটো একটি অতিথিশালা আছে। আশ্রম-পরিচালক সন্ন্যাসীদের অনুগ্রহে সেখানে ভদ্র-সজ্জন দুই-চারি দিনের জন্য আশ্রয় পেতে পারেন। এই আশ্রমটি হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে কিছু দূরে, কনখল দক্ষঘাট যাবার পথে অবস্থিত। দক্ষঘাট থেকে ব্রহ্মকুণ্ড যাবার জন্যে যান-বাহনের মধ্যে আছে ঘোড়ার তাঙ্গা অথবা সাইকেল-রিক্‌শা। একদিন আমরা আশ্রমের দুইজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিকটে অন্য এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম দেখ্‌তে যাই। এই আশ্রমটির নাম "শ্রীগুরুমণ্ডল"। এখানে সংস্কৃত হস্ত-লিখিত পুঁথির একটি সংগ্রহ আছে। তন্মধ্যে একখানি অতি সুন্দর, রাজপুত শৈলীতে আঁকা বহুবর্ণে রঞ্জিত চিত্র-সম্ভারে পূর্ণ নাগরী লিপিতে লিখিত হরিবংশের বিরাট্ পুঁথি বিশেষ দর্শনীয় ছিল। স্বামী শ্রীযুক্ত সর্বাত্মানন্দ ও শ্রীযুক্ত হৃষীকেশানন্দ সঙ্গে থাকাতে, শ্রীগুরুমণ্ডলের সন্ন্যাসীরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে আমাদের ঐ পুঁথি আর অন্য বই দেখান। তারপরে সেখান থেকে স্বামীজীরা আমাদের "নীল ধারা" নামে গঙ্গার এক শাখা দেখাতে নিয়ে যান। দুই ধারে পাথরের নুড়ীর স্তূপের মধ্য দিয়ে কুলুকুলু-রবে ছোটো খাতের মধ্য দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। মানুষের ভীড় নেই, দৃশ্য অপূর্ব, শান্তিতে মন ভ'রে যায়।

ফের্‌বার সময় সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়। আমরা তাঙ্গা ক'রে আশ্রমে ফিরে আস্‌বো স্থির ক'র্‌লুম। একখানা পথ-চল্‌তি তাঙ্গা স্বামীজীরা ডাক্‌লেন, ভাড়া আট আনা স্থির হ'ল, আমাদের চারজনকে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নিয়ে যাবে। আমরা চারজনে তাঙ্গায় চ'ড়্‌লুম। স্বামীজীরা সামনে ব'স্‌লেন, আমার স্ত্রী আর আমি পিছনে।

তখন তাঙ্গাওয়ালার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌লুম। সাধারণ গাড়োয়ানের মতো আকার-প্রকার নয়। তাঙ্গাওয়ালা ছেলে-মানুষ, বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়। অতি সুন্দর গৌর-বর্ণ চেহারা, চাঁদের মতো ছেলে, রাজপুত্রের মতো দেখ্‌তে। পরণে ময়লা পাঠানদের শালোয়ার বা ঝল্‌ঝলে' পায়জামা। গায়ে একটা ময়লা সাদা কামিজ, আর মাথায় একখানা গামছার মতো ডোরা-কাটা কাপড়, পাগ্‌ড়ি ক'রে জড়ানো, তা'তে তার গুচ্ছ-গুচ্ছ কোমল কেশ পূরোপূরি ঢাকা পড়ে নি। সুদীর্ঘ নাক, বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত মুখশ্রী। আমার স্ত্রী ও আমি তাকে দেখেই বুঝ্‌লুম যে, সে কোনও ভদ্রঘরের ছেলে, বাস্তুহারা শরণার্থী হ'য়ে হরিদ্বারে এসে আশ্রয় নিয়েছে—পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে সে এসেছে।

ছেলেটি সামনের দিকে স্বামীজীদের পায়ের কাছে চুপ ক'রে ব'সে গাড়ি চালিয়ে' যাচ্ছিল। আমার স্ত্রী আমায় ব'ল্‌লেন, "আহা ছেলেটিকে দেখ্‌লেই মায়া হয়—খবর নাও, কি ভাবে পালিয়ে' এসেছে, ঘরে ওর কে আছে।" ছেলেটিকে তখন আমি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। সে উত্তর দিলে, প্রচুর উর্দূ-মিশ্রিত হিন্দীতে, যে ধরণের আরবী-ফারসী-শব্দ-মিশ্রিত হিন্দী বা উর্দূ পাঞ্জাবের হিন্দু শিখ মুসলমান সকলেই বলে। ছেলেটি ব'ল্‌লে,—তার বাড়ি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কোহাটে। জাতি শুধাতে ব'ল্‌লে—ব্রাহ্মণ, সারস্বত শ্রেণীর। কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে' এসেছে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "দেশে কী ক'র্‌তে ?" একটু হেসে ব'ল্‌লে, "বাবুজী, তাঙ্গার

কাজ কখনও করিনি—স্টুডেণ্ট বা ছাত্র ছিলুম।” আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস ক’র্‌লেন, “বেটা, তোমার বাবা-মা আছেন ?” উত্তরে সংক্ষেপে কেবল ব’ল্‌লে, “পিতা অওর মাতা, দোনো গুজর গয়ে—বাপ-মা দুজনেই মারা গিয়েছেন।” কী ক’রে মারা গিয়েছেন জিজ্ঞেস করাতে, মাত্র দুটি কথায় ব’ল্‌লে—“মারে গয়ে, অর্থাৎ তাদের মেরে ফেলেছে।” দেখ্‌লুম বেশী কথা ব’ল্‌তে অনিচ্ছুক। একটি বড়ো ভাই আছে, তারা দু’জনে হিন্দুস্থানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ‘শর্‌ণার্থী’ হ’য়ে এসেছে। অন্য ভাই আর বোন কেউ আছে বা ছিল কিনা জিজ্ঞেস ক’র্‌তে, সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু ব’ল্‌তে চাইলে না। একটু জোর ক’রে জিজ্ঞেস ক’র্‌তে ব’ল্‌লে—“দুটি বোন ছিল, দো বহনেঁ থীঁ, তাদের আগেই ভারতবর্ষে পাঠানো হ’য়েছে—ওএ পহলেহী হিন্দুস্থান ভেজী গয়ীঁ।” অনুমানে বুঝ্‌লুম, এখানেই তার মনে গুরুতর ব্যথা—মনে হ’ল, বোনদের উদ্ধার ক’রে নিয়ে আস্‌তে পারে নি; কিন্তু সে বুক-ফাটা দুঃখ নিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে অলোচনা ক’র্‌তে চায় না।

আমাদের কথায় সহানুভূতির ভাব পাওয়াতে, তাকে জিজ্ঞাসা করায়, নিজের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা সে ব’ল্‌লে। তার ভাই অসুস্থ, এক “শর্‌ণার্থী-ডেরা” বা রিফিউজি-ক্যাম্পে আছে, হরিদ্বার থেকে দূরে কী একটা জায়গায়, তার নামটা ভুলে যাচ্ছি। রিফিউজি-ক্যাম্পে বেকার ব’সে থেকে থেকে তার আর ভালো লাগ্‌ছিল না; তাই সে ভাইকে ব’লে বেরিয়ে’ এসেছে, যদি নিজের চেষ্টায় কিছু উপার্জন ক’র্‌তে পারে। তিন-চার মাস এখানে-ওখানে ঘুরে কিছুই সুবিধা হয় নি। শেষে তার নিজের জেলার একজন চেনা লোককে হরিদ্বারে খুঁজে বা’র ক’রেছে, খানকয়েক তাঙ্গার মালিক হয়েছে সে। এই লোকটিও তারই মতো সীমান্ত-প্রদেশের শরণার্থী হিন্দু। অন্য উপায় না পেয়ে, অগত্যা এই তাঙ্গা-চালানোর কাজ নিয়েছে, ভাড়া খাটিয়ে’ যা পায় তা বন্ধুকে দেয়, বন্ধু তার খাওয়া-পরার ভার

নিয়েছে, আর কখনো-সখনো দু-টাকা পাঁচ-টাকা তাকে দেয়। এই-ভাবে সে এখন হরিদ্বারে কাটাচ্ছে। তবে সে আশা করে, চিরকাল এ রকমটা থাক্‌বে না—"পর্‌মাৎমা" উদ্ধারের একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই তাকে দেখিয়ে' দেবেন। স্বামীজীরাও তার সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমাদের সকলের কাছ থেকে এই হৃদ্যতা পেয়ে, সে মন খুলে দু-চারটে কথা আমাদের ব'ল্‌লে। প্রধান কথা হ'ল তার—গান্ধী-বাদের অন্তর্গত মুসলমান-তোষণ-নীতির নিন্দা; আর কংগ্রেসের ব্যবস্থার জন্যই ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণ হ'য়েছে ব'লেই পাঞ্জাব আর সীমান্তের আর সিন্ধু-প্রদেশের হিন্দুদের যতো দুরবস্থা, যতো সর্বনাশ। পথে দিল্লী থেকে হরিদ্বার আস্‌বার সময়ে আমাদের বাসের সহযাত্রী কতগুলি শিখ মেয়ের মুখে স্বাধীনতা-দিবস সম্পর্কে মন্তব্য শুনেছিলুম, —"য়হ্ আজাদী নহীঁ—য়হ্ বরবাদী হৈ—অর্থাৎ এ স্বাধীনতা নয়, এ হ'চ্ছে বিনাশ।" ছেলেটির-ও মুখে অনুরূপ কথা।

সীমান্ত-প্রদেশ প্রায় হাজার বছর ধ'রে বিদেশী আর স্বদেশী মুসলমানের দ্বারা শাসিত হ'য়ে এসেছে, কিন্তু তবুও এখানকার হিন্দুদের মন থেকে হিন্দু ভাবধারা, হিন্দু চিন্তা বিনষ্ট হয় নি। বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ-ঘরের হিন্দুদের মনে হিন্দু চিন্তা আর শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি আস্থা অভাবনীয়-রূপে বজায় আছে—তার প্রমাণ অন্যত্র আমি পেয়েছি। এই ইস্কুলের ছেলে আমাকে ব'ল্‌লে, "বাবুজী, এরা যে অহিংসা প্রচার করে, সেটা কি গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ যে অহিংসা শিখিয়েছেন, সেই বস্তু? এ তো অহিংসার নাম ক'রে কেবল 'কায়রপন' অর্থাৎ ভীরুতারই সাধনা; এ শিক্ষায়, মা'র খেতে-খেতে ক্রমে যে the will to resist—the power to beat back (অর্থাৎ বাধা দেবার ইচ্ছা, আর অত্যাচার দূর করবার শক্তি), এই দুই-ই নষ্ট ক'রে দেয় (বেশ ভালো উচ্চ রণে ছেলেটি এই দুটি ইংরিজি বাক্য ব'ল্‌লে)। সে যা হোক্ বাবুজী, আমাদের সব

ছিল—সব-ই গিয়েছে, আর. কি সে দেশে ফির্‌তে পার্‌বো? যদি কখনো ফিরি, তো 'গোলামীকে জরিয়ে' অর্থাৎ দাসত্বের রীতিতে ফির্‌তে চাই না; যদি ফিরি, তো পিতৃভূমি আবার জয় ক'রে নেবার মতলব ক'রে 'ফাতেহ্' বা বিজয়ী হ'য়েই ফির্‌বো। এখন যতদিন কর্মফল আছে, ভুগ্‌বো—উপায় কী?"

ছেলেটির কথাগুলি আমার ভালো লাগ্‌ছিল। মনে-মনে কেবল এই কথাই জাগ্‌ছিল—ভগবান্, এ কি তোমার বিধান? এরকম কতো হাজার সোনার-চাঁদ ছেলে মেয়ে আর এ অবস্থায় প'ড়েছে, বিনা দোষে কতো হাজার হাজার পরিবার এ-ভাবে ধ্বংসের পথে চ'লেছে—উত্তর-পশ্চিম ভারতে, পূর্ব-ভারতে।

ইতিমধ্যে সেবাশ্রমের ফটকের সামনে তাঙ্গা এসে পৌঁছুলো। আমরা সেখানে নেমে প'ড়্‌লুম। তার প্রাপ্য ভাড়া আট আনা পয়সা আমি তাঙ্গাওয়ালা ছেলেটির হাতে দিলুম। আমার স্ত্রী একটি টাকা নিয়ে ছেলেটির হাতে দিলেন আর ব'ল্‌লেন, "বেটা, তুম্ লো।" টাকাটি পেয়ে ছেলেটি ব'ল্‌লে, "য়হ্ ক্যা হৈ মাঈজী?" আমার স্ত্রী ব'ল্‌লেন্, "বেটা, ইস্‌সে কুছ মিঠাঈ খানা।" তা'তে ছেলেটি—"নহীঁ মাঈজী, রূপয়া নহীঁ লূংগা—আপ ওয়াপিস লীজিয়ে—টাকা নেবো না মা, আপনি ফিরিয়ে' নিন্"—ব'লে হাত বাড়িয়ে কাগজের নোটখানা ফেরত দিতে চায়। আমার স্ত্রী তখন ব'ল্‌লেন, "বেটা, যদি তোমার মা তোমাকে টাকা দিতেন, তা হ'লে তুমি তো আপত্তি ক'র্‌তে না। আমি তোমার মায়ের মতো। এই সামান্য একটা টাকা দিচ্ছি—তুমি কিছু খেলে আমি খুশী হবো।" আমার শ্বশুরবাড়ি গয়া ও পাটনায়; সমগ্র উত্তর-ভারতে সকলের বোধগম্য কাজ-চালানো হিন্দী, বিহার-প্রদেশের মেয়ে ব'লে আমার স্ত্রী ব'লতে পারেন।

তখন ছেলেটি টাকাটা নিলে, তার ময়লা কামিজের বুক পকেটে রাখ্‌লে। আমার স্ত্রী আর আমি লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লুম, তখন তার গাল ব'য়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে চোখের জল প'ড়্‌ছে। এদিকে আমার স্ত্রীও কাঁদছেন।

গাড়োয়ান আর কিছু না ব'লে ঘোড়া·র পিঠে চাবুক মেরে তাঙ্গা হাঁকিয়ে' চ'লে গেল—সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে রাস্তার বাঁকে তাঙ্গার সঙ্গে তার চালক ছেলেটিও নেত্র-পথের বাইরে চ'লে গেল। আমার স্ত্রী চোখ মুছ্‌তে-মুছ্‌তে বাসায় ফির্‌লেন।

এই ঘটনার কথা আমাদের মধ্যে উঠলে, আমার স্ত্রী ও আমি আমাদের দু'জনের মনে একটু আফ্‌সোস হয়, তাড়াতাড়িতে আমরা ছেলেটির নাম ঠিকানা নিতে পারি নি। সে কোথায় আছে, কী ক'র্‌ছে, যা-ই করুক যেখানেই থাক্‌, তার ভালো হোক্‌ উন্নতি হোক্‌, এই প্রার্থনা আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৬

কাবুলীওয়ালা সহযাত্রী

ব্যাপারটা খুব সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে শীতকালে ঘ'টেছিল—বছর আর তারিখটা ঠিক-মতন মনে প'ড়্ছে না। শ্বশুরালয় গয়া থেকে ফির্ছি। দেহ্রা-ডুন এক্সপ্রেস ধ'র্বো। রাত্রি সাড়ে-আটটা ন'টার দিকেতে এক্সপ্রেস গয়াতে পেঁাছায়, তার পরদিনে ভোরবেলায় ক'লকাতায় নামিয়ে দেয়। সঙ্গে একখানি মধ্যম শ্রেণীর রিটার্ন টিকিটের ফির্তি অংশ আছে। মাল-পত্র নেই, কেবল একটা বালিশ, চাদর ও কম্বল। রবিবার রাত্রের ট্রেনে গয়া থেকে বেরিয়ে', সোমবার ভোরে ক'লকাতায় পৌঁছাবো। সোমবারের দিন-ই ক্লাস নিতে হবে, সুতরাং আমার রবিবারের গাড়িতে আসা চাই-ই।

ইষ্টিশানে পৌঁছে দেখ্লুম, ট্রেন যথাকালে এলো, কিন্তু কেন জানি না, গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভীড় দেখ্লুম। মধ্যম শ্রেণীর কোনও কামরায় তো ঢুক্তেই পারা যায় না, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলিতেও লোকে মেঝেতে বিছানা ক'রে নিয়ে, কোথাও বা ব'সে দাঁড়িয়ে' যাচ্ছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতেই হক, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই হোক, মধ্যমেই হোক, আর তৃতীয় শ্রেণীতেই হোক, আমাকে কোনো রকম ক'রে ফিরে যেতেই হবে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলির অবস্থা দেখে কোনো গাড়ির কাছে যেতে সাহস হ'ল না। লোকে জানলা দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুক্ছে, জানলা দিয়ে নাম্ছে। দরজা বন্ধ, ফলে কেউ ভিতরে ঢুক্তে পার্ছে না। এই ট্রেনটি গয়াতে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। সমস্ত ট্রেনটা একবার ঘুরে দেখ্বার মতলবে ইঞ্জিনের দিকে চ'লেছি, এমন সময় দেখি, একটা বড়ো তৃতীয় শ্রেণীর 'বোগি'র কাছ একেবারেই লোকের ভীড় নেই। অন্য সব গাড়িতে

ঢুক্‌বার জন্য প্রায় মারামারি হ'চ্ছে, কিন্তু এই গাড়ির কাছটায় প্লাটফর্ম যেন একেবারে খালি। গিয়ে দেখি, এই বিরাট্ গাড়িখানি গুটিকতক কাবুলিওয়ালার দখলে। তারা সংখ্যায় জন পনেরোর বেশী হবে না, কিন্তু এই বিরাট্ 'বোগি'টি তারা নিজেরা দখল ক'রে ব'সে আছে। কেউ সেখানে গেলে, বা জানলা দিয়ে উঁকি মার্‌লে, হুংকার ছাড়্‌ছে—"ইয়ে গাড়ে তোমারা ওআস্তে নেহি—জো তুম উদর্।" জবরদস্ত চেহারার কাবুলীওয়ালারা এই হুংকার দ্বারা লোক ঠেকিয়ে' রাখ্‌ছে। যাত্রীরা ব্যাপার দেখে সেখানে আর ভিড়্‌ছে না। রেলের কোনও কর্মচারী বা পুলিস এর ত্রি-সীমানাতেও ঘেঁষ্‌ছে না।

সমস্ত ট্রেনটি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এসে দেখ্‌লুম, যেতে হ'লে আমাকে এই গাড়িতে উঠে কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গেই যেতে হবে। তখন ঠিক ক'র্‌লুম, এই গাড়িতেই ঢুক্‌বো, আর ওখানেই জায়গা ক'রে নেবো। আমার সাহস হ'চ্ছে খালি এইজন্য যে, আমি দু-চারটি ফারসী কথা ব'ল্‌তে পারি। কাবুলিওয়ালারা, যারা খাস আফগানিস্থানের বাসিন্দা, যারা বিশেষতঃ কাবুল শহরের লোক, তারা সকলেই ফারসী জানে। ফারসী হ'চ্ছে আফগানিস্থানের শিক্ষিত জনের ভাষা, উচ্চ ও ভদ্র সমাজের ভাষা, সরকারী ভাষা। অন্ততঃ তখন তা-ই ছিল। কাবুলীওয়ালা পাঠানদের মাতৃভাষা পশ্‌তুর সম্মান তখন ছিল না। পশ্‌তু-ভাষীরাও নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ব'ড়ো একটা পোষণ ক'র্‌ত না। একে তো পশ্‌তু-ভাষী লোকেদের মধ্যে শিক্ষা আর সংস্কৃতির অভাব, আর তার উপরে তাদের ভাষায় সাহিত্যও তেমন নেই। তা-ছাড়া, এখন আফগানিস্থান ব'ল্‌তে যে দেশ বুঝায়, তার অনেকটা জুড়ে সাধারণ অধিবাসীরা ঘরে ফারসী-ই বলে, পশ্‌তু বলে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে পাঠানরা থাকে, তাদের মধ্যে ফারসীর জ্ঞান

ততটা নেই, ফারসী-জানা লোকও কম। আমার মনে হ'ল, এদের মধ্যে ফারসী-বলাটা যখন একটা শিক্ষা আর আভিজাত্যের লক্ষণ, তখন আমি যদি এদের সঙ্গে ফারসীতে দুই-একটা কথা বলি, তাহ'লে ওরা প্রথমতঃ একটু হক্‌চকিয়ে' যাবে, বাঙালী বাবুর মুখে ফারসী শুনে, আর তারপরে তারা হয়তো আমার জন্য জায়গাও ক'রে দিতে পারে। জবরদস্ত আর মারমুখী হ'লেও, আমি জানি যে এই পাঠানদের মধ্যে আবার একটু শিশু-সুলভ ভাবও আছে। তবুও আমার নিজের মনে যে বেশ-একটু আশঙ্কা ছিল না, তা নয়—কারণ আমার ফারসীর দৌড় খুব বেশী দূর অবধি নয়। ফারসী ভাষা-তত্ত্ব প'ড়েছি; প্রাচীন পারসীক আর অবেস্তার ভাষা, আর পহ্‌লবী ভাষার চর্চা কিছুটা ক'রেছি, তা নিয়ে একটু অধ্যাপনাও ক'রেছি; রোমান অক্ষরে ছাপা দু'চারখানা ফারসী গল্পের বই প'ড়েছি, কিছু কবিতার বইও প'ড়েছি;—এইটুকু জানা-ই আমার সম্বল। কিন্তু একটানা লম্বা কথাবার্তা চালিয়ে' যাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। তবু, আমাকে এই গাড়িতে ফির্‌তেই হবে, কাজেই কপাল ঠুকে কাবুলীওয়ালাদের কেল্লা-স্বরূপ এই গাড়িকে আমক্রণ করাই ঠিক ক'র্‌লুম।

সোজা গিয়ে গাড়ির হাতল ধ'রে—দরজাটা আধ-খোলা ছিল—আরো টেনে খুলে, ভিতরে ঢুক্‌তে যাবো, এমন সময় পাঁচ-ছয় জন গুরুগম্ভীর স্বরে হুংকার দিয়ে উঠ্‌ল—"কি-দর আতে হো? ইয়ে গাড়ে তুম লোগ-কে ওয়াস্তে নেহি, সির্ফ হম পঠান-লোগ ইসমেঁ জাতে হৈঁ।" আমি এর জবাব দিলুম ফারসীতে—"ম-রা জগহ্‌ বি-দেহ্‌, বরায়ে সির্ফ য়ক্‌ আদমী।" অর্থাৎ, আমাকে জায়গা দাও, খালি একজন মানুষের জন্য। যা অনুমান ক'রেছিলুম—ওরা একটু যেন হতভম্ব হ'য়ে গেল। একজন আমার কথা বুঝ্‌তে না পেরে ব'ল্‌লে—"ক্যা মাঙ্গতা?" আমি আবার ফারসীতে ব'ল্‌লুম—"ফারসী

ন-মী-দানী ? ফারসী ন-মী-গোয়ী ?" অর্থাৎ, ফারসী জানো না ? ফারসী ব'ল্‌তে পারো না ? খুব সম্ভব এদের মধ্যে ফারসী-জানা লোক ছিল না। তখন আমি নিজের গলাটা চড়িয়ে একটু উপহাসের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে' ব'ল্‌লুম—"অজ্‌ চি তর্ফ-ই-অফঘানিস্তান্‌ মী-আমদী, কি দর-জ়বান-ই- ফারসী গুফৎ-গ্‌ কর্দনে, তাকৎ-ই-শুমা নীস্ত্‌ ?"—আফগানিস্থানের কোন্‌ অঞ্চল থেকে আস্‌ছো যে ফারসীতে কথা বল্‌বার ক্ষমতা তোমাদের নেই ? যখন তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'র্‌ছে, তখন গাড়ির ভিতর থেকে একটি ছোকরা ব'ল্‌লে—"ম্যান্‌ ফওর্‌সী মী-দওনম্‌ ; চি খাহী ?" অর্থাৎ আমি ফারসী জানি—কী চাও ? আমি উত্তর দিলুম—"মন গুফ্‌তা বুদম্‌—ম-রা জগহ্‌ বি-দেহ্‌।"—আমি তো ব'ল্‌লুম, আমাকে জায়গা দাও। তখন সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"কুজা মী-রভী ?"—অর্থাৎ কোথায় যাবে ? জবাব দিলুম—"দর্‌ শহ্‌র্‌ কল্‌কত্তা বি-রভম্‌।"—ক'লকাতা শহরে যাবো।

এতক্ষণ আর সব কাবুলিওয়ালারা ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখ্‌ছিল, আর এতে একটু নূতনত্ব তাদের কাছে ঠেক্‌ল। তখন পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ী ক'র্‌তে লাগ্‌ল। ইশারায় দলের অনুমতি পেয়ে, ফারসী-বলিয়ে' ছোকরাটি ব'ল্‌লে—"ব্যালে, অ্যান্দর বি-অও"—আচ্ছা, ভিতরে এসো। আমি ভিতরে ঢুক্‌তেই, সেই বিরাট্‌ 'বোগি'র একটা পূরো বেঞ্চি এরা খালি ক'রে আমাকে ছেড়ে দিলে। তার সঙ্গে একটুখানি সমীহ করার ভাবও ছিল, যেন এক মস্ত আলেম এসেছেন। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

প্রথম ধাক্কা তো সাম্‌লালুম। তারপর ? যদি এরা বাস্তবিক-ই ফারসী-বলিয়ে' হয়, তাহ'লে তো আমার সিংহ-চর্মের তলায় অন্য চর্ম দেখা যাবে। কিন্তু গুরু-বলে রক্ষা পেলুম ; বুঝ্‌তে পারা গেল, এরা সবাই হ'চ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর

Pathan Tribal Area অর্থাৎ ইংরেজদের অধীনস্থ পাঠান উপজাতি-অঞ্চলের লোক, খাস কাবুলীর মতন সাধারণতঃ এরা ফারসী জানে না। এটা আমার পক্ষে ভারি সুবিধার আর স্বস্তির কথা হ'ল, কারণ ওদের সঙ্গে বাকী যা আলাপ হ'ল, প্রায় সবই হিন্দুস্থানীতে, আর বাঙ্‌লায়। দুই-এক জন মাঝে-মাঝে এক-আধ লব্জ ফারসী ব'ল্‌লে বটে, কিন্তু এদের বিদ্যেও বেশী দূর এগোলো না।

ট্রেন চ'ল্‌ছে। চারদিকে বেশ ক'রে তাকিয়ে' নিলুম, প্রায় ষোলো জন পাঠান মর্দ এই গাড়ির যাত্রী। সমস্ত গাড়িখানা বাসি কাপড়-চোপড়, দেহের ঘর্ম আর তার সঙ্গে হিঙ্‌-এর উগ্র গন্ধে ভরপূর। এই অপূর্ব সৌরভের সংমিশ্রণ--কড়া-ভাবে আমার নাসারন্ধ্রকে আক্রমণ ক'র্‌লে। যাক, শোবার তো জায়গা পেয়েছি, চাদর পেতে বালিশ রেখে কম্বল বিছিয়ে' বিছানা ক'রে নিয়ে ঠিক হ'য়ে এবার ব'স্‌বো। দেখি, এদেরও ইচ্ছা, আমার সঙ্গে একটু আলাপ করে। একটুখানি দূরে, উপরের বাঙ্কের উপরে শয়ান একটি বৃদ্ধ পাঠান, আমাকে ঢুক্‌তে দেখে, শোয়া অবস্থা থেকে উঠে খাটন-মালা হ'য়ে আসন নিয়ে ব'সেছিল—টঙ্‌-য়ের উপব থেকে আমাকে নিবিষ্ট-চিত্তে দেখে একটুখানি পরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"বাবু, বাঙ্‌লাদেশের থুন্‌ নি আইছ—তুমি কি বাঙ্‌লাদেশ থেকে এসেছ?" আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—"আগা-সাহেব, তোমার ব্যবসা কোথায়? বাঙ্‌লাদেশে তোমার ডেরা কোথায়?" বৃদ্ধ পাঠানটি ব'ল্‌লে—"পডুয়াহালি। বাবু, দ'ান্‌ নি ব'ালো 'অইছে—ধান ভালো হ'য়েছে কি?" বুঝ্‌লুম, আগা-সাহেবের ব্যবসা হ'চ্ছে শীতবস্ত্র আর হিঙ্‌ বিক্রী করা, আর চাষীদের টাকা ধার দেওয়া। বাঙ্‌লার পল্লী-অঞ্চলে, বরিশালের পটুয়াখালি বন্দরে তাঁর কেন্দ্র। পরে তাঁর সঙ্গে

কথা ব'ল্‌লুম—দেখ্‌লুম, তিনি বরিশাইল্যা ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতনই ব'ল্‌তে পারেন, ক'লকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। একজন পাঠান একটু আর্‌তি ক'রে আমায় ব'ল্‌লে—"বাবূ, তুম ডরো মৎ, অগর কোঈ পুছেগা কি তুম্ বঙ্গালী পাঠানোঁকী গাড়ী মেঁ বরকে কাহে সৈর করতে হো, তো হম লোগ বোলেগা, উও হমারা বাবূ হৈ, হমারা হিসাব লিখ্‌তা হৈ।" তার দরদ দেখে খুশী হ'লুম—যাতে আমি সগৌরবে এদের সঙ্গে চ'ল্‌তে পারি, এদেরই যেন একজন হ'য়ে, সেইটি তাদের ইচ্ছে।—আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ক'লকাতার "কাবুলী ব্যাঙ্ক"-এর হিসাব-নবীস কেরানী বা ম্যানেজারের মর্য্যাদা দিলে।

আমি ব'সে-ব'সে এদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। এরাই সে বিষয়ে বেশী আগ্রহান্বিত। যারা-যারা লম্বা হ'য়ে উপরের বাঙ্কে শুয়ে ছিল, তারা প্রায় সবাই উঠে ব'স্‌ল, আমাকে নিরীক্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌ল। আমি একটু আত্মীয়তা ক'রে একজনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—"আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে গাইয়ে'-বাজিয়ে' লোক আছে—আপলোগোঁমেঁ গবৈয়া কোঈ হৈ?" কাবুলীওয়ালাদের মধ্যে গায়কের সন্ধান ক'র্‌ছি—ব্যাপারটা এদের কাছেও একটু অপ্রত্যাশিত। একজন এক কোণ থেকে এ-কথা শুনে ব'ল্‌লে—"আপ গানেকা শৌকীন হৈঁ? কৌন-সা গানা স্থনেঙ্গে?" আমি ব'ল্‌লুম—"তোমরা কেউ খুশ্‌-হাল খাঁ খট্টকের গজল জানো?" খুশ্‌-হাল খাঁ খট্টক হ'চ্ছেন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ের মানুষ, পাঠানদের পশ্‌তু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তা'তে একটি পাঠান, যে উপরের বাঙ্কে ব'সে ছিল, ভারী খুশী হ'ল, আর উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ব'ল্‌লে—"খুশ্‌-হাল খাঁ খট্টকের গজল শুন্‌বে? বাবু, দেখ্‌ছি তুমি আমাদের সব খবর-ই জানো। আচ্ছা, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।" এই ব'লে সে পাঠান কবি খুশ্‌-হাল খাঁ খট্টকের পশ্‌তু ভাষায় রচিত গজল

ধ'র্‌লে। একটা ফারসী প্রবাদ আছে—"আরবী আকল, ফারসী শকর ; হিন্দী নমক, তুর্কী হুনর ; ওঅ বরায়ে পশ্‌তো, আওয়াজ্‌-এ-খর।" অর্থাৎ আরবী হ'চ্ছে জ্ঞান, ফারসী চিনি ; হিন্দী নূন, আর তুর্কী হ'চ্ছে হুনর বা শিল্প ; আর পশ্‌তুর কথা ধ'র্‌লে,সেটা হ'চ্ছে গাধার ডাক। কিন্তু এই ফারসী প্রবাদটি, আশা করি পশ্‌তু যার মাতৃভাষা এমন পাঠানের কাছে কেউ ব'ল্‌বেন না, তা-হ'লে হয়-তো "তাঁর স্বাস্থ্যের হানি হ'তে পারে"। কিন্তু এই প্রবাদটিকে যেন সত্য প্রমাণ ক'রেই, আমার পাঠান গাইয়ে' বন্ধু বিকট আওয়াজে গান ধ'র্‌লেন। ভাবের আতিশয্যের সঙ্গে, কখনও-কখনও কানে হাত দিয়ে, কখনও বুকে হাত দিয়ে, গানের কলি গাইতে লাগ্‌লেন। তারপর ঢাকের বাদ্যি থাম্‌লেই যেমন মিষ্টি লাগে, তাঁর গান থাম্‌ল। ভাষার সব কথা আমার বোঝ্‌বার শক্তির বাইরে, তবে দু-চারটে "মুহব্বৎ" আর "দিল" আর "দর্দ" আর "আশিক" ইত্যাদি শব্দ শুনে বুঝ্‌লুম, এ প্রেমের গান বটে। এই শব্দগুলি না থাক্‌লে, গানের ভিতরের কথা ধর্‌বার সহজ উপায় ছিল না। তিনি একটি গান শোনালেন, আর একটি হয়-তো শোনাতে চাইবেন। আমি তখন অতি সহজ- আর সরল-ভাবে বিষয়ান্তরের অবতারণা ক'র্‌লুম—"বহুৎ খুব, বাহ্বা বেশ ; ধন্যবাদ। পশ্‌তু গজল তো শোনালে ; এখন আদম খান আর দুরখানীর মোহব্বতের কিস্‌সা কেউ জানো?" তাতে পাঠানদের একজনের খুব উৎসাহ হ'ল। ব'ল্‌লে—"কী ব'ল্‌ছ বাবু, আদম খাঁ দুরখানীর কিস্‌সা শুন্‌বে? এ তো দিল-ভাঙ্গা কাহিনী। আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।" এই না ব'লে সে আবার তার কর্কশ যদিও গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে এই কিস্‌সা, কতকটা গান ক'রে আর কতকটা পাঠ ক'রে যেতে লাগ্‌ল।

এইভাবে আমরা দেহ্‌রা-দুন এক্সপ্রেসের সেই থার্ড ক্লাস গাড়িখানিতে যেন এক পশ্‌তু-সাহিত্য-গোষ্ঠী বা সম্মেলন লাগিয়ে'

দিলুম। তবে আমার জানা ছিল যে, এদের ভাষায় সাহিত্যের বইয়ের সংখ্যা এক হাতের আঙুলে গুনে শেষ করা যায়। একটা খোঁজ নিলুম, "গঞ্জ্‌দ-পুখতূন্‌" অর্থাৎ পখ্‌তু-বা পশ্‌তু-ভাষী জাতির ইতিহাস, এই বইয়ের খবর কেউ রাখে কি না। এরা কি ক'রে রাখ্‌বে? এরা দেহাতী লোক, কিছু চাষ বাস করে কিছু তেজারতী বা ব্যবসা করে—তাও হ'চ্ছে আবার মুসলমান ধর্ম মতে হারামের ব্যবসা, সুদ্‌-খোরের কারবার। এরা আর পশ্‌তু ইতিহাসের আর সাহিত্যের কথা কতটাই বা জান্‌বে? তবে এই কথা শুধানোতে এদের মধ্যে আমার পাণ্ডিত্যের পসার আরও বেড়ে গেল।

আমার সামনের বেঞ্চিতে দুই পাঠান সহযাত্রী নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে আলোচনা ক'র্‌ছে, শুন্‌লুম। পশ্‌তু ভাষা বুঝি না, কিন্তু এই ভাষায় প্রচুর ফারসী আর আরবী শব্দ আছে, কাজেই উর্দূটা একটু জানা থাক্‌লে অনেক শব্দ বুঝ্‌তে পারা যায়, আর তার সাহায্যে, কী বিষয়ে আলাপ হ'চ্ছে সেটা বুঝ্‌তে দেরি হয় না। শুন্‌লুম, আমাকে উল্লেখ ক'রে তাদের মাতৃভাষায় ব'ল্‌ছে—এই যে বদ-জাৎ হারাম-জাদ বাঙ্গালী কৌম, এরা খুব ইল্‌ম্‌-দার আর আকল্‌-মন্দ, অর্থাৎ এরা ভারী বিদ্বান্‌ আর বুদ্ধিমান্‌; দেখ্‌ছো না, ইংরেজদের লেখা সব বই প'ড়ে আর ফারসী প'ড়ে, এই বাবু আমাদের সম্বন্ধে কত খবর জানে, মায় আমাদের খাস দেহাতী কথাও কতো জেনে নিয়েছে। বাঙালী জাতির মানুষকে "হারাম-জাদ" আর "বদ-জাৎ" ব'লে সহজ-ভাবে উল্লেখ করার মধ্যে গালাগালির উদ্দেশ্য ছিল না; এটা হ'চ্ছে কথার মাত্রা, কাফের হিন্দু বাঙালীর সম্বন্ধে এ-সব শব্দ প্রযোজ্য ব'লেই এরা মনে ক'রে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু সাদর আত্মীয়তার ভাবও ছিল। একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাঁর ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি আত্মীয়তা দেখিয়ে' যেমন ব'ল্‌তেন, My dear rascals—এ সেই ভাবের কথা।

পাঠান দেশে পাঠানদের মধ্যে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার কথা কোনও বাঙ্‌লা মাসিক পত্রে—বোধ হয় "প্রবর্তক" পত্রিকায়—অনেক দিন আগে প'ড়েছিলুম, সে কথা মনে হ'চ্ছে। এই বাঙালী ভদ্রলোকটি আর তাঁর এক বন্ধু একবার বাসে চ'ড়ে পেশাওয়ার থেকে লাণ্ডী-কোটালের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে পাহাড় থেকে পাঠানেরা গাছ আর পাথর ফেলে রাস্তা বন্ধ ক'রে ঐ বাস্‌ আটকায়, তার পরে বন্দুক-ধারী পাঠান হামলাদার দস্যু দু' পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে দেখে-দেখে জনকতক লোককে গাড়ি থেকে নামিয়ে' নিলে। এদের মধ্যে তিন-চার জন হিন্দু ব্যবসায়ী ছিল—ঐ পাঠান-অঞ্চলের হিন্দু। আর ছিল বাঙালী যাত্রী দুটি। হিন্দু ব'লেই এদেরও ধ'রে নিয়ে চ'ল্‌ল। কেউ আপত্তি ক'র্‌লে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে, আর বন্দীদের ঠেল্‌তে-ঠেল্‌তে আর টান্‌তে-টান্‌তে পাহাড়ে' দেশের মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাই করিয়ে', ঘণ্টা তিনেক হাঁটিয়ে', এক পাঠান গাঁয়ে এনে তাদের হাজির ক'র্‌লে। এদের উদ্দেশ্য, বন্দীদের দিয়ে তাদের আত্মীয়দের কাছে চিঠি লেখাবে—আমাদের ধ'রে এনেছে পাঠানেরা, এত টাকা চায়, পেলে ছাড়ান দেবে, নইলে প্রাণে মার্‌বে। যে যেমন দরের লোক, সেইটে অনুমান ক'রে, ২০০০.৫০০০ টাকা যেমন সুবিধের মনে করে, চেয়ে বসে। দর-দস্তুর ক'রে, শেষটায় একটা আপস-মতো টাকা চেয়ে চিঠি লেখায়, পরে টাকা এলে বন্দীদের খালাস ক'রে দেয়। কখনও-কখনও বহুদিন ধ'রে আটক রাখে, ক্বচিৎ প্রাণেও মেরে ফেলে। ইংরেজরা সব সময়ে কিছু ক'র্‌তে পার্‌ত না; আব এভাবে পাঠানেরা ইংরেজদের ঘাঁটাত' না, হিন্দু বানিয়াদেরই উপর ছিল তাদের লক্ষ্য। যাক্‌, বন্দীদের তো নিয়ে তারা এক গাঁয়ের মাঝে একটা খোলা জায়গায় বসিয়ে' রাখ্‌লে। তার পরে টাকা নিয়ে ছাড

পাবার কথা হবে। ইতিমধ্যে দয়া ক'রে এদের খাবার জন্য পাঠান খাদ্য কিছু এলো—বিরাট্ বিরাট্ গোল আকারের পাঠান রুটি—রুটি নয়, এ হ'চ্ছে "রোটা"—আর ভেড়ার মাংসের কাবাব। পশ্চিম পাঞ্জাবের আর সীমান্ত-প্রদেশের হিন্দুরাও এ-জিনিস খেতে অভ্যস্ত। বাঙালী দু'জনের কাছে এই খাবার এলো, হুকুম হ'ল—"বি-খোর্", অর্থাৎ "খা!"। এঁরা তো একে শ্রান্ত, ক্লান্ত; অনভ্যস্ত খাবারের চেহারা দেখে হাত গুটিয়ে' ব'সে রইলেন। পাঠানরা পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে লাগ্‌ল, "খাও, খাও", যেন খেতেই হবে। তখন এঁদের একজন হিন্দুস্থানীতে ব'ল্‌লেন, "আমরা বাঙালী, এ খাবার আমরা খেতে পারি না।" কথাটা ওদের বুঝিয়ে' দেওয়া হ'ল। যখন তারা শুন্‌লে যে দু'জন বাঙালী বাবুকে তারা ধ'রে এনেছে, তখন তাদের মধ্যে যেন একটা আলোড়ন এসে গেল। সব পরস্পর নিজেদের ভাষায় বলাবলি ক'র্‌তে লাগ্‌ল—এ দু'জন বাঙালী। তখন এদের চেহারা একেবারে ব'দ্‌লে গেল। সকলে এসে এঁদের সঙ্গে ইংরিজি কায়দায় শেক্-হ্যাণ্ড করে আর খুব আর্‌তি দেখায়, আর বলে, "এই বাঙ্গালী, তুম্ হম্ বাই।"—অর্থাৎ তোমরা আর আমরা পরস্পর ভাই। এঁরা তো এই ভাবান্তর দেখে বিস্মিত। তখন হিন্দুস্থানীতেই একজন ব্যাখ্যা ক'র্‌লে, "আমাদের দুশমন ইংরেজ খালি দু'টি জিনিসকে ভয় করে—বাঙালীর বোমা, আর পাঠানের রাইফ্‌ল্। অতএব আমরা ভাই।" তখনি এক গামলা দুধ এলো এঁদের জন্য, অন্য খাবার এলো; আর তার পরে টাকা-কড়ির কথা না তুলেই, একটু ক্ষমা চেয়ে সসম্মানে ওঁদের বড়ো সড়কে পৌঁছে দেওয়া হ'ল। আমি বাঙালী ব'লে, আমার সহযাত্রী এই পাঠানদের মধ্যেও বোধ হয় এই ধরণের একটা ভ্রাতৃভাব, মনের কোণে গুপ্ত বা সুপ্ত থাকা অসম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গতঃ বলি, এদের যে-সমস্ত বিভিন্ন “খেল্” বা উপজাতি আছে, আর এদের দেশে কতকগুলি বিখ্যাত স্থান আছে, ভূগোল আর ইতিহাস পড়ার দৌলতে সেই-সবের নাম একবার মাঝে এদের শুনিয়ে দিয়েছিলুম।—যেমন “য়ুসুফজাই”, “মোহ্‌মন্দ্”, “ওয়াজীরী”, “জাক্কাখেল”, “আফ্রিদী” প্রভৃতি জাতির কথা, “লাণ্ডী-কোটাল, জালালাবাদ, কাবুল, হাজারা, কোহাট, খুর্‌রম, তিরাহ্, লোরালাই” প্রভৃতি ভৌগোলিক নামের কথা এরা আমার মুখে শুনেছে ; কাজেই এদের ধারণা, ওদের সম্বন্ধে আমি একটা মস্ত ওয়াকিফ-হাল ব্যক্তি। ওদের দু-একটা ঘরের কথাও জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। যেমন, ওখানে এবার মেওয়া কেমন হ'য়েছে, দুম্বার মাংসের দাম কী রকম এখন। আর যে বৃদ্ধ পাঠানটি পটুয়াখালিতে থেকে ব্যবসা করেন, তিনি একটি খুব কারুকার্য্য-করা “পুস্তীন্” অর্থাৎ ভেড়ার লোমের সদরী বা ওয়েস্ট-কোট প'রেছিলেন। এইরূপ চামড়ার পুস্তীন্-জামায়, ভেড়ার লোমটা থাকে ভিতরের দিকে, আরাম-প্রদ নরম পশম গায়ের উপরেই থাক্‌বে ব'লে ; আর বাইরে চামড়ার উপর রঙীন রেশমে আর সুতো আর জরী দিয়ে ছুঁচের কাজ থাকে। সেই বুড়ো আগা-সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—এই রকম পুস্তীন্-জামার দাম কী রকম হয়। আগা-সাহেবের আবক্ষ ধব্‌ধবে সাদা দাড়ি, মুখখানি অতি প্রশান্ত, একেবারে ঋষিকল্প চেহারা, আর মানুষটিও ভালো ব'লে মনে হ'ল—তিনি ব'ল্‌লেন—“বাবু, জিনিস বুঝিয়া দর ; দশ টাকা থ্যাইক্যা ছ্যাড়-শও দুই শও টাকা পইর্য্যন্ত দাম হয়। বাবু, তুমি আমাদের দেশে আইও। তোমারে ব'ালো পুস্তীন্ আমরা কিনিয়া দিমু।”

পাঠানদের প্রায় প্রত্যেকেই ক্রমে এক-একটি বেঞ্চ বা ব্যর্থ দখল ক'রে শোবার চেষ্টা ক'র্‌লে। তখন রোজার সময়। সকলেই আগে সান্ধ্য আহার সেরে নিয়েছিল। এই রাত্রে আমারও বেশ ভালো

ঘুম হ'ল। এদের সঙ্গে থেকে, গাড়ির ভিতরকার সৌরভে আমার নাসিকাটিও ক্রমে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তার পরের দিন খুব ভোরেই উঠে দেখি, এদের মধ্যে কেউ-কেউ উঠে নমাজ প'ড়্‌ছে, আর সারাদিন রোজার উপোস ক'র্‌তে হবে ব'লে খুব ভোরে ভর-পেট খেয়ে নিচ্ছে—বড়ো বড়ো পাঠান "রোটা" আর কাবাব। পটুয়াখালীর বৃদ্ধ আগা-সাহেবকে দেখি, অনেক আগেই উঠে ব'সে তসবীহ বা মালা-জপ ক'র্‌ছেন—"নব্বদ্‌-ও-নও অসমা-ই-হাসানা" অর্থাৎ আরবী ভাষায় ঈশ্বরের নিরানব্বুইটি পবিত্র ও সুন্দর নাম, মালার এক-একটি দানা গুনে-গুনে আবৃত্তি করা হয় নীরবে। আমার ঘুম ভাঙ্‌তে আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে, তিনি আমাকে "সুখসৌপ্তিক" প্রশ্ন শুধালেন,—"বাবু, কাইল রাইতে একটু কাইত হইবার পার্‌ছিলা ?" অর্থাৎ কাল রাত্রে একটু কা'ত হ'তে বা নিদ্রা দিতে পেরেছিলে ? এই প্রশ্নটি যে স্বাভাবিক ভদ্রতা-প্রণোদিত সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি বোধ হয় আসানসোলে এসে প'ড়েছে। তখন গুটিকতক অন্য জাতির লোক ঢুকে প'ড়্‌ল, বিহারী মুসলমান, মজুর শ্রেণীর লোক। দিনের আলো হ'য়ে আস্‌ছে, অল্পক্ষণ পরে তারা ক'লকাতায় পেঁছে যাবে, তাই এবার আর কাউকে গাড়ির ভিতর আস্‌তে বাধা দিলে না।

এই ভাবে যথাকালে ক'লকাতাতে এসে পেঁছলুম। গাড়ির ভীড়ের কথা চিন্তা ক'র্‌লে ব'ল্‌তে হবে, বেশ ভালোই এলুম, আর ক্ষণিকের সহযাত্রী বিভিন্ন জাতির বন্ধু কতকগুলির সঙ্গ-সুখও লাভ হ'ল। তাদের কারও সঙ্গে আর ভবিষ্যতে কখনও দেখা হবে না,—অন্ততঃ বোধ হয় এ-ভাবে নয়—কিন্তু এই রাতটির কথা খুব ভালো ভাবেই আমার মনে আছে। হাওড়ায় এসে নাম্‌বার সময়ে, ওদের

মধ্যে দুই-একজন হাত বাড়িয়ে' আমার সঙ্গে করমর্দনও ক'র্‌লে। এইভাবে কাবুলী সহযাত্রীদের সঙ্গে এক রাত ট্রেনে কাটিয়ে' দেওয়ার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল॥

বঙ্গাব্দ ১৩৬৬

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১৫	২৫	"লিখ্‌তাম"	"লিখ্‌তুম"
২৬	১৭	"ডাকিায়"	"ডাকিয়ে"
৩০	১৮	"কারোর"	"কারো"
৩১	৩	"থা-কি"	"থাকি"
৪৯	১৮	"Kornel"	"Kernel"
৬৮	১৭	"Sun yat Sen"	"Sun Yat Sen"
৭১	১৮	"য়োরুবা দাহোমে"	"য়োরুবা, দাহোমে"
৯৬	২৩	"Inadlovu"	"Indhlovu"
১৫১	৯	"Gipsy বা Gipsy"	"Gypsy বা Gipsy"
১৬৮	২৫	"উচ্চরণে"	"উচ্চারণে"
১৭৯	শেষ পংক্তি	"নিয়ে"	"দিয়ে"